দিদিমার যুগ ও জীবন

অমিয়া চৌধুরাণী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৮

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন ঃ গৌতম রায়

মুদ্রণ ঃ ন্যাশনাল প্রসেস

আলোক চিত্র

পরিমল গোস্বামী

ও

ধ্রুবনারায়ণ চৌধুরী

লেজার টাইপ সেটিং ঃ

পেজমেকার্স

২৪বি, লেক রোড, কলিকাতা-

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত

মানসী প্রেস, ৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণি হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

আমার বাঙালী নাতিনাতনীদের হাতে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কোনদিনই ভাবিনি আমি নিজে কিছু লিখবো, আর সেটা আবার ছাপার অক্ষরে ছেপে বই-এর রূপ ধরে সবার হাতে পৌছবে।

১৯৭০ সনের জুন মাসে অক্সফোর্ডে আসার পর থেকেই কথাসাহিত্যের সম্পাদক শ্রীমান ভানুর (সবিতেন্দ্রনাথ রায়) সঙ্গে আজ দীর্ঘ একুশ বছর ধরে সমানে চিঠির আদান-প্রদান চলে আসছে। সেই অবধি ভানু প্রায় প্রতি চিঠিতে লিখে আসছে, 'বৌদি, আপনার চিঠিতে কত রকম খবরই না জানতে পাচ্ছি। আপনি আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, এবং অক্সফোর্ডের নানা বিষয় জানিয়ে একটা কিছু লিখুন।'

এদেশে এসে এক হাতে সমস্ত সংসারের কাজকর্ম চালিয়ে আর কলম হাতে নিয়ে বসবার অবকাশ হয়নি।

তারপর আজ ছয় বছরের ওপর পড়লাম মারাত্মক রোগে অসুস্থ হয়ে শোবার ঘরে বন্দী। প্রথম বছর কাটালাম স্বামীর বই 'আত্মঘাতী বাঙালী'র পাণ্ডুলিপিখানা প্রেসে ছাপবার ফাইনাল কপি করে দেবার জন্য। ঐ কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শুধু জানালার ধারে বসে আর সময় কাটতে চায় না। তখন ভানুর কথা স্মরণ করে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়লাম আমার আত্মজীবনী লিখতে। কখনও কোনদিন ডায়েরী লিখিনি। যেমন যেমন সব মনে আসছে লিখে যাচ্ছি। এই বইতে প্রায় বছর তিরিশের অভিজ্ঞতা লিখেছি এবং ইচ্ছে আছে মহান সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপায় আরও পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে 'আমার কথাটি ফুরলো' বলে শেষ করবো।

আমার এই বই লেখার প্রথম উদ্যোক্তা ভানু, তাকে আর ধন্যবাদ কি জানাবো, তার ওপর এই বিরাশী বছরের বৃদ্ধার অশেষ আশীর্বাদ।

তারপর যেমন যেমন লিখে যাচ্ছি গজেনবাবু, মণীশ, প্রদোষ সবাই পড়ে খু-ব উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন।

গজেনবাবু, সাগরময়বাবু, সব বড় বড় সাহিত্যিকরা যখন আমার লেখা পড়ে সমানে কলম চালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে পাঠাচ্ছেন, তখন নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছি।

আমাকে এত উৎসাহ দেবার জন্য এঁদের সকলকে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে আরেকজনের কথাও মনে পড়ে গেল। তারও আমার কাছ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য। অক্সফোর্ডে ১৯৭১ সন থেকে ত্রিলোকেশ মুখার্জির সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার জীবনের নানারকম গল্পশুনে সে-ও অনুরোধ করে যাচ্ছে।

অমিয়া চৌধুরাণী

১৯২৮—উনিশ বৎসর বয়সে সিটি কলেজে আই-এ ক্লাসের ছাত্রী

১৯৩০—আই. এ. পরীক্ষার পূর্বে সহপাঠিনী সহ
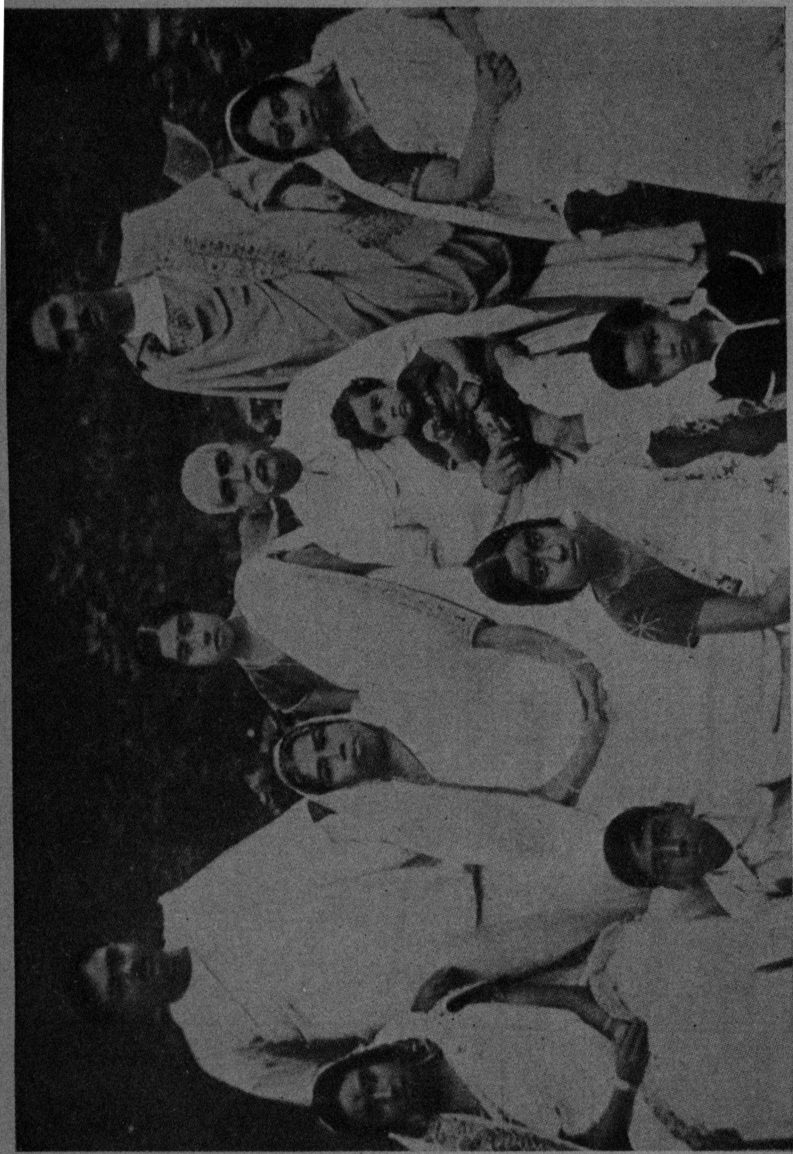
মা ও বাবার সঙ্গে শিলঙে—সঙ্গে দুই ভগ্নীপতি, ছোটবোন ও দিদিরা সন্তান সহ
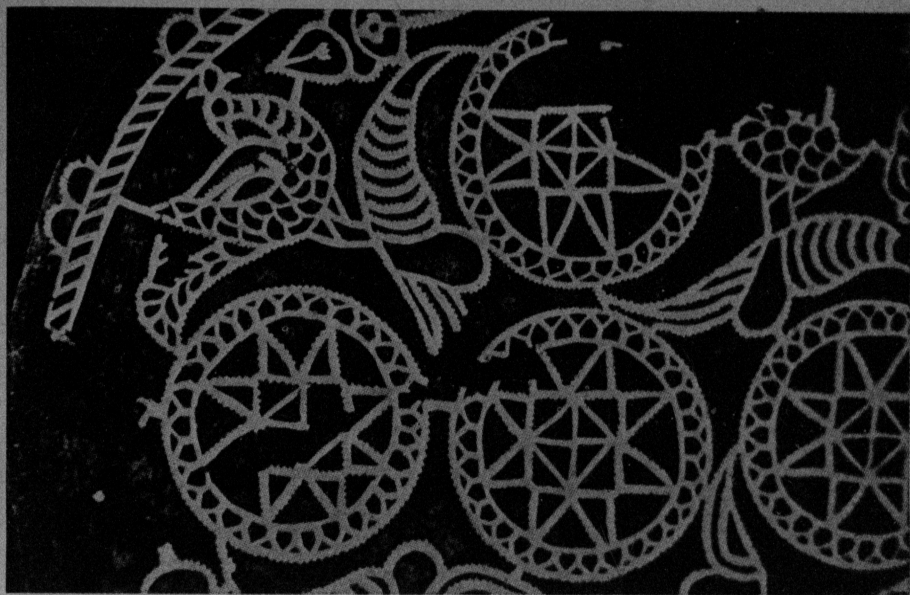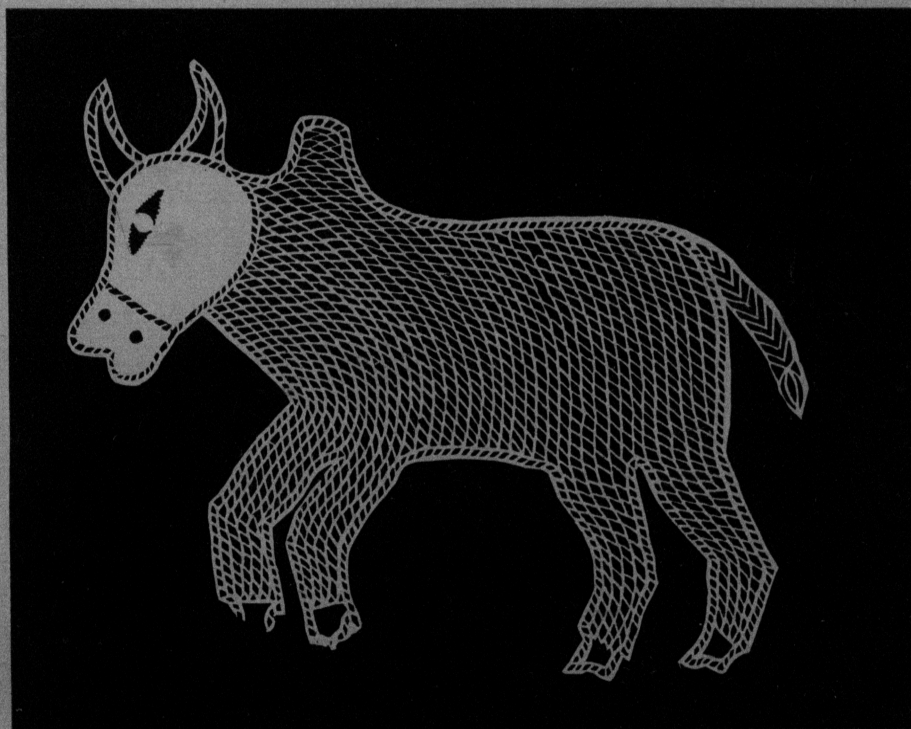
মায়ের সেলাইয়ের কাজ

মায়ের সেলাইয়ের কাজ

পিতা রায়সাহেব দীননাথ ধর
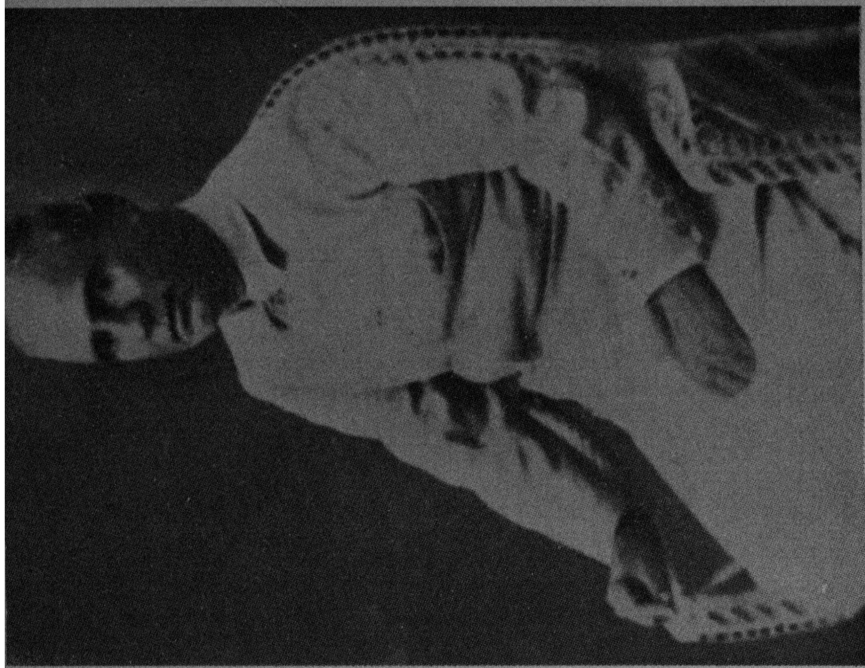
শ্বশুর মশাই উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
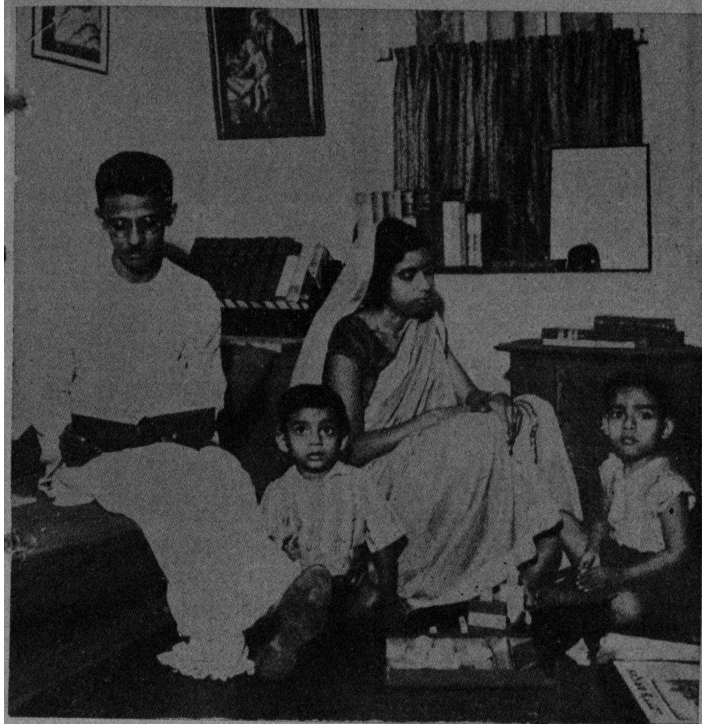
১৯৩৬ সালে
আর্থিক দুরবস্থার সম
নীরদবাবু, লেখিক
ও দুই পুত্র
জানলায় সিল্কের পর
ও
হল অ্যান্ড অ্যানডার
থেকে কেনা খেলন
যাঁর জন্য নিন্দে হয়েছি

পরিমল গোস্বামী
গৃহীত
আলোকচিত্র

নুকধারী, কোলে শিশু ধ্রুব
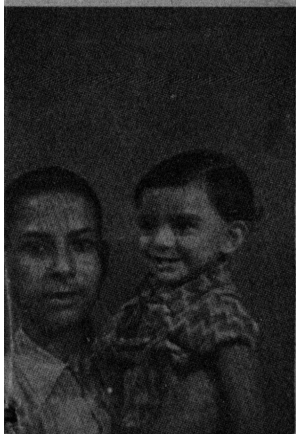
১৯৩৩—তিন মাসের প্রথম সন্তান শিশু ধ্রুব ও লেখি
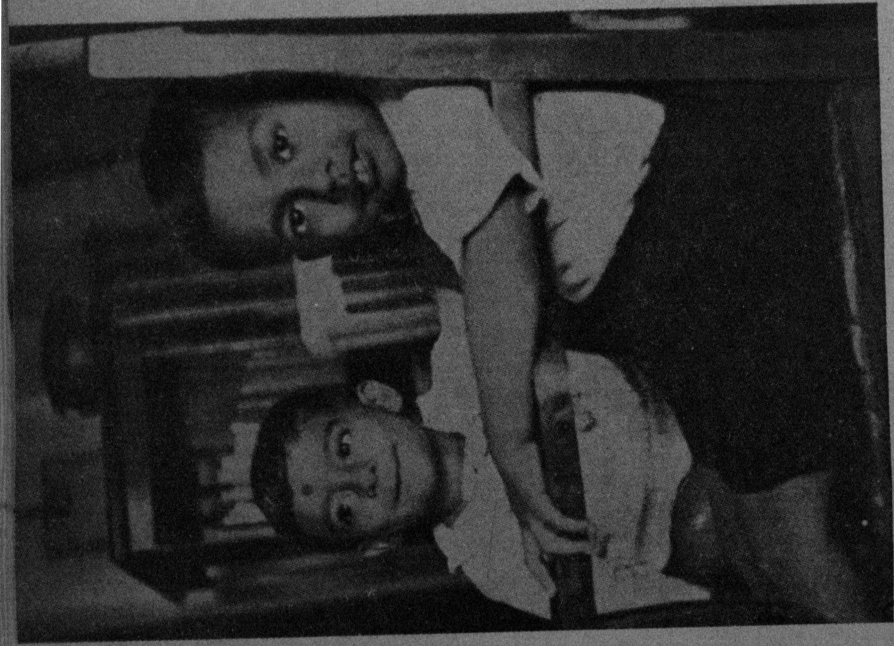
জ্যেষ্ঠ পত্র ধ্রুবনারায়ণ ও মধ্যম পুত্র কীর্তিনারায়ণ

আলোকচিত্র
পরিমল গোস্বামী
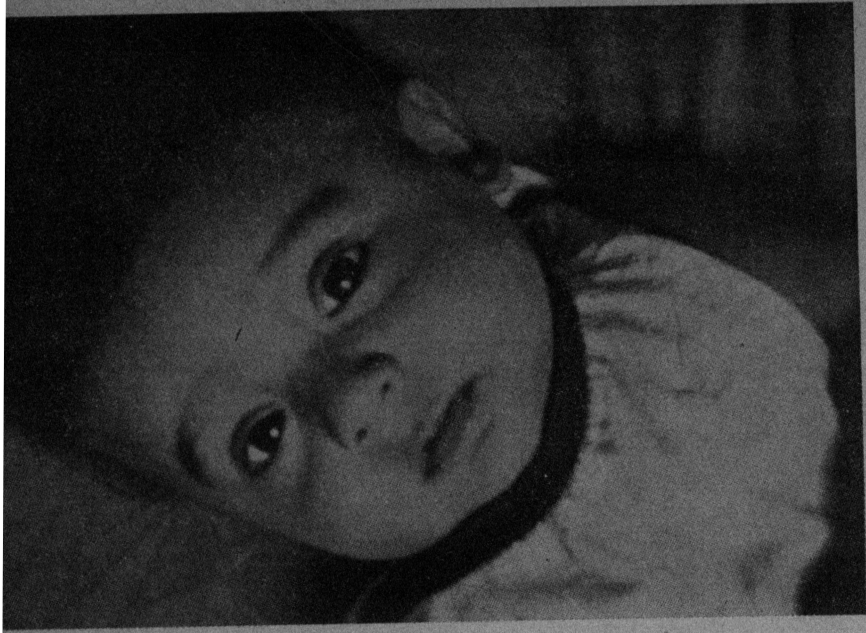
কনিষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীনারায়ণ

দিদিমার যুগ ও জীবন

প্রথম অধ্যায়
শৈশব স্মৃতি

উনিশ-শ একাত্তর সন, ১০ই জানুয়ারী, অক্‌স্‌ফোর্ডশায়ারের হুইট্‌লী নামে একটা গ্রামে পাহাড়ের ওপর একটি ছোট বাংলো বাড়িতে বসবার ঘরে আগুনের পাশে বসে একটি উলের মোজা বুনছি। রাত তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। উনি শুতে চলে গেছেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি জানালার পর্দা ভেদ করে একটা দিনের আলোর মত জ্যোতি বাইরে দেখা যাচ্ছে। উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে, পেঁজা তুলোর মত থোকা থোকা বরফ পড়ে চারদিক সাদা হয়ে গিয়ে এক অদ্ভুত আলোর ছটা চারদিকে পড়ছে দেখতে পেলাম।

বরাবর ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় যোগ দিয়েছি। মনে পড়ে গেল সেই গুরুগম্ভীরভাবে ব্রাহ্ম আচার্যদের উপাসনার সময়ে এই কথাগুলি উচ্চারণের সুর—

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—

'অন্ধকার হইতে আলোতে লইয়া যাও!'

ঐ দৃশ্য দেখবার পর ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির জন্য ভক্তিভরে নিজেদের মাথা নুয়ে আসে। এই আলোর ছটা মুহ্যমান হয়ে দেখার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মনে হল টেলিভিশ্যনে কি প্রোগ্রাম হচ্ছে দেখা যাক্‌। খুলেই দেখি 'Times Remembered' নাম দিয়ে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার একটি 'ফীচার' দেখানো হবে বলে 'অ্যানাউন্স' করলে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা তাঁর একেবারে শিশুকালের জীবনস্মৃতি বলতে লাগলেন এবং শেষ করলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে শেষ জীবনের বিবরণ দিয়ে।

'ফায়ার প্লেসে'র কয়লা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। একদৃষ্টে জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম দেখি তো মনে করে কবে থেকে নিজের জীবনের কথা স্মরণ করতে পারি।

॥ ১ ॥
স্মৃতির উন্মেষ

মনে পড়ল প্রথম কাহিনী—সেটা ১৯১১ সালের শেষের দিকের কথা ; বয়স বছর তিনের একটু কম, কারণ জন্মেছি ১৯০৯ সনে ; সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে এসে দিল্লীর দরবার করবার সময়ে। সেই উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে সব বড় বড় অট্টালিকায় আলোকমালা জ্বালা, আতসবাজী পোড়ানো — এ সমস্ত আমোদপ্রমোদের নানারকম আয়োজন হয়েছিল।

আমার জন্ম হয় আসামের রাজধানী শিলং শহরে। শিলং-এ আসাম গভর্নমেণ্ট খুব ঘটা করে এই আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'ওয়ার্ড লেকে'র ধারে আতসবাজী পোড়ানো হবে। আমাদের বাড়ি এই 'লেকে'র কাছেই ছিল। বাবা ঠিক করলেন আমাদের তিন বোনকে নিয়ে গিয়ে তামাসা দেখিয়ে আনবেন। আমার ছোটবোন অতি শিশু। মা তাকে নিয়ে বাড়ি থেকেই বারান্দায় বসে দেখতে পারবেন।

দিদির বয়স ১১ বছর, মেজদির ৯, এবং আমার প্রায় ৩ বছর। তিন বোন সেজেগুজে বাবার সঙ্গে গেলাম। বাবার নিমন্ত্রণ হয়েছিল বিশিষ্ট লোকের কার্ড দিয়ে। আমাদের সবাইকার প্রথম সারিতে বসে দেখার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এখনও মনে পড়ে, যেই হাউইবাজী ফোঁস করে আকাশে উঠ্‌লো, একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। তারপর চারদিকে ফুটফাট্, ফোঁস ফোঁস নানারকম বাজী পট্‌কার আওয়াজ শুরু হতেই আমি ভয়ে যতখানি জোরে গলা ফাটিয়ে পারি চেঁচিয়ে কান্না শুরু করে দিলাম। বাবা টেনে কোলে বসিয়ে কত বোঝাতে লাগলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই। বাবা যত বোঝান, আমি তত আরো চেঁচাই। তখন বাবা ভীষণ রেগে পাশের সাহেবটির কাছে দিদি, মেজদিকে জিম্মা করে দিয়ে আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাড়ি নিয়ে এসে, মার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'নাও ! তোমার অসভ্য মেয়েটাকে,' বলে হনহন করে চলে গেলেন। মা কাছে টেনে নিয়ে তাঁর পাশে একটি মোড়া পেতে আমায় বসিয়ে ছোটবোনকে কোলে নিয়ে বাজী পোড়ানো দেখতে লাগলেন। এখনও মার কোলে ছোটবোন, আর আকাশে রং-বেরংএর হাউইবাজী ও নানারকম তারা ঝরে পড়ার সেই দৃশ্য ও আওয়াজ এবং বাবার রাগে গরগরানির গলা—যেমনি চোখে ভাসে, তেমনি কানেও বাজে।

অতীতের স্মৃতি বড়ই মধুর, আদরই হোক বা বকুনিই হোক। আমার শৈশব থেকে এই ৮০ বৎসর পর্যন্ত জীবনে নানারকম ঘটনা ঘটেছে ও অভিজ্ঞতা হয়েছে। শিশুকালের সুখের জীবন কাটিয়ে, অনেক বিপত্তির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে এবং

ক্রমে সব বাধা কাটিয়ে উঠে আবার সুন্দর, স্বচ্ছন্দে রাস্তা ধরে চলার যে আনন্দ সেটার জন্যেই মনে হয় ভগবানের কৃপায় জীবন সার্থক।

॥ ২ ॥
জন্মস্থান — শিলং

আসামের রাজধানী শিলং অতি সুন্দর ছোটখাট শহর ছিল। এটা খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিত। গৌহাটি থেকে তার দূরত্ব ছিল ৩৩ মাইল এবং অন্যদিকে চেরাপুঞ্জি ছিল ৩০ মাইল দূরে। চেরাপুঞ্জি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ, সারা বছর জুড়ে ৪০০ ইঞ্চির উপর বৃষ্টিপাতের জন্য। শিলং কাছে হওয়াতে সেখানেও প্রায় সারা বছর জুড়েই বৃষ্টি হয়।

আবার শীতের দিনে খুব ঠাণ্ডা। এমনি বরফ অর্থাৎ 'স্নো' যাকে বলে—পড়তো না বটে কিন্তু 'ফ্রস্ট' হতো খুব বেশী। চারদিক অনেক বেলা পর্যন্ত 'ফ্রস্টে' সাদা হয়ে থাকতো। 'বাথরুমে' বালতিতে জল থাকলে দুই ইঞ্চি মত জল ওপরে বরফ হয়ে জমে থাকতো। কোন কোন সময় পাইপের জল জমে যেতো।

সকাল, সন্ধ্যে সব সময়েই 'ফায়ার প্লেসে' আগুন জ্বালতে হতো ঘর গরম রাখবার জন্য। অনেক সময় গ্রীষ্মকালে বেশী বৃষ্টি হলে আগুন জ্বালা হতো।

আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম শিলং স্কটল্যান্ডের মত। সেটা সত্যি স্বচক্ষে দেখে অনুভব করলাম ইংল্যান্ড এসে এবং পরে স্কটল্যান্ডে গিয়ে। স্কটল্যান্ড-এর স্টারলিং ইউনিভার্সিটি ওঁকে ডক্টরেট উপাধি দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে। সেখানে গিয়ে স্টারলিং শহর ও আশেপাশের চারদিকের পাহাড়, জঙ্গল, জলপ্রপাত দেখে মনে হল, সত্যি! কথাটা একেবারে ঠিক। সেই একই রকম পাহাড়, পাইন গাছ এবং ছোট ছোট ঝর্ণা সব পাহাড়ের গা দিয়ে ঝির ঝির করে নেমে ছোট নদীর মত কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। চারদিকে জঙ্গলে নানারকম বেরীর গাছ। আর আছে অসংখ্য 'রডোড্রেনডন্' ফুলের গাছ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাইন গাছের ওপর ঝিঁঝিঁ পোকা প্রবল আওয়াজে ডাকতে থাকে অন্ধকার একেবারে নিবিড় না হওয়া পর্যন্ত।

শিলং-এর সঙ্গে প্রায় সব বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ইংল্যান্ডও আমার খুবই ভাল লাগে।

আমার শিলং সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ১৯৩২ সন পর্যন্ত। এই বছরে এপ্রিল মাসে আমার বিয়ে হয়, তার অল্পদিন পরে আমি কেবল একবার মাত্র শিলং যাই। পরের বছর মা বাবা বরাবরের মত শিলং ছেড়ে কলকাতা এসে পড়ায় আর যাবার সুযোগ হয় নি।

শিলং শহরেই জন্ম এবং সেখানেই বড় হওয়া, বেশীর ভাগ শিক্ষাও সেখানেই; এতে কেউ দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করলে শিলংই আমার দেশ বলে মনে হয়।

শিলংকে একটা 'কজ্মোপলিটন্' শহর বলাই চলে। ওখানকার বাসিন্দা খাসিয়া

ছাড়া ইংরেজ, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান, মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী ও অল্পবিস্তর নেপালী ছিল।

শিলং আসামের রাজধানী বলে উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজ। এঁদের নীচে বাঙালী হিন্দু ও দু-চারজন মুসলমান কাজ করতেন। মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী এঁরা অধিকাংশই ছিল ব্যবসাদার, এবং নেপালী গুর্খা ছিল সেনাদলে।

খাসিয়াদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ শ্রেণীর ছিলেন, তাঁরা শিক্ষিত ছিলেন এবং সকলেই প্রায় ভাল সরকারী চাকরি-বাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন।

এঁরা সকলেই প্রায় খৃষ্টান ছিলেন। এঁদের থাকার রকম-সকমও ইংরেজ অনুকরণের ছিল। ইংরেজ ও ওয়েলশ্ সাহেব ও মেমসাহেবরা খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে গিয়ে খাসিয়াদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতেন।

খাসিয়ারা যারা জঙলী তারা সাপ পূজা করে। তারা এই সাপকে বলে 'থ্লেন' (thlen)। এই পূজায় তারা মানুষের মাথার চুল ও নখ তাদের দেবতার কাছে নিবেদন করে। তারা সাধারণতঃ নিজেদের জাতের লোকের চুল ও নখকেই বেশী ভাল পূজার অর্ঘ্য বলে মনে করে। সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে কাউকে একলা পেলেই মেরে তার চুল ও নখ যোগাড় করে। যদি নেহাৎ নিজেদের মধ্যে খাসিয়াজাতের লোক না পায়, তবে অন্য বিভিন্ন জাতের লোককে মারবার চেষ্টা করে। তারা ভিন্ন জাতের লোককে 'উদ্খার' বলে।

সন্ধ্যাবেলা 'থ্লেন' পূজাকারীরা বের হয় বলে সাধারণ খাসিয়াদের খুব একটা ভয় ছিল। এজন্য আমাদের সময়ে যে-সব খাসিয়া মেয়েমানুষরা এসে ঝি-এর কাজ করতো বাড়ি বাড়ি, তারা বিকেল চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বাড়ি ফিরে চলে যেতো। এদের একটা সাংঘাতিক ভয় ছিল যে দিনের শেষে অন্ধকার হওয়া মাত্র তাদের কেউ মেরে ফেল্‌বে বলে।

সাধারণ খাসিয়া পুরুষমানুষরা অধিকাংশই মিস্ত্রী হতো। তারা বাড়ি তৈরী করতো এবং কেউ কেউ খুব সুন্দর ভাবে খড়ের চাল ছাউনি দিত। আর বাড়ি বাড়ি বিক্রী করতে আসতো জ্বালানী কাঠ পিঠে নিয়ে। তবে খাসিয়া পুরুষ মানুষরা একটু কুঁড়ে হতো। ভারী কাজকর্ম মেয়েরাই করতো বেশী। তারা দেখতে খুব ফর্সা ও সুন্দরী হতো। পুরুষমানুষের রং ময়লা। তারা মদ খেয়ে পড়ে থাকতে খুব পটু ছিল।

খাসিয়া মেয়েরা বাড়ি বাড়ি এসে সারাদিন ঝি-এর কাজ করতো, বাসন মাজা, কাপড় ধোওয়া, ঝাঁটপাট দেওয়া, ছোট ছেলেমেয়ে কোলে পিঠে নিয়ে ঘোরা ইত্যাদি। তাছাড়া এরা বাজার-হাট চালানো, কিম্বা 'থাপা' (একরকম বাঁশের চোঙ্গার মত ঝুড়ি) বেতের ফিতে দিয়ে মাথায় বেঁধে পিঠে নিয়ে তাতে করে নানারকম জিনিস বেচতে আসতো, এবং অনেক দামাদামির পর বেশ অল্প দামেই সব দিয়ে চলে যেতো।

চেরাপুঞ্জির পরে ভোলাগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে সীলেট থেকে অনেক রকম মাছ চালান আসতো। তারপর এই চালানে-মাছ চেরাপুঞ্জি হয়ে শিলং

এসে পৌঁছত। সীলেটের কই মাছ ও বাচা মাছ অতিশয় সুস্বাদু ছিল। মাছ এসে পৌঁছানো মাত্র খাসিয়া মেয়েরা তাদের থাপায় করে 'ডখা কই' কিম্বা 'ডখা বাচা' অর্থাৎ 'মাছ কই' বা 'মাছ বাচা' (খাসিয়া ভাষায় মাছকে 'ডখা' বলে) হাঁকতে হাঁকতে উঠোনে এসে দাঁড়াতো। শিলং ছেড়ে এসে ওরকম বড় বড় সুস্বাদু কই মাছ আর খাইনি। আর বাচা মাছ তো চোখে দেখিনি। এই বাচা মাছ কড়াতে সামান্য একটু গরম তেলে ভাজবার জন্য চড়ানো মাত্র মাছ থেকে কুল কুল করে তেল বেরিয়ে মাছটা সুন্দর ভাজা হয়ে যেতো। ঐ তেল দিয়ে ভাত মেখে বাচা মাছ ভাজা-খাওয়া আমাদের অতিশয় একটা প্রিয় খাদ্য ছিল।

ওঁর কাছে শুনি, ময়মনসিংহতেও বাচা মাছ সীলেট থেকে চালান যেতো এবং ওনারাও এই ভাবেই ছেলেবেলায় খেয়েছেন। তবে ময়মনসিংহ ছাড়ার পর বাচা মাছ চোখে দেখেন নি।

খাসিয়া মেয়েরা যখন যা ফল হতো, অর্থাৎ নাসপাতি, কমলালেবু, প্লাম, স-ইয়ং (----ঠিক কালোজামের মত একরকম ফল, 'স' মানে ফল ও 'ইয়ং' মানে কালো) ইত্যাদি বিক্রী করতে আসতো। আর মনে পড়ে তারা নিয়ে আস্‌তো যখন তখন জঙ্গল থেকে ভেঙে আনা প্রকাণ্ড বড় বড় মৌমাছির চাক্। এই সবই 'কমলা মধু'র চাক্। গন্ধ যেমনি সুন্দর, খেতেও তেমনি সুস্বাদু। ছোট ছোট টুকরো করে ভেঙে নিয়ে আমরা চুষে চুষে খেতাম। মা ওগুলো কোন বড় পাত্রে অল্প গরমে রেখে দিতেন। চাক্‌গুলো গলে গেলে পর পরিস্কার ন্যাকড়ায় মধু ছেঁকে পরিস্কার বোতলে ভরে রাখতেন। মোমটা ঠাণ্ডা করে জমিয়ে রেখে দিতেন তুলে। মুচি এসে নিয়ে যেতো, তার জুতো সেলাইয়ের সময় ছুঁচ, সূতো পিছল করবার জন্য। ঐ মোম শিঙের মধ্যে ভরে রাখতো।

পুরুষমানুষ খাসিয়ারা কেউ কেউ যে-সব পাহাড়ে ছোট নদী ছিল সেখানে বিকেল ঘনিয়ে এলে গিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করতো। ঐসব নদীর মাছ ধরা বারণ ছিল এবং সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে দুটো, তিনটে মাছ ধরে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রী করবার জন্য নিয়ে আসতো।

সপ্তাহে তিনদিন হাট বসতো। প্রথমটাকে বলে 'বড় বাজার'— 'কায়উডু'। সেদিন সমস্ত খাসিয়া পাহাড়ের চারদিক থেকে নানারকম জিনিস বিক্রী করতে নিয়ে আসতো গ্রামের লোকেরা। এদিনে তরিতরকারী, মাছ, ডিম যাবতীয় জিনিস পাওয়া যেতো এবং লোকে বেশী করে কিনে রাখতো। এর দুদিন পর বসতো 'লাবানবাজার' এবং একদিন পর 'ছোটবাজার'। এরকম ঘুরে ঘুরে হাটের দিন আসতো। লাবানবাজারে কিছু কিছু নানারকম সব পাওয়া গেলেও, ছোটবাজারে জিনিসপত্র অল্পই পাওয়া যেতো।

তবে এমনিতে গৌহাটি থেকে প্রায় সব সময়েই ব্রহ্মপুত্র নদীর বড় বড় চিতল ও রুই মাছ চালান আসতো। চিংড়ি মাছ কদাচ কখনো আসতে দেখিছি। মাছ সব

সময়ে পাওয়া যেতো না। খাওয়াদাওয়ার জিনিসের কোন কোন সময় খুবই কষ্ট হয়ে দাঁড়াতো বলে আমাদের বাড়িতে ডিমের জন্য হাঁস পোষা হতো এবং বাগানে বাবা নানারকমের তরকারীও ফলাতেন।

শিলং-এ জায়গায় জায়গায় 'নিয়োলিথিক' যুগের পাথরের 'মেনহির' ও 'ডলমেন' আছে। যেখানে বড়বাজারের হাট বস্‌ত সেখানে অনেকগুলি রয়েছে। ওগুলোকে বলে খাসিয়াদের গোরের চিহ্ন। শুনেছি যেগুলি খাড়া 'মেনহির' পাথর সেগুলি নাকি পুরুষমানুষের, এবং যেগুলি দুটো পাথরের উপর শোয়ানো আরেকটা পাথর চাপানো ('ডলমেন') সেটা নাকি মেয়েমানুষের গোর। তবে এর সমস্যা কেউ সমাধান করতে পারে নি।

প্রধান নদী দুটি। 'উমখ্রা' ও 'উমশিরপি'। 'উম্‌' মানে খাসিয়া ভাষায় জল। এছাড়া ছোট ছোট অনেক ঝর্ণা আছে। এর জল মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে আসছে বলে খুবই ঠাণ্ডা ও অতি সুস্বাদু।

শিলং শহরের জায়গাটা বেশ কয়টা ভাগে নানারকমের নামে ভাগ করা। যেমন 'জেলরোড্', এখানে বেশীর ভাগ ভদ্রবাঙালী থাকেন, 'পুলিসবাজার' এখানে বাঙালী কিছু ও মারোয়াড়ীরা, 'রিলবং'এও বাঙালী, লাবানে আমার সময়ে বেশী বাঙালী ব্রাহ্মরা থাকতেন, এবং 'মোখার' বলে যে জায়গা সেখানে খাসিয়াদের বেশী বাস ছিল। 'আপার শিলং'এও কেউ কেউ থাকতেন। এছাড়া লাবানের নীচে ছিল 'কেণ্টেস্‌ট্রেস', এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়বার গিয়ে থেকেছিলেন। আর থাকতেন হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীযুক্তা মনীষা দেবী, তাঁর সব ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে। তাঁর একটি গানের স্কুল ছিল এবং সেখানে অনেক সময় মেয়েরা নানারকম অভিনয় ইত্যাদি করতো।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হল্‌ ছিল শিলং শহরের চৌমাথার উপরে। সেখানে ব্রাহ্ম, হিন্দু সবাই যোগ দিতেন। আমার জন্মের আগে শিলং-এ আমার শ্বশুরমশায় ও শাশুড়ী ঠাকরুণ কিছুদিন ছিলেন এবং শুনেছি শাশুড়ী ঠাকরুণ ব্রাহ্মসমাজে নিয়মমত গান করতেন। আমার এক মামাশ্বশুরও স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। আমরা ছেলেবেলায় তাঁর ছেলে মেয়ে সকলের সঙ্গে এক পরিবারের মত ছিলাম। পালাক্রমে এক শনিবার, রবিবার যারা আমাদের সমবয়সী ছিল আমাদের বাড়ি এসে দুদিন থাকতো, আবার অন্য শনিবার ও রবিবার আমরা তাদের বাড়ি গিয়ে থাকতাম।

ব্রাহ্মসমাজে বেশ কিছুদিন ধরে 'মাঘোৎসব' উপলক্ষে সকলে যোগ দিয়ে বেশ আমোদ করা হোত। ১১ই মাঘের দিন ভোররাত্তির থেকে উপাসনা আরম্ভ হতো। হলঘরটা সুন্দর করে সাজানো হতো 'একেশিয়া' ফুল দিয়ে। চারদিক তার গন্ধে ভরপুর হয়ে যেতো। আর সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'কটাইরাম' বুড়ো (যে বরাবর হলটার তদারক করতো) হাত কাঁপাতে কাঁপাতে প্রকাণ্ড লম্বা একটা সরু বাঁশের ডগায় একটা শোলায় আগুন দিয়ে মোমবাতি দেওয়া ঝাড়লণ্ঠনগুলি জ্বেলে দিত।

এই উৎসবে এক সন্ধ্যায় হতো 'নগর-সংকীর্তন'। সকলে মিলে সারাশহর জুড়ে

খোল-করতাল নিয়ে গান গেয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এসে তারপর উপাসনা হতো। একদিন শুধু মেয়েদের জন্য হতো 'মহিলা-সমিতি', আবার আরেকদিন হতো 'শিশু-সম্মিলন'। এছাড়া অনেক বিশিষ্ট আচার্য মিলে কয়দিন জুড়ে উপাসনা করতেন ও বক্তৃতা দিতেন।

এই মাঘোৎসব শেষ হতো একেবারে শেষ দিনে সকলে মিলে একত্র হয়ে পাহাড়ের নদীর ধারে কোন জায়গায় রান্নাবান্না করে উপাসনার পর পিক্‌নিক্ খেয়ে।

আর দেখেছি সবাই একত্র হয়ে পুজো ইত্যাদিতে আমোদ। তিন জায়গায় বারোয়ারী দুর্গাপুজা হতো— জেলরোডে, পুলিসবাজারে ও লাবানে। প্রায় মাস খানেক আগে থেকে বহুবাড়ির মেয়েরা মিলে বসে যেতেন নারকেলের চিঁড়ে, জিরে কাটতে কিম্বা তক্তি, গঙ্গাজলি তৈরী করতে। সে সব পূজোয় সন্ধ্যেবেলা ভোগ দেওয়া হবে বলে। সকলে মিলে একসঙ্গে এক পরিবারের মত আমোদ করা হতো। এছাড়া অন্যান্য পার্বণেও সবাই একত্র যোগ দিতেন। দোলের সময় কয়দিন জুড়ে 'দোলযাত্রা'র কীর্তন হতো। এছাড়া ঝুলন, রথযাত্রা এসবেরও আড়ম্বর কম ছিল না।

আরেকটা ব্যাপার দেখতে খুব মজা লাগতো। গৃহিণীরা একত্র হয়ে পাড়ায় কোন এক বাড়িতে বসে যেতেন মুড়ি ভাজতে, যার যার চাল নিয়ে এসে।

ছোট শহর বলে আপদেবিপদে সবাই এসে সাহায্য করতেন। কারো কোনরকম বাড়াবাড়ি অসুখ হলে যুবকের দল সেবা-শুশ্রূষার ভার নিতেন। কোন বাড়িতে কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ থাকলে মেয়েরা যুবকেরা মিলে এসে রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সব কাজে সাহায্য করতেন।

আর একটা ব্যাপার খুব ঘটা করে পালন করা হতো। সেটা গবর্নমেণ্টের তরফ থেকে। বছরে দুবার করে লাবান যাবার পথে প্যারেড গ্রাউন্ডে প্যারেড হতো। ১লা জানুয়ারীতে ও সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মতিথি পালন করা হোত ২রা জুন। প্যারেড হতো সকাল ১০ টার সময়। গুর্খা রেজিমেন্ট এই প্যারেড করতো, সঙ্গে ব্যাগপাইপ ব্যান্ড সৈন্যদের আগে আগে বাজিয়ে মার্চ করে যেতো। তাদের আগে ব্যান্ডমাস্টার হাতে রূপোবাঁধানো একটা লম্বা লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেতো এবং তার গায়ে থাকতো একটা বাঘের ছালের জামা।

প্যারেড আরম্ভ হবার অল্প আগে চীফ কমিশনার ডেপুটি কমিশনার এঁরা বড় বড় ঘোড়ায় চড়ে এসে দাঁড়াতেন। তাঁরা হাতে স্যাল্যুট করলে পর সৈন্যরা সারি দিয়ে বন্দুকের আওয়াজ করে যেতো।

বাবা প্যারেডে নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। আমি আর পুঁটু (ছোটবোন) সেজেগুজে বাবার সঙ্গে যেতাম। বিশেষ নিমন্ত্রিত সকলের বসবার জায়গাতে প্রথম সারিতেই বাবার সঙ্গে বসতাম।

প্যারেড শেষ হয়ে গেলে চীফ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এঁরা ঘোড়া চড়েই এসে সকলের সঙ্গে 'হ্যান্ডশেক' করতেন। ঘোড়ার উপর থেকে নীচু হয়ে আমাদের দিকেও হাত বাড়িয়ে দিতেন 'হ্যান্ডশেক' করবার জন্য। হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করতাম

অবশ্য, কিন্তু ঐ বড় বড় ঘোড়া ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে আর আগে পিছে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহেবেরা লাগাম টেনে তাদের ঠিক রাখছেন, সেটা দেখে মনে মনে ভয়ে আত্মা গুড়ুম হয়ে যেতো।

॥ ৩ ॥
ভূমিকম্পের কথা

ইংরাজী ১৮৯৭ সন, বাংলা ১৩০৪ সনের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার খাসিয়া পাহাড়ের সমস্ত অঞ্চলে এবং আসাম, ময়মনসিংহেও সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। খাসিয়া পাহাড়ে লোক মরেছিল পনেরো শ' আন্দাজ। খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে খুব উঁচু একটি জলপ্রপাত ছিল, তার নাম ছিল 'মউস্মাই ফলস্'। ওটাকে পৃথিবীর একটা উঁচু জলপ্রপাত বলা যেত, কারণ, তার উচ্চতা ১৩০০ ফুট মত ছিল। এই ভূমিকম্পের পর ওটা একেবারে শুকিয়ে যায় ; এখন আর তার কোন অস্তিত্বই নেই। এখন শিলং-এ দুটি বড় প্রপাত আছে, ও একটি ছোট। 'বিশপস্ ফলস্'—'উমশিরপি' নদীর ৪৫০ ফুটের ওপর এবং 'বীডনস্ ফলস্'—'উমখ্রা' নদীর ৩০০ ফুটের উপরে। আর একটার নাম 'স্প্রেড-ঈগল ফলস্'। এটা অন্য দুটোর চাইতে ছোট। বাঙালীরা এর নাম দিয়েছিলেন 'সতী ফলস্'।

১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে সমস্ত শিলং শহর একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায় ; বাবার মুখে সেই বর্ণনা শুনেছি। বাবা যে বাড়িতে থাকতেন সেটা ছিল একটা টিলার নীচে গর্তের মধ্যে। হঠাৎ যখন ভূমিকম্প শুরু হলো এবং বিশেষ জোরে সমস্ত বাড়িটা নাড়া দিয়ে উঠলো, তখন বাবা তাড়াতাড়ি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে টিলার উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা ধসে গেল, আর টিলার মাটি সমস্ত ভেঙে পড়ে তার নীচে সবটা বাড়ি চাপা পড়ে গেল। জমি এমন জোরে কাঁপতে লাগলো যে বাবা কোনক্রমে উবু হয়ে নিজেকে সামলালেন। ওয়ার্ড লেকের বাঁধ ভেঙে গিয়ে বন্যার মত জল বের হতে লাগলো। চারদিকে লোকেদের আর্তনাদ, ছোট ছেলে, মেয়েমানুষের কান্নার রোলের সঙ্গে কেবল হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং ধুলোর ঝড় উঠে চারদিকে দিনের আলো ঢাকা পড়ে অন্ধকার হয়ে গেল।

ভূমিকম্প থামল বটে, কিন্তু যাকে বলে 'আফটার এফেক্ট' সে-রকম, একটু পরে পরেই সমস্ত পৃথিবী কেঁপে ওঠা, বেশ কিছু দিন ধরে চললো। তখন এই বিপদে সকল লোকে মিলে যেন এক পরিবারভুক্ত হয়ে গেল। বাবাদের মত সব যুবকেরা জোট বেঁধে ভলান্টিয়ারের মত সকলের সাহায্য, দেখাশোনা আরম্ভ করে দিলেন পাড়ায় পাড়ায়। বস্তা বস্তা চাল আলু মারোয়াড়ী দোকানদারেরা লোকের জন্য দান করলো। বড় বড় হাঁড়ি যোগাড় করে তাতে ভাত রান্না করে ও আলু সেদ্ধ করে বড় বড় টেবিলের উপর ঢেলে দিয়ে সবার খাবার ব্যবস্থা হয়। তখন আর পুরুষমানুষ বা স্ত্রীলোক বলে কেউ তফাত করবার উপায় ছিল না। যে যেভাবে এসেছেন ছেলেমেয়ে

নিয়ে মুঠো করে কিছু ভাত ও আলু সেদ্ধ পাশাপাশি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে গিয়ে কোনক্রমে নিজেদের প্রাণরক্ষা করা।

এ সময়ে একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিল বলে শুনেছি। একজন বাঙালী ভদ্রলোক কোথা থেকে কোনক্রমে দুই টিন বিস্কুট যোগাড় করে তাঁর আপিসের বড় সাহেবকে ভেট দেবার উপলক্ষে নিয়ে যেতে সাহেব বলে দিলেন, "এই বিস্কুট আমার পক্ষে নেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। এখন তোমাদের নিজেদের —স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের বেশী দরকার। এগুলো ফেরত নিয়ে তাদের খেতে দিয়ে প্রাণরক্ষা কর।"

এই ভূমিকম্পের সূত্রে আমার মায়ের কাছে শোনা ঘটনা এবং ওঁর কাছে শোনা আমার শাশুড়ী ঠাকরুণেরও ঠিক একই অভিজ্ঞতা, এক অদ্ভুত কাণ্ড।

ভূমিকম্পের বছরেই আমার স্বামীর জন্ম হয়—৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ সনে। আর ভূমিকম্প হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই ঘটনাটা ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ শহরে। ভূমিকম্পের সময়ে শাশুড়ী ঠাকরুণ দেখেন হঠাৎ কাঁসার বাসন থালা ইত্যাদি শেলফ্ থেকে পড়ে গিয়ে মেজের একটা ফাটলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আর সেই ফাটল দিয়ে গরম জল ও বালি বের হয়ে আসছে।

আর মা গল্প করেছেন, তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। ভূমিকম্পের প্রায় ছয় সাত মাস পরে বিয়ে হয়। তিনি বিয়ের আগে প্রায়ই শ্রীহট্টের মৌলবীবাজারে অলহা নামে একটা গ্রামে তাঁর এক কাকার বাড়ি বেড়াতে যেতেন ও থাকতেন। যখন ভূমিকম্প শুরু হয়, তিনি সেই কাকার বাড়ির রান্নাঘরে ছিলেন, দরজা খুলে পেছনের উঠোনে দৌড়ে বেরোতে যাবেন, এমন সময় উঠোনে এক প্রকাণ্ড ফাটল দেখা দিল এবং উঠোনের ধারে কিছু খাওয়ার বাসন মাজবার জন্য রাখা ছিল, সেগুলো আস্তে করে ফাটলের ভেতর ঢুকে গেল এবং সঙ্গে বালি কাদা ও গরমজল ফোয়ারার মত উঠতে লাগলো।

ভূমিকম্পের পর শিলং শহরকে নতুন করে গড়ে তোলার ভার পড়লো বাবার ওপর। তিনি তখনকার ডেপুটি কমিশনারের পরামর্শে ও চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সাহায্যে সমস্ত শহরটার রাস্তা ঘাট বাগান বাড়ি ইত্যাদির নক্সা করে লোক লাগিয়ে এক অপূর্ব সুন্দর শহর তৈরী করালেন। চারদিকে নানারকম গাছপালা নিজের হাতে পুঁতলেন। শুনেছি এবং আমার ছেলেরা বোনঝিরা সম্প্রতি দেখেও এসেছে যে বহু গাছ এখনও তাদের ডালপালা ছড়িয়ে বিরাজ করছে।

॥ ৪ ॥
আমার বাবা ও মা

আমাদের আদিবাস পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার ঢাকাদক্ষিণের এক পল্লী ফুলসাইন্দ গ্রামে। এখন সেটা নতুন নামের 'বাংলা দেশে'র অন্তর্ভুক্ত। হয়ত বলা দরকার, ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান। এই প্রসঙ্গে একটা আশ্চর্য কথা মনে পড়লো।

ইংরেজ-শাসনের শেষের দিকে মিঃ আর্থার হিউজ, আই-সি-এস্ বাংলা গভর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। দিল্লীতে এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরিচয় হওয়ার একটু পরে আমার পাশে এসে বসে বাংলাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের দেশটি কোথায়?'

আমি যখন বললাম 'শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ', তখন তিনি বলে উঠলেন, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান!' একটি সাহেবের মুখে এই কথা শুনে আমি তো হতভম্ব।

খুব অল্পবয়সেই বাবারা তিনটি ভাই ও দুই বোন পিতৃমাতৃহীন হন। বাবা পড়াশুনা করবার উদ্দেশ্যে শিলং চলে আসেন। দুই কাকা ও দুই পিসিমা দেশেই গ্রামে বড় হতে থাকেন তাঁদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে; এবং দুই পিসিমার খুব কম বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। বাবা পড়াশুনা করবেন বলে উচ্চাশা নিয়ে শিলং চলে আসেন এবং তখনকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ রায়বাহাদুর সদয়চরণ দাসের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতেন। সদয়বাবুও শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। সে সময়ে বাঙালীর মধ্যে যাঁরা অবস্থাপন্ন হতেন তাঁরা বাড়িতে সঙ্গতিহীন ছাত্রদের রেখে তাদের পড়াশুনা করার উৎসাহ দিতেন।

আমরা সদয়বাবুকে দাদামশায়, তাঁর স্ত্রীকে দিদিমণি ও তাঁদের একমাত্র মেয়ে, যাঁর নাম ছিল সরোজিনী, তাঁকে 'মনুপিসিমা' বলে ডাকতাম। ইনি সমস্ত আসামের স্কুলের 'স্কুল ইন্‌স্‌পেকট্রেস্' ছিলেন একসময়ে। আমরা অনেক বয়স পর্যন্ত জানতাম এঁরা আমাদের আপন দাদামশায় ও দিদিমা। এঁনারা দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন। দিদিমণি নিজের হাতে রান্না করে, নিজে পরিবেশন করে, কত যত্ন আদর করে রক্ষিত ছাত্রদের খাওয়াতেন ও সকলের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে নজর রাখতেন সেই গল্প অনেকবার বাবার মুখে শুনেছি।

শিলং থেকে প্রাইভেট্ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বাবা ঢাকায় তখনকার দিনের এফ-এ পড়তে গেলেন। এফ-এ পাস করে আবার শিলং ফিরে এলেন এবং দুই টাকা মাইনের একটা চাকরিতে ঢুকলেন। দাদামশায়ের ওখানেই প্রথম প্রথম থাকতেন। দাদামশায় একটা টিউশনিও জুটিয়ে দিলেন। ক্রমে ক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করে অনেকখানি আয়ত্ত করে ফেললেন।

এর ফলে মিউনিসিপ্যাল আপিসে একটা কাজের খবর পাওয়ার পর দরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মাইনের চাকরি পেয়ে গেলেন। সেই সময়ে দুই কাকাকে শিলং এসে পড়াশুনা করবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু দুজনের একজনও পড়াশুনা দূরে থাকুক, গ্রাম ছেড়েও আসতে চাইলেন না।

বাবা অত্যন্ত সদাশয়, পরোপকারী দয়ালু মানুষ ছিলেন। শিলং-এর সবাই তাঁকে চিনতেন। সমস্ত শিলং-এ তাঁর কর্মকুশলতার কথা ছড়িয়ে পড়ে। দেশী-বিদেশী বড় বড় কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে কুলী মজুর সবাই তাঁকে খুব খাতির ও সমীহ করতেন। কারো কোন দরকার হলেই সোজা বাবার কাছে এসে তাঁর পরামর্শ নিতেন। বাবা কখনও কাউকে বিমুখ করতেন না। সব সময়ে লোকের আপদে-বিপদে নানাভাবে

সাহায্য করতেন।

শিলং-এর খাসিয়া মজুর জাতীয় লোকের মুখে 'বাবু দীন' ছাড়া কথাই ছিল না। ছেলেবেলায় এমন দিন যায়নি যে দেখিনি ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির বাইরে খাসিয়া লোকেরা অন্ততঃপক্ষে তিন-চারজন দেখা করার উদ্দেশ্যে বসে নেই। যদি কোন সাহায্য দিতে পারেন তারই আশায়।

বাবাকে সবাই চিনতেন। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার লিখছি। সম্প্রতি কয়েকবছর আগেকার ঘটনা।

এখানে অক্সফোর্ডে প্রফেসার বিমল মতিলালের বাড়িতে আমাদের দুজনের চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। তাঁদের বাড়ি যাওয়ার পর বিমলবাবুর স্ত্রী করবী একটি ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও ভদ্রলোকের বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক কার্ডিফ-এ ডাক্তার, নাম বিষ্ণুপদ পাল-চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী অনুরাধা খ্যাতনামা দেবপ্রসাদ ঘোষের কন্যা। এক 'উইক-এন্ড' কাটাবার জন্য অক্সফোর্ড এসেছেন। শুনলাম তাঁরা শ্রীহট্টেরই লোক। চা খেতে খেতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমাদের দেশ কোথায় ইত্যাদি সব পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, "আমারও দেশ শ্রীহট্ট। তবে সেখানে কখনও যাইনি। শিলংয়েই জন্ম, সেখানেই বড় হয়েছি এবং শিলং ও কলকাতায় পড়াশুনা করেছি।" শিলং-এর মেয়ে শুনে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা শিলং-এ কোথায় থাকতেন ?" আমি বললাম, "জেল রোডের গোড়াতে, ঠিক মোটর আপিসটার পেছনে আমাদের বাড়ি ছিল।" উনি তখন বললেন, "সেখানে তো 'রায়সাহেব দীননাথ ধর' বলে একজন খুব বিশিষ্ট ভদ্রলোক থাকতেন !" আমি বললাম, "তিনি তো আমার বাবা।" আর উনি বলে উঠলেন, "শ্বশুরমশায় ! শ্বশুরমশায় !" এই শুনে বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন।

তারপর জানা গেল তিনি নিজেও শিলংয়েই তাঁর কাকার বাড়ি থেকে ওখানকার স্কুলে পড়াশুনো করেছেন। কলকাতা থেকে ডাক্তারী পাস করেও শিলংয়েই ডাক্তারী করেছেন। সে সময়ে আমি কলকাতাতেই বেশী থাকি, সুতরাং তাঁকে দেখিনি। তিনি আরও বললেন, ১৯২১ সনে যখন কলকাতায় আমার দিদির বিয়ে হয়, তিনি তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন এবং বিয়েতে এসে আমাদের বাড়ি অনেক কাজকর্ম করেছিলেন। সেই সময়ে বহুলোকের মধ্যে তাঁকে দেখে থাকলেও আমার মনে নেই। তবে তিনি তাঁর কাকাবাবুটির নাম বলতেই মনে পড়লো, তাই তো, সেই ভদ্রলোক তো প্রায়ই নানারকম কাজে বাবার কাছে আসতেন।

আমার বাবা বিয়ে করেন ১৮৯৭ সনে, ভূমিকম্পের পরে। বিয়ের বছর চার পরে আমার দিদির জন্ম হয়। তার জন্মের কিছুদিন পরেই বাবার উপর এক গুরুতর দায়িত্ব ও ভার পড়লো।

আমার দাদামশায় (মা'র বাবা) হঠাৎ অল্প কয়দিনের অসুখে মারা গেলেন। দিদিমা অকূল পাথারে পড়লেন। মা তাঁর বড় সন্তান। তারপরে বড়মামা, একটি মাসী ও ছোটমামা। দিদিমা তখন অন্তঃসত্ত্বা। এই ছোটমাসী ও দিদির মধ্যে মাত্র কয়েক মাসের

তফাৎ ছিল।

দাদামশায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা তখুনি রওনা হয়ে গিয়ে দিদিমা, মাসী ও মামাদের শিলং নিয়ে এসে তাঁদের সমস্ত ভার নিজের মাথার উপর তুলে নিলেন।

আমাদের বাড়ি প্রথমে তিনখানা ঘর বাথরুম-যুক্ত ছিল এবং উঠোনের উল্টোদিকে রান্নাঘর ছিল। রান্নাঘরে তিনখানা কোঠা—একটাতে আমাদের রান্না হোত, মাঝেরটায় খাওয়া হোত এবং পাশের কোঠায় দুটো উনুনের একটাতে প্রায় সারাদিন টিনে করে গরমজল করা হোত। শিলং ঠাণ্ডা জায়গা, সুতরাং স্নান, হাত-পা ধোওয়া ইত্যাদির জন্য সর্বক্ষণ গরমজলের দরকার হোত। আরেকটা উনুনে গরুর খাবার জন্য খুদ, ভুষি ইত্যাদি সেদ্ধ করা হোত।

দিদিমাদের সবাইকে এনে বাবা আমাদের ঘরগুলির সঙ্গেই প্রায় লাগা দুটো বড় কোঠা করে দিদিমা ও মামামাসীদের থাকবার ঘর তৈরী করালেন এবং অন্যধারে দিদিমার জন্য নিরামিষ রান্নাঘর হলো। মামাদের পড়াশুনার ভার বাবাই চালিয়ে যেতে লাগলেন। বড়মামাকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়ে, তিনি আর পড়তে চাইলেন না বলে, একটা চাকরি যোগাড় করে শিলং-এর 'অ্যাকাউন্টস্' আপিসে ঢুকিয়ে দিলেন। পরে ছোটমামাকেও ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়ে কলকাতায় শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও মাসছয়েকের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন এবং পরে রাঁচীর হিনুতে একটি সাধারণ চাকরি নিয়েই চলে যান। বাবা এঁদের সেরকম উচ্চশিক্ষা দেওয়াতে পারলেন না চেষ্টা করেও, সেজন্য বেশ একটু নিরাশই হয়ে যান।

বাবার এই লেখাপড়া করানোর উচ্চাশার ব্যাপার দিদির মুখে শুনেছি। আমাদের একটি ভাই জন্মেছিল মেজদির পর। আমার যেদিন জন্ম হয়, সে সেদিন আড়াই বছর বয়সে মারা যায়। বাবা নাকি এই ভাই-এর জন্মের পর থেকেই বলতেন—"আমি খোকাকে বিলেত পাঠাবো পড়তে।" আমি ১৯৬৮ সনে বিলেত আসবো খবরটা দিদিকে যখন জানালাম, সেই চিঠির উত্তরে দিদি লিখলেন—"বাবা যদিও আজ বেঁচে নেই, তাঁর বড় শখ ছিল আমাদের ভাইটিকে বিলেত পাঠাবেন। যাই হোক, তাঁর সেই উচ্চাশায় আজ তাঁর একটি মেয়ে অন্ততঃ বিলেত যাচ্ছে, এটা আমাদের সকলের কত আনন্দের কথা।"

তিনি লেখাপড়ার দিকে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বাবা এবং আরও কয়েকজন বন্ধু মিলে 'সীলেট্ এসোসিয়েশন' বলে একটা এসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। সীলেট জেলার যে সমস্ত সাধারণ পরিবারের ভাল ছাত্ররা বিলেত এসে পড়াশুনা করতে চাইতেন তাঁদের ঐ এসোসিয়েশন থেকে পড়ার জন্য সাহায্য দেওয়া হোত। জানি না সেটা এখনও আছে কিনা। ঐ ছাত্র বিলেত থেকে পাস করে ফিরে গিয়ে চাকরি পেলে পর কিস্তি করে এই টাকাটা সীলেট এসোসিয়েশনকে আবার ফেরত দিয়ে দেবার নিয়ম ছিল। এতে বহু গরীব বা মধ্যবিত্ত ঘরের ভাল ছাত্ররা পড়বার সুযোগ পেয়েছে।

বাবা যে শুধু লেখাপড়া বা পরোপকারে উৎসাহী ছিলেন তাই নয়। নিজের হাতে

তাঁর বাগান করারও খুব শখ ছিল। তিনি বোম্বাই-এর 'পেস্টনজীপোচা"-র ফার্ম থেকে নানা রকমের ফুল ও তরকারীর বীজ আনিয়ে নিজের হাতে তা থেকে চারা তুলে বাগানে লাগাতেন। আবার অনেক সময় কোন কোন তরকারী বা ফুলের বীজ নিজেও করতেন। শিলং জায়গা ঠাণ্ডা, সেজন্য রকমারি বিলিতি মরশুমি ফুল অতি সহজেই ফুটতো। মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সমস্ত বাড়ী নানা রং-এর ফুলে যেমনি আলো হয়ে থাকতো, তেমনি তার গন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে অপূর্ব সুন্দর একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করতো। জ্যোৎস্নারাতে হাসনাহানা ফুলের গন্ধ কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তো। একটু পরিশ্রম ও যত্ন করে প্রচুর দেশী ফুলও করেছেন। গন্ধরাজ, জুঁই, ধুতুরো, রক্তজবা, স্থলপদ্ম সবই আমাদের বাড়ীর বাগানের শোভা ছিল। বহু চেষ্টা করে বাবা রজনীগন্ধার গাছকেও বাঁচিয়ে ফুল ফুটিয়েছেন।

ওদিকে আবার তরকারীর বাগানেও আমাদের দেশী লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, শশা, সীম, চালকুমড়া, বেগুন, মূলা, পালংশাক ইত্যাদি ছাড়া হতো ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, বীট, শালগম, কত রকমের বীনস্, লেটুস্, রুবার্ব, স্কোয়াস্, টমেটো, ট্রি টমেটো ইত্যাদি। এসব তরকারীর জন্য সব বীজ থেকে নিজে চারা তুলে লাগাতেন।

ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে সর্বক্ষণ বাগান করবার সময়ে থাকার জন্য আমার নিজেরও বাগান করার শখ হয়।

একবার আমাদের বহু পুরনো চাকর স্বরূপদাদি এক কাণ্ড করে বসলো। তরকারীর বাগানটা একেবারে রাস্তার ধারে। একবার তরকারীর বাগানে খুব বেগুন ফলেছে। এক রকম বড় বড় কালো রংএর বেগুনে গাছগুলি ভর্তি হয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে যত লোক যায় সবাই কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

তাই দেখে স্বরূপদাদি হঠাৎ একদিন কোথা থেকে একটা কালো মাটির হাঁড়ি এনে তার উল্টো দিকে চুণ দিয়ে অদ্ভুত একটা মুখ এঁকে বাগানের মাঝখানে একটা বাঁশ পুঁতে তার ডগায় ঝুলিয়ে দিল। মা তাকে কত বারণ করলেন, কিন্তু সে কানেই নিল না। দুপুরবেলা বাবা ইন্‌স্‌পেক্‌শনের কাজ থেকে ফিরে এসে ঐ হাঁড়ি দেখতে পেয়ে ভয়ানক রেগে গিয়েছেন। মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই হাঁড়ি ঝুলিয়েছে?' মা বললেন, 'স্বরূপের কাণ্ড, কত বারণ করলাম, কিছুতেই শুনলো না।' বাবা বললেন, স্বরূপকে বল, আমি বলেছি এই মুহূর্তে ওটা সরিয়ে ফেলতে। ছিঃ! ছিঃ! লোকে আমায় কী ছোটলোক বলে মনে করবে। চাষা-ভুষোরা লোকের নজর লাগবে বলে, তাদের ক্ষেতে ওরকম হাঁড়ি ঝুলোয়। এখন কি আমাকেও চাষাদের শ্রেণীতে যেতে হবে?'

আরেকটা ব্যাপারে বাবা একটা অসাধ্যসাধন করে ফেলেছিলেন।

দিদির যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন একবার একটা ল্যাংড়া আম খেয়ে আমাদের বাড়ীর ভিতরের এক কোণে আঁটিটা মাটিতে গুঁজে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে আমের আঁটি ফেটে তামাটে রংএর পাতা বেরিয়ে একটি চারা দেখা দিল। তাই দেখে বাবা চারাটার নীচে সার ইত্যাদি দিয়ে খুব যত্ন আরম্ভ করলেন। শিলং পাহাড়ে ঠাণ্ডা জায়গা,

তারপর মাটিও চূণাপাথরে ভরা, আমজাতীয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফল ফলে না। কিন্তু বাবার যত্নে আমের চারা প্রায় দেড় হাত উঁচু হয়ে উঠেছে, কিন্তু আশ্বিন মাস আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় ঠান্ডা পড়তে সুরু হয়ে গেল। তাই দেখে বাবা মাকে দিয়ে একটা চটের ঘেরাটোপসেলাই করিয়ে নিয়ে বাঁশের ফ্রেমে করে সেটা খুঁটিতে লাগিয়ে গাছটাকে চটের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতেন সন্ধ্যে হতেই। বেশী ফ্রস্ট পড়বার সম্ভাবনা দেখলে ঘেরাটোপের ওপর আবার একটা কম্বল চাপা দিয়ে রাখতেন। এই করে শীতকালের ফ্রস্টের হাত থেকেও বাঁচিয়ে তুললেন এবং ক্রমশঃ গাছটা বেশ বড় হতে লাগলো।

আমার যখন নয়, দশ বছর বয়স আমগাছ তখন বেশ ডালপালা ছড়িয়ে পাতায় ভর্তি হয়ে উঠেছে। কিন্তু ফলের আর কোন লক্ষণ নেই। গাছ বড় হয়ে যাওয়ার পর শীতকালেও আর ঢাকা দেবার দরকার হতো না। শুধু প্রতিবেশীরাই নয়, সমস্ত শিলং জুড়ে আমগাছের খবর সবাই জেনে গেল। আগে পূজো-পার্বনাদির জন্য সকলে গৌহাটি থেকে আম্রপল্লব আনাতো কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আমগাছের খবর জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর লোকে আম পাতার জন্য এসে হাজির হতো। গাছের ডাল ভেঙ্গে দিতে দিতে গাছের যে অনিষ্ট হতো সে কেউ ভ্রুক্ষেপই করতো না।

তারপর একদিন হলো খুব মজা। সকালে উঠোনে বসে বাবা মাথার চুল ছাঁটাচ্ছেন। শিউপূজন নাপিত চুল ছাঁটতে ছাঁটতে বাবাকে জিজ্ঞেস করলো,— 'বাবুজী, আম ফলতা নেহী হ্যায় ?' বাবা বললেন, 'না ! কোন লক্ষণ তো দেখছি না।' চুল ছাঁটা হয়ে গেলে পর নাপিত অনেকক্ষণ গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, 'বাবুজী ! বাবুজী ! আম্ তো ফল্ গিয়া।' তার চীৎকারে আমরা ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে দেখলাম, সত্যি ! পাঁচ-ছয়টা ছোট ছোট আম গাছের আগডালে ঝুলছে। আমাদের তো বেজায় আনন্দ আম দেখে। আম বড় হয়ে পাকলে পর দেখা গেল সেগুলো ভয়ানক টক। এরপর থেকে প্রতি বছরই বেশ কয়েকটা আম ধরতো কিন্তু টক বলে আর পাকতে না দিয়ে মা কিছু আমের আচার ও কিছু কাঁচা আমের মোরব্বা তৈরী করে ফেলতেন।

বাবা সব ব্যাপারে খুব 'লিবারেল' অর্থাৎ যাকে বলে উদারনৈতিক লোক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর ছিল অদম্য মনের বল ও সাহস। তিনি কিছুতেই বিচলিত ভাব প্রকাশ করতেন না।

বাবার এই মনের বলের ব্যাপারটার, মার মুখে বিশদ বিবরণ শুনেছি। একবার তিনি একেবারে মৃত্যুমুখে শেষ হয়ে যাবার মধ্যে পড়েছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ভাত খাওয়ার পর বাবা মাকে বললেন—"আমায় একটা পান দাও তো, বেশ করে মৌরী, এলাচ সব মশলা দিয়ে। (এমনিতে বরাবর দিনের বেলায় দু-একটা পান খেতেন কিন্তু রাত্রে কখনও খেতেন না) খাবার আগে যে ওষুধটা খাই, সেটা আজ খাবার সময় কেমন একটা গন্ধ বোধ হল, খেতেও মোটেই ভাল লাগছিল না। ওষুধটা খাওয়ার পর থেকেই শরীরটা কেমন কেমন লাগছে।"

মা বাবার হাতে পান দিয়ে, হঠাৎ কি রকম একটা সন্দেহ হতেই, তাড়াতাড়ি যে দুটো তাকে ওষুধ-বিষুধ থাকতো দেখতে গেলেন।

গিয়ে দেখেন, যে ওষুধগুলি উপরের তাকে রাখা হতো সেগুলি নীচের তাকটায়— মালিশের বিষাক্ত ওষুধ ও মলম ইত্যাদি এবং খাবার ওষুধপত্রগুলি উপরের তাকে। সেদিন দুপুরে খাসিয়া মিস্ত্রীরা শোবার ঘর চুনকাম করেছে এবং চুনকাম করবার পর তারা নীচের তাকের ওষুধপত্র উপরের তাকে ও উপরের তাকের সব নীচের তাকে করে রেখে গেছে। মা কিম্বা বাবা কেউই সেটা লক্ষ্য করেননি। মালিশের ওষুধের শিশি কালো রংয়ের ছিল এবং খাবার ওষুধের রংও কালো ছিল। বাবা বুঝতে পারেননি আর মোমবাতির আলোতে স্পষ্ট দেখাও যায়নি। খেয়াল না করে মালিশের ওষুধ আউন্স গ্লাসে ঢেলে নিয়ে খেয়ে ভাত খেয়েছেন।

মা তক্ষুনি আবিষ্কার করলেন যে বাবা ভুল করে ঐ বিষাক্ত মালিশের ওষুধ খেয়ে ফেলেছেন। পাশের ঘরে বড় মামা শুয়ে শুয়ে পড়ছিলেন। মা চিৎকার করে বললেন, 'প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, শিগগির ডাক্তার আনো, উনি বিষ খেয়ে ফেলেছেন!' বড়মামা আর কথা নেই, শীতের মধ্যে খালি পায়ে শুধু একটা গেঞ্জি গায়ে ডাক্তারের বাড়ি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে ততক্ষণে বাবার শরীরে বিষের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, একেবারে ছটফট্ করছেন। দিদি বাবার পাশে বসে ঠক্ঠক্ করে ভয়ে কাঁপছে। মাও অস্থির হয়ে পড়েছেন ভয়ানক। ঐ কষ্টের মধ্যেও বাবা থেকে থেকে দিদির গায়ে হাত বুলিয়ে দিদি ও মা দুজনকেই আশ্বাস দিচ্ছেন ও বোঝাচ্ছেন। কেবলই বলছেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না। বিশেষ কিছু হয়নি আমার।" দেখতে দেখতে ডাক্তারবাবুও এক এন্ডির চাদর জড়িয়ে তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে বড়মামার সঙ্গে এসে হাজির। তখুনি বমি করিয়ে একেবারে পেট 'ওয়াশ' করিয়ে দিলেন এবং কাছে বসে রইলেন। ঘণ্টাকয়েক পরে বললেন, 'আর কোন ভয় নেই। এবারে ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে উঠলেই ভাল হয়ে যাবেন। কপাল ভাল যে ঐ মালিশের ওষুধ খেয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ভাত ও পান খেয়েছিলেন। তার জন্য বিষের প্রতিক্রিয়ার কিছু সময় লেগেছে।'

এই ঘটনার পর বাবা ও মা দুজনেই বিষ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমরা নিজেরাও কোন জিনিস বিষাক্ত জানলে আগে থেকেই তার জন্য সাবধান হয়ে যাই।

আরেকবার অন্য রকমের এক দুর্ঘটনা থেকেও অল্পের জন্য রক্ষা পান। লাবানে কৈলাস দত্ত বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা একদিন রাত্রে তাঁদের বাড়ি গিয়ে খাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছেন। বাবা সন্ধ্যার একটু পরে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে তৈরী হয়ে খেতে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, বাড়ি ফিরতে হয়ত এগারোটা বেজে যাবে।

বাবা বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম, বাইরে দাঁড়িয়ে বলছেন—"দোর খোল"। আমরা পড়াশুনা করছিলাম। মা দরজা খুলে দিতেই বাবা ঘরে ঢুকলেন—তাঁর গায়ের জামা একেবারে রক্তাক্ত। মাথায় ব্যান্ডেজ, ডান হাতও

ব্যান্ডেজে ঝোলানো এবং বাঁ হাতে ভাঙা হ্যারিকেন। ঘরে ঢুকে বললেন, একটা সাহেবের গাড়িতে একেবারে চাপা পড়বার উপক্রম হয়েছিল। অন্ধকারে রাস্তার ধার দিয়ে বাবা যাচ্ছেন, এক সাহেব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, ডিনার খাবার সময় হয়ে গেছে, খুব জোরে গাড়ি চালিয়েছে। সারা সন্ধ্যে ক্লাবে খুব মদ খেয়েছে, কোন জ্ঞান নেই যে রাস্তায় লোক আছে কি নেই।

বাবা তো তার গাড়িতে ভীষণ ভাবে ধাক্কা খেয়ে পাশের জঙ্গলে নালাখন্দে গিয়ে পড়েছেন এবং খুব জোরে সাহেবকে বকে উঠেছেন। সাহেবের তখন জ্ঞান হয়েছে যে সে কাউকে চাপা দিয়েছে। সাহেব এসে বাবাকে বললো, 'চলো, তোমাকে হাসপাতালে দিয়ে আসি।' বাবা আস্তে করে উঠে বললেন, 'তুমি যেরকম মদ খেয়ে চুর হয়ে আছ, এই অবস্থায় বাড়ি ফিরে যাও। অনেক ধন্যবাদ ! আমি কোনক্রমে নিজেই যাবো।' তারপর হাসপাতালে গিয়ে ব্যান্ডেজ ইত্যাদি করিয়ে বাড়ি চলে এলেন।

পরদিন সকালে কৈলাসবাবু লোক পাঠিয়েছেন আমাদের বাড়ি, গতরাত্রে বাবা তাঁদের বাড়ি যাননি কেন খবর নেবার জন্যে। তার একটু পরেই ঐ সাহেব এসে হাজির। বাবার বিছানার পাশে বসে বাবাকে বলছে, 'তুমি যত টাকা চাও, আমি তোমাকে দিচ্ছি। তুমি আমার নামে নালিশ কোরো না।'

বাবা তাঁকে বলে দিলেন, 'আমার কোন টাকারও দরকার নেই, নিশ্চিন্ত থাক তোমার নামে নালিশও করবো না। তবে সাবধান হয়ো নিজে। ভবিষ্যতে ঐ পরিমাণ মদ খেয়ে আর কোন অঘটন কোরো না।'

বাবাকে সহজে কখনও বিচলিত হতে দেখিনি। কখনই হা-হুতাশ করেননি। সমস্ত ঘা একেবারে মুখ বুজে সহ্য করতেন। এই জিনিসটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম ১৯২৪ সনে। সেই বছরে বাবা বিশেষ অসুস্থতার জন্য চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এবং মাসে মাসে পেনসন না নিয়ে টাকাটা একসঙ্গে নিয়ে নেন। যেদিন টাকাটা পেলেন তার পরদিনই শিলং-এর একটি খুব বড় বিশিষ্ট দোকানের মালিক এসে বাবার কাছে তাদের আলুর ব্যবসায়ের জন্য দুদিনের জন্য টাকা ধার চাইলো। বাবা কাউকে কখনো কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস করতে পারতেন না। বাবা এই টাকাটা বের করে দোকানওলাকে টাকা ধার দিয়ে দিলেন। তার কয়েকটা দিন পরেই এই দোকান দেউলিয়া হয়ে গেল। এই নিয়ে তাঁকে একদিনও কোন আলোচনা করতে দেখিনি। কেউ কথাটা তুললে বলতে শুনেছি, 'চেচাঁমেচি করলে তো আর এই টাকা ফেরত আসবে না। ভগবানই সহায় হবেন।' এই দোকানের একটা ব্যাঙ্ক ছিল এবং এই ব্যাঙ্কে বহু লোকের টাকা মারা যায়। তারা সকলেই ব্যাঙ্কের নামে আদালতে নালিশ করে। বাবা উল্টে নালিশ না করে দোকানদারকে নানারকম পরামর্শ দিলেন কি করা উচিত হবে না হবে। বাবা পরে ন্যায্য পাওনা যে টাকা দিয়েছিলেন তার এক চতুর্থাংশ পেয়েছিলেন।

বহুরকম লোকের সঙ্গে বাবার চেনা ও হৃদ্যতা ছিল। রায়বাহাদুর অনুপচাঁদ এক খুব বড়লোক মাড়োয়ারী ছিল। সে নানা কাজে প্রায়ই আসতো বাবার কাছে। তার

খুব বড় দোকান ছিল। তাতে চাল ডাল থেকে সব রকম তৈজসপাতি ছাড়া কাপড় ইত্যাদিও পাওয়া যেতো।

এই অনুপচাঁদ সম্বন্ধে যে বিবরণ শুনেছি তা অতিশয় ভয়াবহ। আগে মজার গল্পটা লিখে নিই।

শিলং-এ মাড়োয়ারীরা কালীপূজোর সময় তারা যাকে বলে 'দেওয়ালী' খুব ঘটা ও জাঁকজমক করে পালন করতো। সব গণ্যমান্য লোককে নেমন্তন্ন করতো। পিদিম জ্বেলে সমস্ত বাড়ি আলোকিত করতো। দোকানের ভিতর নানারকম রংবেরংয়ের আলো, গাঁদাফুলের মালা, রঙীন কাগজের মালা ও ফানুস এবং দেয়ালে বড় বড় আর্সি দিয়ে সাজাতো। লোকে দেখতে যেতো। যে-ই যেতো, তার সামনে থালায় করে মিছ্‌রি, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদি এনে ধরতো কিছু নিয়ে খাবার জন্য, আর গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিত। যারা আবার একটু বেশী ধনী তারা রূপোর 'আতরদানী'তে আতর রেখে সামনে এনে ধরতো।

অনুপচাঁদ খুব ঘটা করে দেওয়ালীর সময় সবাইকে নেমন্তন্ন করতো। একবার বাবার সঙ্গে এই দেওয়ালী দেখবার জন্য আমি আমার ছোটবোন ও আমাদের খুড়তুতো ভাই গিয়েছি। আমার বয়স তখন বছর দশ, ছোটবোন আট ও খুড়তুতো ভাই এগারো বছরের। আমরা অনেক মাড়োয়ারীর দোকান ঘুরে ঘুরে দেখে অনুপচাঁদের দোকানে গেলাম। আমাদের খুব অভ্যর্থনা করে বসিয়ে নানারকম পট্‌কা, আতসবাজী ইত্যাদি পোড়ানোর পর অনুপচাঁদ বাবাকে অনুরোধ করে বললো, 'আমরা তিনজন যদি একটু কিছু খাই তার বাড়িতে, তাহলে সে খুব খুশী হবে।' বাবা বললেন, 'বেশ তো।' আমাদের বললেন, 'যাও লালাজীর সঙ্গে বাড়ির ভেতরে, কিছু খেয়ে এসো।'

অনুপচাঁদ লালাজী খুব খাতির করে আমাদের তিনজনকে তার রান্নাঘরে পৌঁছে দিল। রান্নাঘরে ঢুকে দেখি ঘরের এক কোণে টিম্‌টিম করে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। আর অনুপচাঁদের স্ত্রী ও তাদের চাকর উনুনে কাঠের আগুন জ্বেলে দুদিকে দুজন বসে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক খাচ্ছে আর খুব গল্প করছে। আমাদের দেখে অনুপ-গিন্নী হেড়ে গলায় 'আও আও' বলে উঠলো। তারপর চাকর ও গিন্নী দুজনেই বলতে লাগল, 'বইঠ্‌ যাও ! বইঠ্‌ যাও !' বসবার কোন আসন বা পিঁড়ি কিছুই নেই। এবড়ো-খেবড়ো মাটির রান্নাঘরের মেজে, বসবো কোথায় ? আমরা কি করবো বুঝতে না পেরে ইতস্ততঃ করছি। এর মধ্যে গিন্নী আবার জোরে বলে উঠল, 'বইঠ্‌ যাও !'

অগত্যা আমরা উবু হয়ে বসলাম। চাকর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটে পেতলের থালা এনে ঝনাৎ ঝনাৎ করে আমাদের সামনে ফেলে দিল। তারপর তিন হাত দূর থেকে পুরি, আলুর তরকারী, আমের আচার, লাড্ডু, মন্ডা ইত্যাদি ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের থালায় ফেলতে লাগলো। তারপর দুজনেই বললো, 'আচ্ছাসে খা লেও।' বলে আবার দুজনে গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে লাগলো আর খুব খোসমেজাজে গল্প করতে লাগলো।

দু'চার টুকরো পুরি খেলাম বটে কিন্তু আলুর তরকারী বা আচার ঝালের চোটে মুখে দেয়া গেল না। লাড্ডু দু'এক কামড় খাওয়ার পর আমরা উঠে দাঁড়ালাম। তখন

চাকরটা এক ঘটি জল নিয়ে বাইরে গিয়ে বললো, 'ইধার আও!' এরপর প্রায় একেবারে দুহাত উপর থেকে হাতে জল ঢেলে দিল হাত ধোবার জন্য। বাড়ি এসে মাকে সব বলাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তবে আমরা কোন অভদ্রতা করিনি তো— জিজ্ঞেস করলেন।

'অনুপচাঁদ প্রথমে একজন অতি সাধারণ অবস্থার লোক ছিল। কিন্তু ১৮৯১ সনে একটি ঘটনা হওয়ার পর গবর্ণমেন্ট থেকে তাকে রায়বাহাদুর পদবী দেওয়া হয় এবং তার আর্থিক অবস্থাও বেশ ফিরে যায়।

মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ রাজাকে সরিয়ে কুলচন্দ্র বলে একজনকে রাজা করেছিল। ইংরেজরা সেটা মানতে প্রস্তুত ছিল না। এজন্য মণিপুরে বিশেষ গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। এসব মিটমাট করবার জন্য আসামের চীফ কমিশনার কুইন্টন সাহেব আরও চারজন সাহেবকে নিয়ে মণিপুরে যান। সঙ্গে দেশীয় হিন্দু কয়েকজন অন্য কর্মচারীও গিয়েছিলেন। এই লোকদের পাচক হিসাবে অনুপচাঁদও গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরে অনুপচাঁদ রান্না করছে। অল্পদূরের ঘরে সাহেবরা কথা বলতে ব্যস্ত। হঠাৎ অনুপচাঁদ লক্ষ্য করলো চারদিক কেমন নিঝুম। সে এদিক ওদিক করে দেখলো অন্য ঘরের দরজা বন্ধ। কি হচ্ছে দেখবার জন্যে কৌতূহলবশে দরজার একটা ফুটোতে চোখ দিয়ে দেখে কুইন্টন সাহেবের মাথাকাটা দেহ পড়ে আছে এবং অন্যান্য সাহেবও মৃত। সে তখন সেখানকার সব ফেলে অন্ধকারে বেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বহুদূর গিয়ে খবর দেওয়ার পর গবর্ণমেন্ট জানতে পারে ও পরে সৈন্যদল গিয়ে সবাইকে ধরে ফেলে। পরে টিকেন্দ্রজিৎ-এর ফাঁসি হয়েছিল ও যুবক রাজা কুলচন্দ্র নির্বাসিত হয়। এরপরই অনুপচাঁদের অবস্থা ফিরে যায় ও রায়বাহাদুর পদবী পাওয়ার পর সকলে তাকে খুব খাতির করতে আরম্ভ করে।

কুইন্টন সাহেবের নামে একটি 'হলঘর' তৈরী হয় শিলং-এ। এবং এখনও কোন কিছু আমোদের জন্য কিম্বা লেকচার ইত্যাদি বা নানারকম 'মিটিং'-এর জন্য লোকে ঐ বড় হল্-এ একত্র উপস্থিত হয়।

বাবার সঙ্গে দেশী-বিদেশী সকলের সঙ্গেই অতিশয় হৃদ্যতা ছিল। বহু উচ্চপদস্থ ইংরেজের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমার জন্মের আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। তখনকার দিনে বাংলা বিভাগের পর যে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গড়া হয়েছিল, তার লেফটেনাণ্ট-গভর্নর ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড্ ফুলার। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, উচ্চস্তরের ইংরেজ ছিলেন, তবে একটু ক্ষ্যাপাটেও ছিলেন। তিনি বাবাকে খুবই খাতির করতেন। লেফ্টেনাণ্ট-গভর্নর হলেও তাঁর অভ্যেস ছিল পায়ে হেঁটে শিলং শহর কি রকম আছে না আছে দেখা। বাবা শিলং শহরের তত্ত্বাবধান করতেন বলে ফুলার সাহেব তাঁকে প্রায়ই সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন।

একদিনের এই ঘোরার গল্প, আমাদের বিয়ের পরই অক্টোবর ১৯৩২ সনে উনি যখন শিলং গেলেন তখন বাবা ওঁকে বলেছিলেন। প্রসঙ্গটা উঠেছিল উনি ভোরবেলা উঠে শিলং-এর পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোরার ব্যাপারে। ভোরবেলা বেরিয়ে গিয়ে উনি বেশ

দেরী করে বাড়ি ফিরতেন, তাতে বাবা-খুব চিন্তিত বোধ করতেন। শিলং-এর উত্তর পূর্ব কোণের দিকে মৌপটের পাহাড় ও জঙ্গল ছিল। তাতে উনি একলা বেড়াতে যেতেন। বাবা বলতেন, সেখানে মাঝে মাঝে নেকড়ে ও হায়েনা দেখা যায়, ওসব জায়গায় না যাওয়াই ভাল। উনি অবশ্য সে-সব কথায় কোন ভ্রূক্ষেপই করতেন না।

এক সকালে উনি অনেক গভীর 'গর্জ'-এ (কুরুং-এ) নামা-ওঠা করে শেষে যে গর্জে উম্‌শির্‌পি ও উম্‌খ্রা নদী মিলেছে (যেখানে তখন শিলং-এর হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস ছিল) সেখান থেকে প্রায় চারশো ফিট্ উঠে শিলং-গৌহাটি রোডে এলেন। তাঁর এইভাবে পাহাড়ে ওঠানামা ইত্যাদি বাবার ভাল লাগতো না। আমার বিয়ের বেশ কয়েক বছর আগে এক নতুন জামাই বিশপ্ ফল্‌স্ দেখতে গিয়ে তার উল্টোদিকের পাহাড় থেকে পা ফস্কে পড়ে গিয়ে এক পাইন গাছে মৃত অবস্থায় ঝুলে ছিল। এর জন্যই বাবা বিশেষ চিন্তা করতেন।

যাই হোক, সেদিন যখন উনি এসে 'গর্জ' থেকে ওঠার কথা বললেন, তখন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের পাল্লায় পড়ে বাবাকে একদিন কি ভাবে সেই 'গর্জ' থেকে উঠতে হয়েছিল তার কথা বললেন।

সাহেব ও বাবা প্রথমে রাস্তা দিয়ে নেমে 'গর্জে' গেলেন। কিন্তু ফিরবার সময়ে ফুলার সাহেব বললেন, 'দীননাথবাবু, আমি কিন্তু রাস্তা দিয়ে না গিয়ে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠবো। তুমি আমার সঙ্গে আসবে, না রাস্তা দিয়ে যাবে?' বাবা বাঙালীর জাতীয় সম্মানের কথা ভেবে সাহেবের সঙ্গে উঠতে রাজী হলেন। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে গিয়ে সাহেবকে ও বাবাকে অনেক সময় হামা দিতে হলো। বাবা অবশ্য শুধু প্যান্টের কিছু ক্ষতি স্বীকার করে উঠে এলেন। কিন্তু অভ্যেস না থাকায় তাঁকে গায়ের ব্যথার জন্য দুদিন শুয়ে থাকতে হয়েছিল।

উনিও অন্যের এই অবস্থা করেছিলেন। উনি একদিন আমার এক চৌদ্দবছরের মামাতো ভাইকে নিয়ে শিলং-'পীক'-এ গেলেন। সেটা শিলং শহর থেকে প্রায় ১৫০০ ফুট ওপরে ৬,৪০০ ফুট উঁচু। আর একদিন আমার ছোটবোনকেও (সে তখন বেথুন কলেজে বি. এ. পড়ে) আপার শিলং-এ নিয়ে গেলেন। দুজনকেই দুদিন শুয়ে থাকতে হয়েছিল।

ওঁকে কিন্তু গায়ের ব্যথা বা কিছুতে শুতে দেখিনি। তবে শিলং-এ অতিরিক্ত ওঠা-নামা করার ফলে কলকাতা ফিরে এসে 'হার্টে'র অসুখে কাবু হয়ে পড়লেন। সারতে প্রায় দেড় বছর লেগেছিল।

হিন্দু হলেও বাবা ও মা খুবই ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং সর্বক্ষণ ব্রাহ্মোৎসব ইত্যাদিতে যোগ দিতেন। কিন্তু একটা বিষয়ে বাবা কিছুতেই হিন্দুয়ানীর সংস্কার ছাড়তে পারেননি। সেটি হলো কখনও কাউকে কোথাও যেতে হলে সেই যাত্রার শুভলগ্ন পালন করা। আমাকে কত সময় কলকাতায় বোর্ডিং-এ থেকে পড়াকালীন দশদিনের মধ্যে ভাল দিন নেই বলে কয়দিন আগে থেকে গৌহাটি গিয়ে সেখানে চেনা কারো বাড়ি অপেক্ষা করে পরে কলকাতা রওয়ানা হতে হয়েছে। সেটা যে রীতিমত কতখানি

কষ্টকর সেটা তাঁকে বোঝানো মুশকিল হতো।

আরেকবার হয়েছিল আমার বিয়ের ৯ বছর পর। একবার পূজোর সময় ছেলেদের নিয়ে আমি ও উনি ন-দেওরের কাছে জামসেদপুর বেড়াতে যাবো। আমরা যেদিন রওয়ানা হব বলে ঠিক করেছি, বাবা শুনে তাড়াতাড়ি পঞ্জিকা খুলে বসলেন, একটু পরে বললেন, 'না, এখন যাওয়া হতেই পারে না। কয়দিন সময় একেবারেই ভাল নেই।' উনি তো এসব একেবারেই মানেন না, এবং মানতে প্রস্তুতও নন। তারপর শ্বশুরে-জামাতাতে অনেক কথার পর ঠিক হলো, আমাদের সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে কিন্তু তখন ওপরতলা থেকে রওয়ানা না হয়ে বেলা তিনটের সময় ওপরতলা থেকে যাত্রা করে নীচের তলার ঘরে গিয়ে বসে থাকতে হবে এবং সন্ধ্যেবেলা স্টেশনে রওয়ানা হবো। বাবার কথার অবাধ্য হওয়াটা অন্যায় সেই মনে করে তাঁর এই খেয়াল আমরা কখনও অমান্য করবার চেষ্টা করিনি। সব সময়েই আমাদের সকলের জন্য এবং বন্ধুবান্ধব চেনা-পরিচিতের জন্য কি করবেন না করবেন ভেবেই পেতেন না। এছাড়া ছিল গরীব দুঃখী আর্তের সাহায্য করবার চিন্তা। এজন্য সবাইকার খুব শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বাবার মত আমার মাও ছিলেন অতিশয় সাদাসিধা ভালমানুষ। তাঁর মুখে সদাই হাসি লেগে থাকতো। কিন্তু সাদাসিধা মানুষ হলে কি হবে, চরিত্রের মধ্যে তাঁর একটা সাংঘাতিক দৃঢ়তা ছিল। কখনও কোন অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। কথায় কথায় সব সময় বাইবেলে যীশুখৃষ্ট কি বলেছেন সেসব নিয়ে আলোচনা করতেন। একবার আমার বড় বোনপো স্কুলে তার সঙ্গীদের হাতে মার খেয়ে এসে বাড়িতে কেঁদে নালিশ করতে আমি ও আমার ছোটবোন বললাম, 'তুই দিলি না কেন উল্টে মার !' মা অমনি বলে উঠলেন, 'না রে দাদা, ওসব করতে নেই। জানিস, যীশুখৃষ্ট বলেছেন কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে অন্য গালটা বাড়িয়ে দেবে।' 'কুইন ভিক্টোরিয়া'র যুগের মানুষ বলে কথায় কথায় 'কুইন্ ভিক্টোরিয়া'র উদাহরণ দিতেন আমাদের কাছে।

মার পড়াশুনার দিকে এবং সব জানবার জন্য অসম্ভব ঝোঁক ছিল। তিনি ইংরেজী জানতেন না, কিন্তু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বাবা নানারকম বই বাংলায় কিনে দিতেন। বাংলায় লেখা পুরো সেক্সপিয়রের ওয়ার্কস, ইলিয়াড ইত্যাদি সব বই তাঁর ছিল। আগের কালের 'প্রদীপ', 'তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি মাসিক পত্রিকা রাখতেন। কিছু 'প্রদীপ' পত্রিকা বাঁধানো এখনো আমার কাছে আছে। পরেকার সময়ের 'প্রবাসী', 'নারায়ণ', 'ভারতবর্ষ' এসব রাখতেন। এছাড়া মানকুমারী দাসীর 'কনকাঞ্জলি', 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' সব কবিতার বই কিনেছিলেন এবং পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে ডাকযোগে আনিয়েছিলেন। কামিনী রায়-এর (বিবাহের আগে সেন) কবিতার বই 'আলো ও ছায়া'ও বসে বসে পড়তেন এবং সব বই-ই আমাদের পড়ে শোনাতেন।

এসব বইয়ের আলোচনা করবার জন্য মাঝে মাঝে লাবানে মাসীমার ওখানে যেতেন। মাসীমার নাম ছিল সারদামঞ্জরী দত্ত ; ইনি দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন। বহু বয়স

পর্যন্ত আমরা এঁকে নিজের মাসী বলেই জানতাম। বড় হয়ে শুনি উনি মাকে একেবারে ছোটবোনের মত ভালবাসতেন ও দেখাশোনা করতেন। লাবানটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে ছিল। আমি যখন ছোট, মা তখন লাবান যেতেন খাসিয়ার পিঠে 'থাপায়' চড়ে। এই 'থাপা' ছিল ঠিক একটা বাঁশের চেয়ারমত এবং সেটা খাসিয়ারা পিঠে আটকে রাখতো মাথার সঙ্গে একটা বেতের বোনা ফিতে দিয়ে। মা আমার ছোটবোনকে কোলে নিয়ে বসতেন। দিদি, মেজদি ও আমি সঙ্গে হেঁটে যেতাম।

মা আমাদের জন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' বই থেকে অভিনয় করবার জন্য আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন।

রোজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে আসার পর আমরা বাড়ির ভেতরে উঠোনে বোনেরা মিলে হাডুডু খেলতাম, চোখ বেঁধে কানামাছি খেলতাম, মা-ও এসে প্রায়ই আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন।

নানারকম শিল্পকলার দিকেও মার খুব ঝোঁক ছিল। তাঁকে দেখেছি সুন্দর সুন্দর ডিজাইন এঁকে নিয়ে নরুণ দিয়ে কাগজ অতি সূক্ষ্মভাবে কাটতেন, সেসব শিল্প এখন আর কেউ জানে বলে সন্দেহ হয়। আমার কাছে মায়ের সেই হাতের কাজ এখনও কিছু আছে। মিশনারী মেমদের কাছে উল দিয়ে মোজা টুপি সোয়েটার বোনা সব শিখে বাবা ও আমাদের জন্য বুনে দিতেন। শিলং ঠাণ্ডা জায়গা ; অনেক সময়েই বর্ষাকালে ও শীতকালে আগুন জ্বালাতে হয়। কত রাত পর্যন্ত আগুনের পাশে বসে বসে বোনার কাজ করতেন। শুধু যে আমাদের জন্য বুনতেন তাই নয়, নানান জনকে বুনে দানও করতেন। কারো সন্তান জন্মেছে শুনলে সদ্যোজাত শিশুর জন্য কাঁথা জামা তৈরী করে মোজা টুপি বুনে নিয়ে গিয়ে শিশুর মুখ দেখতেন।

তাঁর হাতের রান্না ও খাবার অতি সুস্বাদু হতো এবং এমন নিপুণভাবে তৈরী করতেন যে দেখতেও অতি সুন্দর হতো। 'নারকেলের তক্তি', 'গঙ্গাজলি' থেকে আরম্ভ করে 'সন্দেশ' 'রসগোল্লা', 'পান্তুয়া' কোনটারই তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর হাতের 'খাজা' যেমনি হতো দেখতে, তেমনি হতো খেতে। আর করতেন নিজেদের বাড়ির গরুর দুধ ঘন ক্ষীর করে তাই দিয়ে মালপোয়া, আর দুধ মৃদু আঁচে রেখে মোটা সর পেতে, সেই সর দিয়ে 'স্বরভাজা' ও 'সরের নাড়ু'। এছাড়া শীতকালের পৌষপার্বণ সবই পালন করবার জন্য কত রকমারি পিঠে, পায়েস ইত্যাদি। নানা রকমের ফল দিয়ে জ্যাম ও জেলী এবং আনারসের ও কাঁচা আমের মোরব্বাও অতি চমৎকার তৈরী করতেন। তিনি নিজের হাতে বাড়িতে ঘি তৈরী করতেন। লুচি সিঙ্গাড়া নিমকি কচুরী ইত্যাদি ভাজবার জন্য কখনই দোকানে ঘি কিনতে দেখিনি।

আমাদের উচ্চশিক্ষা দেবার উৎসাহ বাবার চাইতেও তাঁর দ্বিগুণ বেশী ছিল এবং তিনিও খুবই 'লিবারেল' ছিলেন।

অসম্ভব পরিষ্কার মানুষ ছিলেন। কোন কিছু নোংরা, অগোছালো একদম সহ্য করতে পারতেন না। আমার বড় ছেলে জন্মাবার কিছুদিন আগে আমাদের

শ্যামবাজারের ফ্ল্যাট বাড়িতে এসেছিলেন। ফ্ল্যাটটি একেবারে আপার সার্কুলার রোডের ওপরে ছিল। বারান্দায় 'কন্‌ক্রিট্‌'-এর জালিকাটা রেলিং ছিল। রাস্তা থেকে ধুলো এসে জালিগুলোর ভেতর জমে আছে দেখে হঠাৎ ছোট দেওরের কাছে গিয়ে বললেন, 'বিনু, একটা পুরনো দাঁত পরিষ্কার করবার ব্রাশ দিতে পারো?' ছোট দেওর খুঁজেপেতে একটা বের করে দিলেন। একটু পরে বারান্দায় গিয়ে দেখি মা বসে বসে সেই ব্রাশ দিয়ে ঘষে ঘষে একটা একটা করে সেই রেলিং-এর জালি পরিষ্কার করছেন।

১৯৩৩ সনে শিলং ছেড়ে এসে মা, বাবা কলকাতায় ভবানীপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। একদিন আমরা ওঁদের ওখানে গিয়েছি। উনি নিজের জুতো খুলে সামনেই মায়ের একজোড়া চটি ছিল সেটা পায়ে দিয়ে দিদির বাড়ি গিয়েছেন। দিদি পাশের বাড়িতে থাকতেন। ফিরে আসার পর আমার ছোটবোন ওঁকে বললো, 'করেছেন কি!' উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি?' ছোটবোন বললে, 'মার ঘরে পরবার চটি পায়ে দিয়ে রাস্তায় হেঁটে গেছেন! ঐ দেখুন, মা বাথরুমে কলতলায় চটি ধুচ্ছেন!' এসবের জন্য আমরা হাসতাম ও তাঁকে বলতাম—মার 'ব্রাহ্ম শুচিবায়ু'। কিন্তু তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপও করতেন না।

তিনি সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা বসে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' নিয়ে গুনগুনিয়ে গান গাইতেন ও 'দৈনিক' বই পড়তেন। তাঁর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ও 'দৈনিক' দুখানা বই তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন।

পূজোআচ্চার বিশেষ কোন বালাই তাঁর ছিল না কিন্তু প্রতি বছর নিয়মমত খুব নিষ্ঠার সঙ্গে 'মঙ্গলচণ্ডী'র ব্রত পালন করতেন। বাবার কাছ থেকে তাঁরও কেউ কোথায়ও রওয়ানা হবার সময় দিনক্ষণ দেখার অভ্যেস হয়েছিল। যেদিন সন্ধ্যায় মারা গেলেন, তার অল্প আগেও পঞ্জিকা খুলে দেখলেন সেই দিনটি কেমন? কারণ সেদিন উনি (আমার স্বামী) কলকাতা থেকে দিল্লী এ-আই-আর-এর চাকরি নিয়ে রওয়ানা হয়ে আসেন।

তিনি হঠাৎ হার্টফেল করে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে মারা যান। যেদিন সন্ধ্যায় মারা গেলেন সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে আমার ছোটবোনকে শিলং-এ আমাদের কোন্‌ সিন্দুকে কি বাসন ইত্যাদি আছে, অন্যান্য জিনিসপত্রের কথা, তারপর তাঁর নিজের গয়না ইত্যাদি তিনি কাকে কি দিয়ে যেতে চান—এসব কথা বুঝিয়ে বলতে থাকেন। ছোটবোন তাঁকে বিশ্রাম করতে বলাতে বলেছিলেন, 'না রে, সব আগে থেকে বলে দিয়ে যাই, কোন্‌ সময় একা মরে পড়ে থাকবো—তোরা কেউ কিছু জানবিও না।'

হয়তো অলৌকিক কোন কিছু একটা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল—যে তাঁর পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে। আমার বাবা সে-সময়ে খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁরই প্রাণাশঙ্কা ছিল, সেই মানুষকে রেখে মা হাসিমুখে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

আমাদের চারটি বোনকে নিয়ে ছিল মা ও বাবার সংসার। দিদির নাম সরোজবালা

(ডাকনাম খুকী), মেজদির নাম উষাবালা (ডাকনাম ঐ), আমি—অমিয়া (ডাকনাম টুনু) ও ছোটবোন শোভনা (ডাকনাম পুঁটু)।

আমাদের নিয়ে বাবার ছোট সংসার হলেও, তাঁদের অন্তরের হৃদ্যতার জন্য বহু লোক নিয়ে বাড়ি সব সময়ে জমজমাট থাকতো। আমার যখন বছর দশেক বয়স সেই সময়ে বড়কাকার ১১ বৎসরের বড়পুত্র বীরেন্দ্রকুমারকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন বলে বাবা গ্রাম থেকে আনিয়ে নিলেন, এবং সেও আমাদের একেবারে নিজের ভাইয়ের মত পরিবারভুক্ত হয়ে পড়াশুনা করে বড় হলো।

ছেলেবেলায় দেখেছি বাড়িতে অনেকসময়ে অচেনা লোকও অতিথি হিসেবে এসে যেতো। শিলং-এ আছে 'পাস্তোর ইনস্টিটিউট' হাসপাতাল। সেখানে বাংলাদেশ ও আসামের যত শেয়াল-কুকুরে কামড়ানো লোক চিকিৎসার জন্য আসে।

আমাদের বাড়ি বাস স্টেশনের একেবারে লাগালাগি ছিল। অনেক সময় রাত দশটার 'মেল' গাড়িতে এরকম শেয়াল-কুকুরে কামড়ানো কোন কোন পরিবার এসে পৌঁছে বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে সোজা আমাদের বাড়ি হাজির হতো এবং বাড়ির বাইরে থেকে জোরে আওয়াজ করে বলতো, 'কেউ কি জেগে আছেন, কর্তা? এক রাত্তিরের জন্য আশ্রয় দেবেন কি?' বাবা সেই শুনে তখুনি বেরিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, একখানা অতিথি-ঘর আলাদাই থাকতো তা খুলে দিতেন এবং মা বাবা দুজনে নিজেরাই অতিথিসেবা শুরু করে দিতেন। চাকররা তাদের কোয়ার্টারে গিয়ে শুয়ে পড়েছে, তাদের আর বিরক্ত করতেন না। মাও বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার আগুন জ্বেলে অচেনা অতিথিকে ভাতেভাত রেঁধে খাইয়ে তবে দুপুররাতে শুতেন। এসব রুগীরা স্যানাটোরিয়ামে থাকতে পেতো, কিন্তু অনেকসময় সেখানে জায়গা না পাওয়ার দরুন এক রাত্তিরের জায়গায় তাদের এক সপ্তাহও থাকা হয়ে যেত এবং তাদের দেখাশুনা করার জন্য কখনও কেউ বিরক্ত বোধ করেননি। সামাজিক কর্তব্যবোধের কখনও কোন ত্রুটি হয়নি।

॥ ৫ ॥
বাল্যকালের অবিস্মৃত ঘটনাবলী

অতি শৈশবকালের কতকগুলি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে, আবার অনেক কিছুর একেবারে কোন স্মৃতিই নেই। ১৯১২ সনে পঞ্চম জর্জের করোনেশনের পর মনে পড়ে ১৯১৩ সনের শেষদিকে দিদি, মেজদিদের শিলং মিডিল ইংলিশ স্কুলের পুরস্কার বিতরণের দিনের কথা। বয়স তখন আমার চার পেরিয়েছে।

সব ছাত্রীদের আত্মীয়স্বজনরা ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হয়ে স্কুলে এসেছেন। বাবা আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তার একটু পরে ইংরেজ স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার এসে তাঁর চেয়ারে বসলেন। স্কুলের মেয়েরা নানারকম গান ও আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলো। এর মধ্যে হেড্‌মিস্ট্রেস্ মিস্ দাস হঠাৎ এসে আমার হাত

ধরে টেনে নিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, "তুমি তোমার কবিতাটা শুনিয়ে দাও।" আমি খুব তখন গদ্‌গদ অবস্থায় "মোহনভোগ" বই থেকে শেখা একটি শিশুর কবিতা—

নামটি আমার গদাধর
সবাই ডাকে গদা
সারাদিনটি রোদে টো টো
গায়ে ধুলো কাদা—ইত্যাদি

কবিতাটি আওড়ে গিয়ে আবার বসলাম। এই সময়ে স্কুলের মেয়েদের একে একে নাম ধরে ডাকা হচ্ছে এবং তারা রঙীন ফিতে দিয়ে বাঁধা নানারকম পুরস্কার নিয়ে যার যার জায়গায় গিয়ে বসছে। হঠাৎ আমার ডাক পড়লো। আমি তো তখন স্কুলে পড়ি না। আস্তে করে ভয়ে ভয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমায় বললেন, "টুমি বড় সুন্ডর আবৃট্টি করিয়াছ। এই জন্য টোমাকে এই পুরস্কার ডিটেছি।" এই বলে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা একটি 'লজঞ্চুসে'র থলে আমার হাতে দিলেন। সকলে "নমস্কার করো, নমস্কার করো" বলে ওঠাতে হাত তুলে একটি ছোট নমস্কার করে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলাম এবং আস্তে করে থলে খুলে লজঞ্চুস খেতে আরম্ভ করলাম। পাশের অন্য ছোট মেয়েদের দুই-একটা দিলাম। তারপর বাড়ি ফেরার পথে একে একে একাই সবগুলি খেয়ে থলে খালি করে ফেললাম।

বাড়ির কাছাকাছি প্রায় গিয়েছি, তখন মেজদি বললেন, "টুনু! লজঞ্চুস কি করেছিস? থলেটা কোথায়?" আমি বললাম, 'সব খেয়ে ফেলেছি আর থলে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছি।' মেজদি তখন খুব বকুনি দিয়ে বললেন, থলে কেন রাস্তায় যেখানে সেখানে ফেললাম! আরও বললেন, 'বাড়িতে ছোট বোনটা রয়েছে, তাকে না দিয়ে তুই একা একা সবগুলি খেয়ে ফেললি! ভারী দুষ্টু মেয়ে তুই।' মেজদির কাছ থেকে এই বকুনি খাওয়ার পর থেকে জীবনে কখনও আর একা একা ছোট বোনকে বা আর কাউকে ভাগ না দিয়ে কিছু খাইনি। তারপর কিছুদিনের আর কোন ঘটনা মনে নেই।

শুধু মনে পড়ে গত প্রথম মহাযুদ্ধের কথা। সেটা ১৯১৪ সনের একদিন। বাবা বাইরে থেকে এসেই মাকে বললেন, 'ইংরেজ-জার্মানে যুদ্ধ লেগে গেল।' যুদ্ধের ব্যাপার সেই সময়ে কিছুই বুঝতাম না যদিও, তবু যখন বাবাকে দেখতাম খবর-কাগজ পড়ে অন্যান্য বন্ধুবান্ধব যাঁরা আমাদের বাড়ি আসছেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং সন্ধ্যেবেলা বসে মাকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব বলছেন, তখন বুঝে নিয়েছিলাম একটা গুরুতর কিছু হচ্ছে।

সেই সময়কার একটা কথা খুব মনে পড়ে। সকলেই দেখা হওয়ামাত্র খুব আলোচনা আরম্ভ করতেন,—চালের ও কাপড়ের দাম খুব বেড়ে গেছে এবং কে কত করে চালের মণ ও কত করে জোড়া কাপড় কিনছেন?

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা মনু-পিসিমা (দাদামশায় সদয়াচরণ দাসের একমাত্র মেয়ে, ভাল নাম সরোজিনী) বান্ডিল বান্ডিল গ্রে রংয়ের উল ও কাঁটা এনে মাকে দিলেন এবং কি কি বুনতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। এসব সৈন্যদের জন্য।

সব কাজকর্মের পর মা অনেক রাত পর্যন্ত আগুনের ধারে বসে বুনতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা মা বসে বুনছেন, আমি পাশেই একটা মোড়া নিয়ে আগুনের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কার জন্য বুনছেন?' মা বললেন, 'যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, এসব মোজা, গলার কম্ফরটার, দস্তানা (হাতমোজা) আমাদের যেসব সৈন্য মেসোপটামিয়াতে যুদ্ধ করছে তাদের জন্য। তারা ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। সব উল বোনা হয়ে গেলে মনু-পিসিমা সেগুলি নিয়ে যাবেন এবং একসঙ্গে জড় করে নিয়ে সৈন্যদের পাঠানো হবে।' দেখতে দেখতে বেশ কয়েকজোড়া মোজা, দস্তানা ও কম্ফরটার মা তৈরী করে ফেললেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে দিদি, মেজদিও কয়েকজোড়া মোজা বুনে মাকে সাহায্য করলেন।

মা ও দিদিদের বুনতে দেখে আমারও বোনার খুব শখ হলো এবং উল কাঁটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে খুব ছেলেবেলাতেই বুনতে শিখে ফেললাম। আট বছর বয়সে ছোট শিশুদের মোজা, টুপি সব বুনে ফেলতে লাগলাম। সেই যে একটা নেশার মত ঐ অভ্যেস হয়ে গেল, এখন আশী বছরে পড়েও তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। রোজই এখনও আমার কিছু না বুনতে পারলে মনে হয় কিছু একটা দিনের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

এই সময়ে স্কুলে নার্সারী ক্লাসে ভর্তি হলাম। আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দিয়ে অক্ষর শেখানো হলেও, স্কুলের দেয়ালে ঝোলানো থাকতো লাল সবুজ রংয়ের বড় বড় অক্ষরে ছাপা চার্ট। শিক্ষয়িত্রী বলা মাত্র একটা 'পয়েন্টার' নিয়ে দৌড়ে গিয়ে কোনটা কি অক্ষর দেখাতে হতো। তারপর রঙীন চক্ দিয়ে বোর্ডে সেই অক্ষর লিখতে হতো। অক্ষর বেশ শেখা হয়ে যাওয়ার পর ছোট ছোট লাইন পড়া শুরু হতো, 'পাতা নড়ে, জল পড়ে' ইত্যাদি। এই রং-বেরং-এর কালিতে লেখা শব্দ দেখতে খুব ভাল লাগতো।

পরের বছর যুক্তাক্ষর শেখার পালা এলো। কিছুতেই আর 'ক্ষ' অক্ষর পড়তেও পারি না, উচ্চারণ করতেও পারতাম না। একদিন যখন আমার পালা এলো চার্টের লেখা পড়বার জন্য, পড়তে পড়তে কেবলই 'দ্রাক্ষাফল' পড়তে গিয়ে আটকে গেলাম। টিচার 'আবার পড়', 'আবার পড়', বলে দু-তিনবার হুঙ্কার দেওয়ার পর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম।

তারপর জানি না, টিচার মেজদিকে ডেকে কি বলেছিলেন। স্কুল থেকে বাড়ি এসে মেজদি স্লেটে বার বার লিখে দিন সাতেকের মধ্যে যুক্তাক্ষর শিখিয়ে দিলেন। এরপর থেকে ক্লাসে প্রথম হতে লাগলাম। গোনা শিখলাম তেঁতুলের বিচি দিয়ে। ওগুলোকে মনে হত কি মহামূল্য ধন। টিচার যখন প্রত্যেক দিন অঙ্কের ক্লাসের পর আবার তেঁতুলবিচিগুলি ফেরত নিয়ে আলমারীতে বাক্সে তুলে রাখতেন, তখন মনে মনে বড়ই

কষ্ট পেতাম।

শিলং-এ তেঁতুল হতো না। একবার দেশের গ্রাম থেকে ছোট কাকা বেশ খানিকটা পাকা তেঁতুল নিয়ে এসেছেন। মা বসে বসে বঁটিতে তেঁতুলের ছড়া কেটে বিচি বের করছেন, আমার আর পুঁটুর আনন্দ দেখে কে! দুজনে সমানে তেঁতুলবিচি জড় করতে লাগলাম। পরে মা দুজনকে ছেঁড়া শাড়ির টুকরো দিয়ে দুটো থলে সেলাই করে দিলেন বিচিগুলি রাখবার জন্য। 'কিছুদিনের মত তেঁতুলবিচি একটা খেলার জিনিস হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এই বিচি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একশো পর্যন্ত গোনা ও ছোট ছোট যোগ-বিয়োগ শিখে ফেললাম।

মা বললেন, 'দেখবে তেঁতুলের গাছ কি রকম হয়।' এই বলে একটা ছোট কাঠের বাক্স মাটিভর্তি করে উঠোনের এক কোণে রেখে তাতে কয়েকটা তেঁতুলবিচি পুঁতে দিলেন এবং মাঝে মাঝে জল দিতে লাগলেন। আস্তে করে অঙ্কুর দেখা দিল, ক্রমে দুটি পাতা, তারপর চারটি পাতা হয়ে ঝিরি ঝিরি পাতা দেখা দিল। এর পরই শীত পড়ে যাওয়াতে 'ফ্রস্ট'-এ তেঁতুলচারা নষ্ট হয়ে মরে গেল। কিন্তু এই বিচি থেকে চারাগাছ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা এত আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল যে, তারপর থেকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রতি বিশেষ ঝোঁক জন্মায়। তাই স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত বরাবর 'উদ্ভিদবিদ্যা' প্রধান বিষয় হিসাবে পড়ে এসেছি।

আমার বড়মামা ও দিদিমা আমাদের বাড়িতেই অন্য একটা ঘরে থাকতেন। ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে বড়মামা বিয়ে করে মামীমাকে নিয়ে এলেন। এবং তার কিছুদিন পরে শিলং-এ পুলিসবাজারে আমাদের আরেকটা বাড়ি ছিল সেটাতে উঠে গেলেন।

এর কিছুদিন পরেই আমাদের চার বোনের সাংঘাতিক ভাবে 'হাম' হলো। প্রথমে আমার হয়। আমার মনে আছে আমার সঙ্গে ক্ষমা বলে একটি মেয়ে পড়তো, তার বাবা ছিলেন পুলিসের দারোগা। সে হাম নিয়ে ক্লাসে এসেছিল এবং অনেক মেয়েরই তার কাছ থেকে ছোঁয়াচ লাগে। আমরা চার বোনে আলাদা আলাদা খাটে শুয়ে আছি। মা ও বাবা অক্লান্ত সেবা করে যাচ্ছেন। একদিন দারোগামশাই আমরা কেমন আছি দেখতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েদের কি পথ্যি দিতেছুন?' বাবা বললেন, 'হর্‌লিক্‌স্ খেতে দিচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ফালাইয়া রাখইন জল-সাগু দিয়া—কোন্ বড়লোকের ঘরে বিয়া দিবাইন মাইয়ারার, যে হর্‌লিকস্ খাওয়াইয়া বদ্ অভ্যাস করাইতেছুন্' অর্থাৎ জলসাগু দিয়ে ফেলে রাখুন, কোন্ বড়লোকের ঘরে মেয়েদের বিয়ে দেবেন যে হর্‌লিকস্ খাইয়ে বদ্‌অভ্যাস করাচ্ছেন।

ভদ্রলোক তাঁর এগারোটা মেয়েকে বহু চেষ্টায় অল্পচাকুরে কেরানীর ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন। আর বাবা তাঁর চার মেয়েকেই এমন বাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোন মেয়েরই 'হর্‌লিকস্' খাওয়ার অভ্যেস হওয়ায় কোন কষ্টের কারণ হয়নি। এখন বিলেতেও বাবার সেজ জামাই ঐ ঘটনার ৭৩ বছর পরেও সেই সেজ মেয়ের অসুস্থতার দরুন সকাল সন্ধ্যা দুটি বেলা নিজের হাতে হর্‌লিকস্ তৈরী করে সামনে এনে ধরেন।

সেই অসুখের সময়ে জ্বরে মাথায় খুব যন্ত্রণা হতো বলে 4711-এর ওডিকোলন

ঠাণ্ডাজলে দিয়ে আমাদের কপালে জলপটি দেওয়া হত, এবং সেই অবধি যে ঐ ওডিকোলন ব্যবহারের অভ্যেস হয়ে গেল, এখনও ওটা বরাবর করে আসছি।

আমরা সবে একটু ভাল হয়েছি। বাবা আমাদের একটু মনে আনন্দ দেবার জন্য চার বোনকে চারটে বিলিতি ডল্ কিনে দিলেন। শুইয়ে দিলে পুতুলগুলি চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ে, খাড়া করে তুলে ধরলে চোখ খোলে, মাথায় সুন্দর ঝাঁকড়া চুল, গায়ে রঙীন সিল্কের জামা, পায়ে জুতো, সেগুলো খোলা যায়, পরানো যায়। এক-একজনের ডলের এক এক রং-এর জামা। ছোট বোন পুঁটুর পুতুলটার জামার রং ছিল সবচেয়ে সুন্দর লাল রংয়ের।

একদিন সন্ধ্যেবেলা পুঁটু চারটে পুতুল নিয়েই বসলো খেলতে। ছোট বোন খেলছে দেখে আমরা কেউই তার কাছ থেকে আমাদের পুতুল কেড়ে নিইনি। কিন্তু সে করলো কি ? হঠাৎ দিদির পুতুলটাকে এক আছাড় মেরে ভেঙে দিল, ওটা ভেঙেই মেজদিরটা ধরলো, সেটার ঐ অবস্থা করে আমার পুতুলটাও ভাঙলো। তারপর দেখতে দেখতে নিজেরটাও আছাড় মেরে ভেঙেই ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলো। একের পর এক পুতুল ভাঙতে তার পাঁচ মিনিট লাগেনি। আমরা সবাই হাঁ-হাঁ করে বাধা দেবার আগেই সব শেষ।

বড়মামারা পুলিসবাজারে আমাদের অন্য বাড়িতে উঠে চলে যাবার পর বাবা ঠিক করলেন ঐ ঘর ভেঙে ঐ জায়গায় একটা বিলিতি ধরনের বাংলো বাড়ি তৈরী করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খাসিয়া মিস্ত্রীরা এসে কাজ শুরু করে দিল। সেই ঘরের কাছেই একটা প্রকাণ্ড 'পিচ্' ফলের গাছ ছিল, সেটা কেটে ফেলা হল। তার ডালপালাগুলি ভেতর-বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো, আর গুঁড়িটা আমাদের বাড়ির সামনেই ফেলে রাখা হলো, বেশ শুকিয়ে উঠলে ওটা জ্বালানি কাঠ হিসাবে চেরানো হবে।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলা দেখা গেল রাত্তিরে কারা যেন ঐ গুঁড়িটা তুলে বাড়ির সামনে রাস্তার উপরে নিয়ে ফেলে রেখেছে। মা বাবাকে বললেন, 'মনে হচ্ছে কেউ এই গুঁড়িটা চুরি করার মতলবে আছে। এত ভারী গুঁড়িটা রাস্তার উপরে তুলে আর রাত্তিরে নিতে পারেনি। মিস্ত্রীদের দিয়ে গুঁড়িটা আনিয়ে বাড়ির ভেতরে কাঠের ঘরে রাখিয়ে দাও।' বাবা সেদিন মায়ের কথা শুনেও যেন শুনলেন না। সন্ধ্যার সময় মা বললেন, 'গুঁড়িটা তো ভেতরে আনিয়ে রাখা হলো না, রাত্তিরে না ওটা চুরি হয়ে যায়।' বাবা বললেন, 'না, কে আর নেবে ?'

সকালে উঠে দেখা গেল বেমালুম গুঁড়িটা উধাও। গুঁড়িটা এত ভারী ছিল, বোধহয় চোর আরও কাউকে ডেকে এনে কোনক্রমে দড়ি দিয়ে বাঁশে বেধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে।

খাসিয়া মিস্ত্রীরা সুন্দরভাবে বাড়িটা তৈরি করলো। জানালাগুলি কোন কোন ঘরের একেবারে 'বে-উইন্ডো'র স্টাইলে তৈরি হলো। জানালা দরজাতেও একেবারে বিলিতি বাড়ির মত রং দেওয়া হলো।

তারপর এলো 'গৃহপ্রবেশে'র পালা। দিন দেখে বহু লোকজনকে নেমন্তন্ন করা

হলো। কিন্তু সেদিন ভোর থেকে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। শিলং-এর বৃষ্টিতে সকলেই অভ্যস্ত। সুতরাং কোনও কিছুতেই বাধা হলো না। পুরুতঠাকুর এসে পূজো করলেন। পাড়ার বিশিষ্ট তিন-চারজন ব্রাহ্মণ ভদ্রমহিলা এসে রান্নাবান্না করলেন। নিমন্ত্রিতরাও ছাতা মাথায় দিয়ে এসে সবাই খাওয়াদাওয়া করে নতুন ঘর ঘুরেফিরে দেখে গেলেন। বিকেল পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টি থেমে গিয়ে ঝকঝকে পরিষ্কার দিন হয়ে গেল।

সকাল থেকেই নতুন বাড়ির সদর দরজায় আমের পল্লব দিয়ে দুটো 'মঙ্গলঘট' রাখা হয়েছিল। দিন ভাল হতেই আমরা বাইরে বেরিয়ে দৌড়দৌড়ি শুরু করে দিলাম। কিন্তু তখন আমাদের নতুন বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হলো না। শুনলাম, লগ্ন তখন ভাল নয়। সন্ধ্যার সময় বাবা বললেন, 'চলো। এখন আমরা সবাই নতুন বাড়ি যাই।' বাবা, মা ও আমরা চার বোন একসঙ্গে গেলাম। সারাদিন বৃষ্টির জন্য খুব ঠাণ্ডা ছিল, চাকররা আগেই 'ফায়ার প্লেস'-এ আগুন জ্বেলে রেখেছিল এবং আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে বিছানা ইত্যাদি করাই ছিল। ঘরে ঢুকে কেউ বা চেয়ারে, কেউ বা মোড়া পেতে আগুনের ধারে বসে মায়ের দেওয়া সকালের ঠাকুরপূজোর প্রসাদ খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

দিদি সেই বছরেই 'জেল রোড় মিডিল ইংলিশ স্কুল'-এর ফাইনাল পরীক্ষাতে সমস্ত আসামে প্রথম হয়ে পাস করলেন।

মা ও বাবা দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে দিদিকে 'হাইস্কুলে' ভর্তি করে দেবেন। শিলং-এ তখন 'ওয়েলস্ মিশন হাইস্কুল' মাত্র একটি মেয়েদের হাইস্কুল, আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিল। এতদূরে একা একা হেঁটে যাওয়া সম্ভবও নয়; আর তখন পর্যন্ত কোন বাঙালী মেয়ে হাইস্কুলে পড়তে যায়নি। যাঁরা ম্যাট্রিকুলেশান পাস করেছিলেন এবং কলেজে পড়াশুনা করছিলেন তাঁদের সকলেই ব্রাহ্ম এবং তাঁরা ময়মনসিংহের 'বিদ্যাময়ী' স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। আমার স্বামীর মামাতো বোনেরা দিদি-মেজদির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন, কিন্তু তাঁরাও 'মিডিল ইংলিশ স্কুল' ফাইনাল পরীক্ষা দেবার আগেই ময়মনসিংহের স্কুলে পড়তে চলে যান।

'ওয়েলস্ মিশন হাইস্কুল' ছিল 'মোখারে'। শিলং-এর বেশীর ভাগ খাসিয়া বাসিন্দারা 'মোখারে'ই থাকতো। স্কুলের ছাত্রীও সব খাসিয়াই ছিল। দুজন মিশনারী মেম স্কুলটা চালাতেন। তাছাড়া শিক্ষিত খাসিয়া শিক্ষয়িত্রীও ছিলেন।

স্কুলে রোজ নিয়ে যাবার ও ফিরিয়ে আনবার জন্য একটা ভাড়াটে গাড়ির ব্যবস্থা করে এলেন বাবা। 'রাইবু' বলে একটি খাসিয়া কোচম্যান ছিল ; তার ঘোড়া ও গাড়ি ছিল। সে ভাড়া হিসাবে এই ঘোড়ার গাড়ি খাটাতো। রাইবু সাড়ে নটায় এসে দিদিকে গাড়িতে বসিয়ে ঘোড়াকে লাগাম ধরে নিয়ে যেতো, আর সঙ্গে যেতো আমাদের বহু পুরনো চাকর (মেজদির জন্মের বছর ১৯০৩ সনে কাজে বহাল হয়) 'স্বরূপদাদি'। স্বরূপকে আমরা 'দাদি' ডাকতাম। সিলেটে বৃদ্ধ চাকরদের 'দাদা' না বলে 'দাদি' বলে। বিকেলেও স্কুল ছুটির পর এভাবে বাড়ি নিয়ে আসতো। পরের বছর মেজদিও আসামে

প্রথম হয়ে পাস করলেন এবং দিদি ও মেজদি দুজনে একসঙ্গেই হাইস্কুলে যেতে লাগলেন।

'রাইবু'র কথায় মনে পড়লো—যে যখন কোচম্যান ছিল, মাঝে মাঝে সে বাবার কাছে কাজে আসতো এবং একটা নীচু বেঞ্চিতে বসে কথাবার্তা কইত। একবার দেখি সে এসেছে বেশ কয়েক বছর পর, পরনে পরিষ্কার দামী মুগার কোট, কাঁধে এন্ডির চাদর এবং মাথায় মুগার কাপড়ের পাগড়ী। সে এসে দিব্যি আমাদের বসবার ঘরে বাবার পাশে চেয়ারে বসে কথা বলছে ও হুঁকো দিয়ে তামাক খাচ্ছে। আমরা তো রেগেই অস্থির। রাইবু চলে যেতেই বাবাকে বললাম, 'রাইবুর কি আস্পর্ধা, সে এরকম চেয়ারে বসেছে, আবার গুড়ুক, গুড়ুক করে তামাক খেয়েছে!' বাবা বললেন 'আরেঃ, আরেঃ! চুপ, চুপ! রাইবু এখন মফলং-এর 'লংডো' অর্থাৎ 'রাজা'। একে তো সম্মান দেখাতেই হবে।' খাসিয়ারা ছোট রকমের রাজাকে বলে 'লংডো'। মফলং শিলং-এর কাছেই একটা পরগনা ছিল। খাসিয়াদের ভোটে রাজা ঠিক হয়।

রাইবু তখন গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবসা ছেড়ে রাজা হয়ে শাসনকর্তা হয়ে বসেছে। তার কি জাঁক!

আমার বিয়ের পর উনি যখন শিলং গিয়েছিলেন, তখন মফলংয়েও বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই খবর শুনে রাইবু এসে দুঃখ প্রকাশ করে বাবাকে বলেছিল, 'তোমার জামাই মফলং এলেন, কিন্তু আমার বাড়ি গেলেন না। আমি একটু "কুয়াই", "তাম্বু" দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে পারলাম না।'

খাসিয়াদের অতিথি সম্বর্ধনার চিহ্ন হলো তাকে সর্বাগ্রে 'কুয়াই' ও 'তাম্বু' অর্থাৎ পান, সুপুরী খেতে দেওয়া। খাসিয়ারা সুপুরীকে বলে 'কুয়াই' ও পানকে বলে 'তাম্বু'।

সেই সুপুরীও কি! খাসিয়ারা কাঁচা সুপুরী খায়। ঐ সুপুরী খেলে মাথা ঘোরে। তারা পানে এমনি কোন এলাচ, মৌরী জাতীয় পানমশলা বা খয়ের খায় না। শুধু চুন মাখিয়ে একটা খিলিমত তৈরী করে তাতে বড় এক টুকরো সুপুরী গুঁজে দেয় এবং যে তামাকপাতা চায়, সেই অনুযায়ী এক টুকরো তামাকপাতা দেয়।

এই সময়ে গ্রীষ্মকালে হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক এসে আমাদের বাড়ির দরজায় টক্ টক্ করে শব্দ করলেন। আমি বের হতেই বললেন, 'ইজ্ ইট্ রায়সাহেব ডি. এন. ধর'স্ হাউস' ? আমি বললাম, 'ইয়েস্।' ভদ্রলোক বললেন, 'মে আই সি হিম ?' আমি বললাম, 'কাম ইন্।' তখনো ভাল করে ইংরেজী কথা বলার সড়গড় হয়নি। তাঁকে বসবার ঘরে বসিয়ে ভেতরে গিয়ে বাবাকে বললাম।

বাবা এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার একটু পরে তিনি চলে গেলেন। বাবা বাড়ির ভেতরে এসে মাকে বললেন, 'মতিলাল মুকিম বলে দিল্লী থেকে এক জুয়েলার এসেছে, কাল সকাল দশটার সময় আসতে বলেছি, রবিবার স্কুল ছুটি আছে, মেয়েরাও সব গয়না দেখবে।'

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জুয়েলার' কি? বাবা বললেন, এদের সব গয়না নানারকম দামী পাথর দিয়ে বসানো।

শুনে অবধি সময় আর কাটে না, কতক্ষণে 'আসছে কাল' আসবে এবং লোকটি গয়না নিয়ে আসবে।

পরদিন ঠিক সকাল দশটায় সেই ভদ্রলোক দুটো চাকরের মাথায় দুটো ট্রাঙ্ক চাপিয়ে এসে হাজির। সেদিন তাঁর পরনে চুড়িদার সাদা পাজামা ও গায়ে কালো সার্জের সেরোয়ানী। তাঁর পোশাক দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। ঐরকম পোশাক আগে আর দেখিনি। আগের দিন তিনি ভাল দামী বিলিতি সুট পরে এসেছিলেন। দরবারের সময় বাবাকে দরবারের পোশাক পরতে দেখেছি, কিন্তু সেটা ছিল অন্য রকমের—চোগা, চাপকান ও প্যান্ট।

যাই হোক, জুয়েলার মতিলাল মুকিমকে সমীহ করে বসিয়ে বাবা বলে দিলেন যে মা ইংরেজী জানেন না, তিনি গয়নাগুলি দেখাবার সময় অনুগ্রহ করে যদি হিন্দীতে কথা বলেন।

ভদ্রলোক একটি 'প্যাস্‌নে' চশমা চোখে দিয়ে ট্রাঙ্ক খুলেই দেখালেন প্রথম একটা মাথার 'মুকুট' এবং বিশুদ্ধ উর্দু ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সেই মাথার 'মুকুট' দেখে তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। এখনো মনে হলেই ভেসে ওঠে সেই মুকুটের দৃশ্য। দুটো-তিনটে পালক খাড়া উঁচু হয়ে আছে, আর নীচে মণিমুক্তো-বসানো সুন্দর ফুল জ্বলজ্বল করছে। চোখ তো আর সরাতেই পারি না। সকলের জনে জনে দেখা হলে পর কেস্‌টা বন্ধ করে একের পর এক আরও অন্যান্য অনেক রকমের গয়না ট্রাঙ্ক থেকে বের করে করে দেখাতে লাগলেন। বেশীর ভাগ গয়নাই বিক্রীর জন্য এবং কিছু নমুনার। নমুনা দেখে অর্ডার দিলে তিনি দিল্লীতে তৈরী করিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। মা ও দিদিরা মিলে পছন্দ করার পর তাদের জন্য দুটো কানের দুল কেনা হলো এবং কিছু গয়নার অর্ডারও দেওয়া হল।

তারপর যা অঘটন ঘটলো পরের বছর, এখনও মনে করলে গা শিউরে ওঠে। পরের বছর ঐ একই সময়ে ভদ্রলোক আবার শিলং এসেছেন। বাবাকে এসে বলে গেলেন, এবারে তিনি আমাদের বাড়ির কাছেই যে স্যানাটোরিয়াম্ আছে তাতে এসে উঠেছেন এবং দু-চারদিন পরে তাঁর গয়না সব দেখাতে নিয়ে আসবেন।

দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যেবেলা বাবা বাড়ি এসে মাকে বললেন, 'জুয়েলার মতিলাল মুকিমকে গতকাল সন্ধ্যেবেলা খুন করে ফেলেছে। কে করেছে এখনও ধরা পড়েনি।' পরে শুনলাম তারা যখন ধরা পড়লো—একটির নাম 'অর্জুন সিং', উত্তর ভারতীয় এবং অন্যটি খাসিয়া—নাম Churchill। এই দুটিতে আগের বছর মুকিমের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করেছিল। পরের বছর তারা আবার এসে উপস্থিত হয় এবং ষড়যন্ত্র করে 'চলো আমরা পিক্‌নিক্ করে আসি' বলে কিছু খাবারদাবার নিয়ে ঝালোপাড়া বলে একটা জায়গা আছে প্রায় শিলং থেকে বেরিয়েই গৌহাটী যাবার পথে—সেখানে আমাদের একটা নানারকম ফলের বাগান ছিল, এটা চেরাপুঞ্জীর রাজা বাবাকে দিয়েছিলেন—তারই গায়ে একটা জায়গাতে খেতে বসে একজন গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক করে রাখে এবং অন্যজন গুর্খাদের 'কুক্‌রী' দিয়ে মুকিমকে খুন করে মেরে ফেলে এবং মেরে

ফেলে রাতে স্যানাটোরিয়ামে এসে বার বার চাকরদের দরজা খুলতে বলে। চাকর দুটো ঘুমিয়ে আছে ভান করে দরজা বন্ধ করে রাখে এবং পরদিন ভোরে অল্প দিনের আলো হতেই একটা গিয়ে পুলিসে খবর দেয়। দুজনকে পুলিসে ধরে ফেলে। পরে অর্জুন সিং-এর ফাঁসি হয়। কিন্তু খাসিয়াটা কি করে যেন ছাড়া পেয়ে যায়।

আমাদের ঝালোপাড়ার বাগান, যার বাইরেই 'হেজে'র কাছে জুয়েলার মতিলাল মুকিমকে খুন করে মেরে রেখেছিল, সেই জায়গাটা আমাদের কাছে এক ভয়াবহ জায়গা হয়ে দাঁড়ালো। আমরা আগে আগে প্রায়ই ছুটির দিনে ঝালোপাড়ার বাগানে গিয়ে পিক্‌নিক্ করতাম এবং নানারকম ফল আপেল, প্লাম, পিচ্, নাসপাতি ইত্যাদি পাড়তাম ও খেতাম। কিন্তু এই ঘটনার পর আর জীবনে সেখানে যাইনি। মনে হতো, সেখানে গেলেই বুঝি মতিলালের কাটা দেহ পড়ে আছে দেখতে পাব।

১৯১৭ সনের শেষের দিকে আমাদের 'জেল রোড্ মিডিল ইংলিশ স্কুলে'র দুজন টিচার স্নেহলতা সরকার ও চপলা সরকার আমাদের কোঠাবাড়িতে এসে থাকতে চাইলেন। মা বললেন, 'বেশ ভালই তো। সকলে বেশ একসঙ্গে নিজের মত থাকা যাবে।' এরা একে ছিলেন খ্রীষ্টান, তায় আবার কুমারী, সেজন্য অনেক হিন্দু পরিবারের তাঁদের জায়গা দেবার বিশেষ আপত্তি ছিল। অথচ এঁরা দুজনে একেবারে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে ঠিক ভরসা পেতেন না। যাই হোক ঠিক হলো স্নেহদি ও চপলাদি আমাদের বাড়িতে থাকবেন ও দিদিমা যে ঘরে রান্না করতেন সেখানে রান্না করবেন।

এঁরা বাড়িতে আছেন দেখে বাবা আমাদের চার বোন ও মাকে তাঁদের জিম্মা করে দিয়ে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় গেলেন। দু সপ্তাহ কলকাতায় মায়ের এক পিসিমার বাড়ি বাদুড়বাগানে থেকে নানারকম জিনিসপত্র কিনে নিয়ে ফিরে এলেন।

দিদিকে বলেছিলেন 'মিডিল ইংলিশ পরীক্ষা'তে আসামে প্রথম হতে পারলে একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবেন।

সব জিনিসপত্র বাবা যা কিনে এনেছিলেন তা দেখে আমার আর পুঁটুর ধেই-ধেই নাচ শুরু হলো। বাবা আনলেন 'ডোয়ার্কিন' থেকে দিদির জন্য হারমোনিয়াম ও সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতপঞ্চাশিকা'—স্বরলিপির বই; 'হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসনের দোকান থেকে পুঁটু ও আমার জন্যেও কয়েকটা সুন্দর সুন্দর তৈরী ফ্রক ও বুট্‌জুতো কিনে আনলেন। সেই সময় আগে আগে ভিক্টোরিয়ান যুগে বিলেতে ছোট মেয়েরা যেরকম পোশাক পরতো, আমরাও সেরকম জামাকাপড় পরতাম ও বুট্‌জুতো পায়ে দিতাম। মা, দিদি ও মেজদির শাড়ি ও ব্লাউজের জন্য কয়েক রংয়ের ফরাসী সিল্ক আনলেন, আর আনলেন বাড়ির দরজার পর্দা করবার জন্য 'ক্রেটন' কাপড়, জানালার জন্য পাতলা সাদা রকমের ভয়েল গোছের কাপড়, চায়ের জন্য ও খাবার জন্য বিলিতি 'চায়না'র বাসন। এছাড়া এলো ঘরে ঘরে জ্বালাবার জন্য চার-পাঁচটা "ডোম্" দেওয়া মোমবাতির স্ট্যান্ড।

এর পর থেকে বরাবর সংসারে জিনিসপত্র 'হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসনে'র দোকান

থেকেই আনানো হতো। এর আগে কেনা হত শিলং-এর দুটি দোকান—একটি 'জামাতুল্লা'র দোকান এবং অন্যটি 'গোলাম হায়দর'এর দোকান থেকে। তারাও কলকাতার বিলিতি দোকান থেকে জিনিসপত্র চালান নেওয়াতো। তবে অনেক সময় ইচ্ছেমত জিনিস পাওয়াও যেতো না।

জামাতুল্লার একটা ডেয়ারীও ছিল। সেটা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে জেল রোড্ মিডিল ইংলিশ স্কুলে যাবার মাঝপথে। সেখানে 'কেক্', 'বান্', পাঁউরুটি, মাখন ইত্যাদি সব তৈরী হতো। কখনও মা আমাদের পয়সা দিয়ে দিতেন, আমরা স্কুল থেকে ফেরার পথে রুটি, বান্, মাখন ইত্যাদি কিনে নিয়ে আসতাম।

১৯১৮-সনে তৃতীয় ক্লাসে পড়ি। জুলাই মাসে একদিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় স্কুল থেকে এসে আমরা বোনেরা সবে ভাতে-ভাত খেতে বসেছি, হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলো। প্রথম কাঁপুনিটা মা কিংবা আমরা কেউই তত গ্রাহ্য করিনি। পরে এমন জোরে জোরে কেঁপে উঠতে দেখে মা 'শীগ্গির বেরো, শীগ্গির বেরো' করে আমাদের চার বোনকে নিয়ে খাবারঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। এর তিন-চার মিনিট পরেই বাবা আপিস থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত এবং আমরা সকলে ভাল আছি, বাড়িরও কোন অনিষ্ট হয়নি দেখে ওখানেই রান্নাঘরের দাওয়ায় ধপাস করে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশদাদিও এসে হাজির। সে ছিল মিস্ত্রী। আমাদের বাড়িতে চাকরদের থাকবার ঘরে স্বরূপদাদির সঙ্গে থাকতো, আর সব সময় দরকারমত কাজকর্ম করা বা দেখাশোনা করতো। সে বাড়ির কাছেই কোথাও কাজ করছিল, হাতুড়ি হাতে এসে উপস্থিত। স্বরূপদাদিও বাজারে গিয়েছিল, অর্ধেক বাজার করেই দৌড়ে বাড়ি এসেছে। সারারাত জুড়ে সন্ধ্যা থেকে বাড়ি ঘরদোর বার বার কেঁপে উঠছিল। বাবার কাছে শুনেছিলাম এই ভূমিকম্প সীলেটের নীচের দিকে মঙ্গলদই বলে একটা জায়গা থেকে উৎপত্তি হয়।

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর শিলং-এ কাঠের বাড়ি তৈরী হতো। এই বাড়িগুলি খুব হাল্কা হওয়ার দরুন পরে ভূমিকম্পে আর বাড়ির কোন অনিষ্ট হতো না। খাসিয়া পাহাড় ছিল যাকে 'ফল্ট্' বলে তার পথের মধ্যে। তাইতে শিলং-এর ভূমিকম্প ছিল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। দিনেরাতে যখন-তখন দিনে দু-তিনবার ভূমিকম্প হতে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

বাবার আবার ঘোরাঘুরি অর্থাৎ চারদিকে ইন্স্পেকশ্যানে বেশ দূরে দূরে যাবার কাজ। তার জন্য একটা টম্টম্ গাড়ি ও ঘোড়া কেনা হল। প্রথমে টম্টম্ গাড়ি কেনা হল এবং সেটা রাখবার জন্য একটা ঘরও তৈরী হলো। ঘোড়ার জন্য আস্তাবলের দরকার। খাসিয়া মিস্ত্রীরা এসে ঠকাঠক্ করে আমাদের গরুর গোয়ালের একটু দূরে ঘোড়াকে রাখবার জন্য একটা আস্তাবল ও পাশেই সহিসের থাকবার ও রান্না করে খাবার জন্য ছোট কুঠুরী তৈরী করে দিল। আমাদের একেবারে তাজা দুধের জন্য গাইও ছিল তিন-চারটে। বেনোয়ারী মালি গরুগুলির তদারক করতো। তারও ঘর ছিল

গোয়ালের সঙ্গেই।

বাবা ঘোড়া কিনবেন বলে খোঁজ করতে লাগলেন চারদিকে। মণিপুরের রাজার 'আপার শিলং'-এ একটা বাড়ি ছিল। মাঝে মাঝে তিনি শিলং-এ এসে থাকতেন। তাঁর অনেকগুলি 'রেস'এর ঘোড়া ছিল। বাবা ঘোড়া কিনতে চাইছেন শুনে তিনি তাঁর এক সহিসকে দিয়ে একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দিলেন এবং বাবাকে বলে পাঠালেন, বাবার যদি ঐ ঘোড়া পছন্দ হয় তাহলে তিনি ওটাকে বিক্রী করে দেবেন।

হৃষ্টপুষ্ট সোনালী রংয়ের ঘোড়া দেখে বাড়িসুদ্ধ সকলের খুবই পছন্দ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজার সহিসের হাতে খামে পুরে বাবা টাকাও পাঠিয়ে দিলেন। ঘোড়াকে নিয়ে সহিস আস্তাবলে তার তোয়াজ শুরু করলো। ভিজে ছোলা, গুড়, বাগান থেকে তোলা গাজর, ঘাস ইত্যাদি রকমারি খাদ্যের ব্যবস্থা হলো। সহিস ঘোড়ার সমস্ত শরীর বুরুস করে সেবা আরম্ভ করলো। তারপর দুদিন পর সাজসজ্জা পরিয়ে গাড়িতে জুতে একদিন সহিসকে গাড়ির পেছনে নিয়ে বাবা একাই ঘুরে এলেন। পরদিন আবার আমাকে ও পুঁটুকে দুপাশে দুজনকে বসিয়ে বাবা গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন।

এর পরদিন যা ঘটলো সে এক মজার ব্যাপার। ঘোড়াকে আস্তাবলে রাখা হয়; সে যাতে না বেরিয়ে যেতে পারে সেজন্য দুটো মোটা বাঁশের ডাণ্ডা দরজায় দিয়ে রাখা হোত ঘোড়ার গলা পর্যন্ত। ঘোড়া বিমর্ষমনে দরজার বাঁশের ডাণ্ডার ওপর দিয়ে গলা বের করে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়ত চিন্তা করতো কি করে তার পুরনো মুনিবের বাড়ি পালাবে।

ইতিমধ্যে কিছুদিন ধরে নাগাড়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই বৃষ্টির জলে রান্নাঘরের মাটির দাওয়া জায়গায় জায়গায় ধ্বসে পড়েছে। বৃষ্টি থেমে হঠাৎ একদিন সকালে সুন্দর রোদ উঠেছে। আমাদের এক নতুন চাকর, নাম প্রসন্ন, এসেছে কাজ করতে; স্বরূপদাদি ছুটি নিয়ে দেশে গেছে বলে। মা তাকে বললেন, 'প্রসন্ন, আজ তোমাকে রাঁধতে হবে না, আমিই সেরে ফেলছি, তুমি রোদ্দুর থাকতে থাকতে একটু মাটি ছেনে নিয়ে দাওয়াটা বেশ করে মেরামত করে ফেল।' শিলং-এর আবহাওয়া হঠাৎ বৃষ্টি, হঠাৎ রোদ। দিন কখন কি রকম হয় কখনো বলা যায় না।

সে-সময়ে আমাদের গরমের ছুটি। দুই সপ্তাহকাল স্কুল বন্ধ থাকতো। আমরা এদিক-ওদিকে ঘুরে খেলে বেড়াচ্ছি। প্রসন্ন দাওয়া মেরামত করতে করতে একটু বিশ্রাম করবার জন্য আমাদের ভেতরবাড়ির বাইরে যেদিকে গোয়ালঘর ও আস্তাবল সেদিকে গিয়ে রোদ্দুরে বসে গায়ের জামা খুলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তার হুঁকো নিয়ে তামাক খেতে বসেছে। এর মধ্যে হঠাৎ প্রসন্নর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, সে চিৎকার করে বলে উঠেছে—'ঘুড়া তো গেলেন গিয়া আইজ্ঞা'।

সীলেট অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা জন্তু-জানোয়ারকে সম্ভ্রমের সঙ্গে উল্লেখ করতো, তাদের 'আপনি' করে বলতো, কিন্তু মানুষের বেলা 'তুমি' বলতো।

এই শুনে আমরা সবাই দৌড়ে পেছনবাড়িতে গিয়ে দেখি ঘোড়াও নেই, প্রসন্নও নেই। দেয়ালের পাশে প্রসন্নর ছাড়া জামা ও হুঁকো পড়ে আছে। আর ঘোড়ার

আস্তাবলের দরজার বাঁশ ঠিক তেমনি দরজা আগলে আছে, কোনই নড়চড় হয়নি।

সহিস বাজারে গিয়েছিল ঘোড়ার জন্য ছোলা, গুড় ইত্যাদি কিনতে, বেনোয়ারী মালী গরুগুলোকে চরাতে নিয়ে গেছে। বাড়িতে শুধু বাবা, মা, আমরা চার বোন ও কান্তাই রয়েছি। খাসিয়া ঝিদের বলে 'কান্তাই'। এরা ঘরের সব কাজকর্ম— অর্থাৎ বাসন মাজা, কাপড় ধোওয়া, কাঠের মেঝে ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করা, আমাদের ছোটদের স্নান করিয়ে দেওয়া, বড়দের চুলে সাবান দিয়ে দেওয়া—সবই করতো।

প্রসন্নর গলা শুনে বাবা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বালতিতে কিছু ভিজে ছোলা ও গুড় নিয়ে চারদিকে ছুটে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোথায় ঘোড়া ! কোথায় প্রসন্ন ! আমাদের সবার খুব মনখারাপ হয়ে গেল। দুপুরে কারো খাবার ইচ্ছে নেই। সবাই খুব আপত্তি করতে লাগলাম। মা বললেন, 'না খেয়ে উপোস করে থাকলে কি আর ঘোড়া ফিরে আসবে ? দেখা যাক, প্রসন্ন ফিরে এসে কি বলে ?' এই বলে জোর করে সবাইকে ভাত খাইয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হয়-হয় প্রায়, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, হঠাৎ ঘোড়ার খুরের ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ শুনে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি প্রসন্ন একটা ছোট দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোড়াকে ধরে বাড়ির উঠোনের ভিতর দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। বিকেলের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। বেচারী প্রসন্নর পরনে শুধু একটা খাটো ধুতি এবং খালি গা। সবাইকে দেখে বাবার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে কাঁদো-কাঁদো সুরে বলতে লাগলো, 'কর্তা, দেখেন, এই বেটা ঘুড়ার লাইগ্‌গা আমার কি অবস্থা।' বলে তার ছড়ে যাওয়া রক্তাক্ত বুক-পিঠ দেখালো। তারপরে বললো, 'আমি তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘোড়া আস্তে করে সামনের দুটো পা জোড়া করে লাফ দিয়ে বাঁশের ডাণ্ডার উপর দিয়ে গলে বেরিয়ে দৌড়তে লাগলো ওধারের জঙ্গলের দিকে। (ঘোড়াটা বরাবর 'জিমখানা জাম্পিং'-এ খুব অভ্যস্ত ছিল। তাই ঐরকম বাঁশের ডাণ্ডার ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাবার নিয়মটা তার খুব ভালভাবেই জানা ছিল।) হুকো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেটার পেছন পেছন দৌড়তে লাগলাম। জঙ্গল, নালাখন্দের ভেতর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়া দৌড়চ্ছে, আমিও তার পেছন পেছন দৌড়চ্ছি। আমার শরীর কাঁটায় ছড়ে যেতে লাগলো। (শিলং-এর জঙ্গলে কেবল বড় বড় 'পাইন' ও 'ইউকালিপ্টাস' গাছেরই নয় 'ল্যানটানা', 'কন্টিকারী', 'ব্ল্যাকবেরী' এসব কাঁটার ঝোপেও ভরা।) হতভাগা ঘোড়া ! ঠিক চিনে আপার শিলং-এ তার পুরনো মনিবের আস্তাবলের সামনে গিয়ে থামলো। মণিপুরের রাজার চাকররা তক্ষুণি ঘোড়াকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললো। সেখানে বসে একটু বিশ্রাম করে ও ঘোড়াকে কিছু ঘাস খাইয়ে ঐ দূর থেকে আবার এটাকে টেনে টেনে নিয়ে এসেছি।'

ঘোড়া কি বুঝলো জানি না। তার ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলা ও লাল চোখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে তাকানোর রকম দেখে মনে হলো, ফিরে আসতে হয়েছে বলে খুব ক্রোধ প্রকাশ করছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'আবার সুযোগ পেলেই পালাবো।'

কিন্তু খুবই আশ্চর্য হতে হয় যে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে ঐ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পুরনো মনিবের বাড়ি কেমন সুন্দর চলে গিয়েছিল !

এরপর বাবা রোজই টমটম চালিয়ে কাজে বের হতেন। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে দিদি, মেজদিকে কিম্বা আমাকে ও পুঁটুকে তাঁর দুপাশে বসিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে আনতেন। মাকেও ঘুরিয়ে আনতে চাইতেন কিন্তু মা কিছুতেই যেতে চাইতেন না। দিদি ও মেজদি স্কুলে কখনও রাইবাবুর গাড়িতেই যেতেন, আবার মাঝে মাঝে টম্‌টমেও যেতেন।

বাবা বরাবর আমাদের নিয়েই থাকতেন। তবে মাঝে মাঝে এক বন্ধুর বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা আসর বসতো, সেখানে ঘুরে আসতে যেতেন। সেখানে প্রায়ই তাসের আড্ডা বসতো। কোন কোন সময় বাবাও খেলতে বসে যেতেন। তাঁরা তাস খেলতেন, পয়সা রেখে হার-জেতা জুয়াখেলা নয়। তাঁরা খেলতেন ঝুড়িভর্তি শ'য়ে শ'য়ে কমলালেবু নিয়ে। যেদিনই বাবা তাস খেলতেন, রাত সাড়ে আটটা, নয়টা নাগাদ কোন মজুরের পিঠে বস্তাভর্তি কমলালেবু নিয়ে ফিরে আসতেন।

একবার এরকম কমলালেবু নিয়ে বাবা বাড়ি এসেছেন, আমার ও পুঁটুর স্ফূর্তি দেখে কে ! কমলালেবু সবসময় কেনা হতো এবং খেতামও খুব। কিন্তু এই কমলালেবুর যেন ভিন্ন কদর হয়ে পড়তো।

মনে পড়লো, এক বস্তা কমলালেবু বাবা পৌষ-সংক্রান্তির দুদিন আগে তাসের আড্ডা থেকে জিতে নিয়ে এলেন। পৌষ-সংক্রান্তির সময় সব বাড়িতেই যার যেমন সামর্থ্য সেই অনুযায়ী পিঠে, পুলি, পায়েস ইত্যাদি হতো। সকালবেলা ছেলেমেয়েরা স্নান করে বাইরে উঠোনে আগুন জ্বেলে হাত-পা গরম করে নিজেদের বাড়ির পিঠেপুলি খেয়ে, বিশেষ করে ছেলেরা (দশ-বারো বয়সের) বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করতো। সে সময় যার বাড়িতে যেমন পিঠেপুলি হয়েছে তাদের দেওয়া হতো এবং তারই সঙ্গে একটি করে কদমা ও একটি করে কমলালেবুও থাকতো। তারা কেউবা কোন পাত্র, কেউবা কোন থলে, আবার কেউ কেউ বালিশের ওয়াড়ও নিয়ে আসতো। কোঁচড় ভর্তি করে দুপুরনাগাদ যার যার বাড়ি ফিরে যেতো।

কমলালেবু দেখে মা বললেন, 'এবারে আর সংক্রান্তির কমলালেবু কিনতে হবে না। ঐ এক বস্তা কমলালেবুতে কাজ চলে যাবে।' এদিকে পরদিন সকাল থেকে আমি আর পুঁটু আস্তে করে বস্তায় হাত ঢুকিয়ে কমলালেবু বের করে নিয়ে গিয়ে বাড়ির বাইরের বাগানে বসে, যেখানে কারো নজরে না আসে, কমলালেবু খাওয়া শুরু করলাম। দুদিনেই বস্তা শেষ। আমরা দুটি ছাড়া আর কেউ টেরও পেল না। পৌষ-সংক্রান্তির দিন ভাঁড়ারের কোণা থেকে কমলালেবুর বস্তা বের করতে গিয়ে মা দেখেন, কেবল দু-চারটে কমলালেবু পড়ে আছে। আমি আর পুঁটু এমন ভাব দেখাচ্ছি যেন কিছুই জানি না। মা বলে উঠলেন, 'এ কি ! কমলালেবুর বস্তা খালি করলে কে ? এ টুনু-পুঁটুরই কাজ।' আমাদের দু'বোনের ডাক পড়লো। মা তখন তিরস্কার করে বললেন—'খাবার জিনিস খেয়েছ তাতে কিচ্ছু এসে গেল না—খাবেই। কিন্তু

ওরকমভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে না বলে খাওয়াটা খুবই অন্যায়।' এই যে মায়ের কথাগুলি মনে বিঁধে গেল, আর কক্ষনো মা বা আর কেউ হাতে তুলে না দিলে নিজে নিয়ে খাইনি।

এখনও এই আশী বছর বয়সে নিজের সংসারেও উনি কোন খাবার 'তুমি খাও' কিম্বা নিজে তুলে এক ভাগ আমায় না দিলে খাই না, এমন কি খাবার কোন ইচ্ছাই হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো। ১৯৩৪ সনে আমার সেজ দেবর ডাক্তার ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর বিয়ে হলো। সেজ-ঠাকুরপোর ধর্মতলায় আলাদা বিরাট ফ্ল্যাট ছিল। আমরা পরিবারের সবাই বিয়ের জন্য ওখানেই একত্র হয়েছিলাম। ফুলশয্যার তত্বতে প্রচুর রকমারি মিষ্টি এসেছে। ভাঁড়ার ঘরে একটা লম্বা বেঞ্চির উপর সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। বেঞ্চির পায়াগুলো পাত্র করে জল দিয়ে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে পিঁপড়ের হাত থেকে মিষ্টি রক্ষা করবার জন্য।

আমার বড় জা কাজকর্ম করছেন ও মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে দুই-একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিচ্ছেন আর আমায় সাধছেন, 'অমিয়া, নিয়া নিয়া খাও!' আমি বললাম, 'না বাবা, আমার ওসব নিজে হাতে তুলে নিয়ে খাওয়ার অভ্যেস নেই। কেউ হাতে তুলে না দিলে আমি কিছুতেই কোন জিনিস খেতে পারি না।'

পাশের ঘরে শ্বশুরমশায় ছিলেন, আমার কথাগুলি তিনি শুনতে পেলেন। একটু পরে আমার ছোট ননদকে ডেকে বললেন, 'সরোজ, একটা বড় দেখে থালা বেশ করে ধুয়ে মুছে আমায় এনে দাও তো!'

হঠাৎ তিনি থালা চাইলেন কেন আমরা কেউ বুঝলাম না। ছোট ননদ তাঁকে থালা নিয়ে দেবার পর তিনি সেটা নিয়ে ভাঁড়ারঘরে ঢুকে থালা ভর্তি করে মিষ্টি স্তরে স্তরে সাজিয়ে আমায় ডাকলেন, 'অমিয়া মা, কোথায়? এসো তো এদিকে।'

আমি তাড়াতাড়ি সমীহ হয়ে তাঁর সামনে যেতেই তিনি থালা ভর্তি মিষ্টি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও মা, খাও।' আমি তাঁকে একটি ছোট প্রণাম করে থালা হাতে ফিরে আসতে দুই ননদ মিলে খুব হাসতে লাগলো। বললো, 'নাও, আরো বলো নিজে হাতে তুলে নিয়ে খেতে পারি না।' আমি বললাম, 'তাতে কি হয়েছে, যার যা অভ্যেস। এসো! সবাই মিলে এখন এই মিষ্টি খাই।' এই বলার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তিনজনেই (বড়-জা ও দুই ননদ আমার সঙ্গে) মিষ্টির সদ্গতি করতে বসে গেলাম।

আমি আর পুঁটু মাঝে মাঝে নানারকম 'বেরী' কুড়োতে কুড়োতে বাড়ির পিছনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনেক দূর চলে যেতাম। আমরা বাড়ি ফিরছি না দেখে মা কান্তাইকে (আমাদের খাসিয়া ঝি) পাঠাতেন, আমাদের তাড়া দিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। সে দৌড়তে দৌড়তে খাসিয়া ভাষায় বলতো, 'শিগগির, বাড়ি এসো, 'বাবুনী'' তোমাদের ডাকছে।' খাসিয়ারা বাড়ির কর্তাকে 'বাবু' এবং গৃহিণীকে 'বাবুনী' বলে।

ইস্কুল না থাকলেই আমাদের দু বোনের বাগানে বাগানে ঘোরা বা জঙ্গলে ফলের

সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর এক প্রবল আসক্তি ছিল। তারপর 'ফক্স্ গ্লাভ' ফুলের মধু খাবার জন্য ভ্রমররা ভনভন শব্দ করে ফুলের ভেতর এসে ঢুকতো। এই ফুলের আকার ছিল একটা ঘন্টার মতো। যেই না ভ্রমরটার ফুলের ভেতর ঢোকা, অমনি ফট্ করে পাপড়িটা চেপে ধরতাম। তারপর কানের কাছে ধরে ফুলের ভেতর ভ্রমরের গুনগুন আওয়াজ শুনতে খুব ভাল লাগতো।

আবার তরকারী যে বাগানে হতো সেখানে গিয়ে কচি কচি শশা ও কড়াইশুঁটি খুব খেতাম। আর মূলোগাছে ফুল হলে পর অসংখ্য মৌমাছি আসতো ফুলের মধু খেতে। আমরা তখন পাতলা ন্যাকড়ার টুকরো নিয়ে মৌমাছি ধরে ন্যাকড়ার পুঁটুলির ভিতর দিয়ে মৌমাছির গায়ের মিষ্টি গন্ধ শুঁকতাম।

আমাদের বাড়ির 'প্লাম' গাছে যখন প্লাম পাকতো তখনও আমি আর পুঁটু সারাদিন প্লাম গাছের তলায় ঘুরতাম। গাছগুলি ছিল একটু ঢালু জায়গায়। প্রায়ই ফল পাড়বার সময় পাকা পাকা ফলগুলি গড়িয়ে পড়ে যেতো খাদে। কি করা যায় ভেবে ভেবে হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। ঠিক করলাম এক বোন গাছের ফলের নীচটাতে একটা ছাতা খুলে ধরবে, আরেকজন গাছে উঠে পাকা ফলটা একটা ছোট কাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে ছাতার মধ্যে ফেলবে, তাহলে ফলটা বেঁচে যাবে। যেই ভাবা, সেই কাজ। পুঁটু শুঁয়োপোকাকে খুব ভয় পেতো, আমার ওতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না একেবারেই। সেজন্য অধিকাংশ সময় আমিই গাছে চড়ে প্লাম পাড়তাম।

গাছ থেকে নিজের হাতে ফল পেড়ে খেতে যে কি আনন্দ পেতাম সে আর বলবার নয়। একবার তখন আমার বয়স বছর এগারো হবে, বেশ একটা অপকর্ম করলাম। শিলং-এ একটা বড় 'আপেল অরচার্ড' আছে আর তার কাছেই ছিল 'ট্রাউট্' মাছের 'হ্যাচারী'। একদিন দিদি বললেন, 'চল টুনু, আমরা "ফ্রুট গার্ডেনে" বেড়িয়ে আসি।'

আমি, দিদি ও ফেলুমামা (ইনি মা'র দেশের লোক) তিনজনে 'আপেল'-এর 'অরচার্ড'-এ গেলাম। গিয়ে দেখি আপেল গাছগুলিতে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত একেবারে লাল লাল ফল ঝুলছে। দিদি আমার ফল পাড়ার লোভ কি রকম জানেন। বললেন, 'টুনু, খবরদার ফল পাড়িসনি যেন!' আমি যেতে যেতে আর থাকতে পারলাম না। ভান করলাম আমার বুটজুতোর ফিতে খুলে গেছে। দিদিদের এগোতে বলে টপ করে একটা আপেল পেড়ে ফেললাম। আপেল খেতে খেতে চলেছি, দিদি হঠাৎ পেছন ফিরে দেখেন আমি আপেল খেতে ব্যস্ত। তখন তো বকুনি দিলেন। পরদিন ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছি, দিদি বাবার কাছে নালিশ করে দিচ্ছেন, 'টুনুকে এতবার করে বারণ করলাম আপেল পাড়তে, তাও আপেল পেড়ে খেয়েছে।'

বাবা তখন আমায় আর কিছু না বলে, বেলা হলে দহিনমালী যখন কাজ করতে এসেছে, তখন তার হাতে একটা চিঠি লিখে ও টাকা দিয়ে 'ফ্রুট্ গার্ডেনে'র সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দহিন একঝুড়ি আপেল নিয়ে এলো। কিন্তু সেই আপেলের দিকে তাকাইও না, খাইও না। দু-তিনদিন পর একদিন বাবা বললেন, 'আপেল খাস না কেন?' আমি আর কিছু বলি না। মনে মনে বলি, নিজের হাতে গাছ থেকে

পেড়ে খেতে যে মজা, ঘরে বসে ঝুড়ি থেকে তুলে নিয়ে খাওয়ার কি সেই একই আনন্দ!

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের গ্রাম থেকে বাবা বড়কাকার বড় ছেলেকে আনালেন তাকে লেখাপড়া শেখাবেন বলে। সে আমার বছরখানেকের বড় ছিল। তার নাম ছিল বীরেন্দ্রকুমার। বীরেনকে আমি আর পুঁটু দাদা ডাকতাম।

১৯১৯ সনে প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সেলাইয়ের জন্য প্রথম ডিপ্লোমা পরীক্ষাতেও বেশ ভালই করলাম।

এই সময়ে আমাদের যে 'কান্তাই' (খাসিয়া ঝি) ছিল, সে হঠাৎ আমাদের কাজ ছেড়ে তার গ্রামে চলে গেল। মা তখন মিসেস টন্ রায়কে একটু এসে মার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খবর দিলেন। তিনি একজন খাসিয়া কনট্রাকটারের স্ত্রী। আমরা তাঁকে 'কং' অর্থাৎ দিদি বলে ডাকতাম। তিনি প্রায়ই তাঁর ছেলে 'কেলেন' ও মেয়ে 'মারিয়া'কে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসতেন। আমরা কেলেন ও মারিয়ার সঙ্গে খুব খেলা করতাম। মিসেস্ রায় নানারকম বিলিতি ক্যাটালগ দেখে সুন্দর ছাঁটকাট দিয়ে জামা সেলাই করতে পারতেন। তিনি এসেই আমাদের সেলাইয়ের কল নিয়ে বসতেন। মা মহাআনন্দে তাঁকে রঙীন নানারকম কাপড়, লেস্ ইত্যাদি বের করে দিতেন। সারাদিন বসে আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ফ্রক, পেটিকোট সেলাই করে দিতেন। তাঁরা এলে আমরা আরেকটা কারণে খুব খুশী হতাম। বিকেলবেলা চায়ের সঙ্গে খেতে দেবার জন্য মা স্বরূপদাদিকে পাঠাতেন জামাতুল্লার ডেয়ারী থেকে কেক্ বান্ ও মাখন কিনে আনবার জন্য। জানতামই যে ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তার অতিরিক্ত খাবারের ভাগটা পাব। নিত্যিকার খাবারের জন্য আমাদের বিশেষ আসক্তি ছিল না।

মায়ের খবর পেয়ে মিসেস রায় এসে শুনে একদিন পরে নতুন এক কান্তাই নিয়ে এলেন এবং কাজকর্ম, মাইনে ইত্যাদির কথা বলে ঠিক করে গেলেন। পরদিন থেকে সে কাজকর্ম আরম্ভ করলো এবং অতিশয় ভালভাবে কাজ করতো। তার ছয় বছরের এক মেয়ে ছিল। তার নাম কোয়েটি, সে তার মার সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসতো। আমরা খুব খেলতাম তার সঙ্গে। মাস তিন কাজ করার পর সে পনেরো দিনের ছুটি নিলো। এ কয়দিন মা আর কাউকে রাখলেন না।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালবেলা সুন্দর ফুটফুটে একটি ছোট শিশুকে পিঠে বেঁধে নিয়ে কান্তাই এসে হাজির। কোয়েটি তার মায়ের আগে আগে দৌড়ে এসে বললো, 'দেখ, আমার কেমন ছোট্ট ভাই হয়েছে!' বাড়িসুদ্ধু সকলের ঐ শিশু দেখে কি আনন্দ! মা তো তক্ষুনি কোলে নিয়ে কত আদর। দিদিকে দিয়ে তক্ষুনি নতুন জামা ইত্যাদি সেলাই করিয়ে ঐ শিশুকে গামলায় করে গরমজল সাবান দিয়ে চান করিয়ে পাউডার মাখিয়ে নতুন জামা পরিয়ে, কাঁথায় জড়িয়ে নিজের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। ঐ শিশুর নাম রেখেছিল তার মা ও বাপ 'সিদ্র'। সারাদিন কাজকর্ম সব করে দিয়ে সন্ধ্যে হবার একটু আগে 'সিদ্র'কে পিঠে বেঁধে কোয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কান্তাই নিজের বাড়ি ফিরে যেত।

প্রত্যেকদিন কান্তাই সকালে আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত কে আগে 'সিদ্র'কে কোলে নেবে। আমি ও পুঁটু সর্বক্ষণ ওঁত পেতে থাকতাম ওটাকে একটু ঘাঁটবার লোভে। কিন্তু কান্তাই আসামাত্র মা 'সিদ্র'কে নিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে নিজের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন রোজ। মা ও দিদি-মেজদি মিলে 'সিদ্র'র জন্য উলের জামা, মোজা, টুপি, কাঁথা ইত্যাদি অনেক তৈরী করলেন। 'সিদ্র'র জন্য বিছানা তৈরী হল—ছোট ছোট দুটো পাশবালিশ, ছোট একটা মাথার বালিশ, ছোট তোশক সব। ক্রমে সে বড় হতে লাগলো। তার দু মাস বয়স হলে পর তার মা তাকে রোজ কলা চটকে খাওয়াত বেলা এগারোটার সময়। ঐটুকু শিশু হলেও সে দিব্যি সুন্দর একটা পাকা কলা খেয়ে ফেলতো। কান্তাই নিজের বাড়ি থেকে কলা নিয়ে আসতো প্রথম প্রথম। তা দেখে মা তাকে বললেন, আমাদের ঘর থেকে কলা নিয়েই যেন খাওয়ায়।

'সিদ্র' ক্রমশঃ বড় হতে লাগলো এবং পরে সে আমাদের সঙ্গে বসেই আমরা যা খেতাম সব খেতো। খাসিয়ারা সাধারণতঃ নিজেদের খাবার ছাড়া অন্য খাবার কক্ষনো খেতে চাইত না। তারা খেতো হয় শুঁটকি মাছ পোড়া, একটা শুকনো লঙ্কা পোড়া ও খুব মোটা লাল চালের ভাত, নইলে খেতো ভুট্টাসেদ্ধ ও দুধ চিনি ছাড়া চা কিম্বা রাঙাআলু পোড়া। মাঝে মাঝে ঝলসানো শূয়োরের মাংসও খেতো। বাড়িতে কেউ মারা গেলে আস্ত শূয়োরকে পোড়াত এবং কয়দিন জুড়ে যেমন যেমন আত্মীয়স্বজনরা আসতো, সকলে একত্র হয়ে ঐ পোড়া মাংস ও ভাত খেতো। তবে যারা খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল তারা খুব বেশী ইংরেজের অনুকরণে চলতো।

বছর ছয় কাজ করার পর 'সিদ্র'কে নিয়ে তার মা স্বামীর সঙ্গে তাদের গ্রামে চলে গেল। ঐ ছোট্ট ছেলেটি চলে যাওয়াতে আমরা সবাই খুবই দুঃখিত হয়ে পড়লাম।

১৯২০ সনে দিদি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা খুব ভাল করে পাস করলেন। কিন্তু এই পরীক্ষা দিতে যাবার সময় এক সাংঘাতিক অঘটন ঘটনা ঘটলো। শিলং-এর 'বয়জ্ হাই স্কুলে' মেয়েদেরও ম্যাট্রিক পরীক্ষার 'সিট' পড়েছে। বাবা নিজেই টম্‌টম্ চালিয়ে দিদিকে পরীক্ষা দেবার জন্য নিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা ঘটলো দ্বিতীয় দিনে।

আমাদের বাড়ি থেকে মোখারে যাবার পথে একটা খাদের উপর একটা ব্রিজ পার হতে হতো, ব্রিজ পার হয়ে দুদিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। একটা গেছে 'বয়জ্ হাই স্কুল'-এর দিকে, অন্যটা গেছে মেয়েদের 'ওয়েলস্ মিশন স্কুলে'র দিকে।

বাবা গাড়ি চালিয়ে দিদিকে নিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ অন্যমনস্ক হওয়াতে ঘোড়ার লাগাম বাঁদিকে ভাল টেনে ধরেননি। ঘোড়ার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল বরাবর 'ওয়েলস্ মিশন স্কুলে'র রাস্তা ধরে যাবার। সে ঐ পথ ধরেছে দেখে বাবা তাড়াতাড়ি বাঁদিকে তাকে ঘোরাবার চেষ্টা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে রাশ ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম সব ছিঁড়ে লাফিয়ে উঠে নীচে খাদে পড়ে গেল। গাড়ির সামনেটা ভেঙে ব্রিজের লোহার রেলিং-এ আটকা পড়লো। রাস্তার লোকেরা দৌড়ে এসে দিদি ও বাবাকে গাড়ির ভেতর থেকে বার করলো। তখনকার মত সামলে গিয়ে বাবা দিদিকে

হাঁটিয়ে নিয়েই পরীক্ষার হলে পৌঁছে দিলেন।

বিকেলবেলা ইস্কুল থেকে এসে দেখলাম বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন এবং বাড়ির সকলে চুপচাপ খুব গম্ভীর। ব্যাপারটা সব শুনে দৌড়ে আস্তাবলে ঘোড়াকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, পেছনের একটা পা 'প্লাস্টার অব্ প্যারিস' দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এরপর রোজই ভেটারিনারী ডাক্তার এসে ঘোড়াকে দেখে যেতেন এবং ব্যান্ডেজ খোলার পর বহু দিন মালিশের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘোড়ার পায়ের হাড়ের জখম আর সারলো না। তখন অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে ঘোড়াকে গুলি করে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। ঘোড়ার খরচাপত্রের সব ব্যবস্থা করে পিঞ্জরাপোলে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে প্রতি সপ্তাহে একবার করে দেখে আসতেন যতদিন সে বেঁচেছিল।

দিদি ম্যাট্রিকুলেশন খুব ভাল করে পাস করলেন। এই উপলক্ষে 'দাদামশায়' (রায়বাহাদুর সদয়াচরণ দাস) খুব বড় একটা টি-পার্টি দিলেন। আমার এখনো চোখে ভাসে দিদিমণি নানারকম খাবার দিয়ে, কারুকার্য করা টেবিলের কাপড় পেতে, টেবিলের মাঝখানে তাঁদের বাগান থেকে তোলা গোলাপফুল দিয়ে ফুলদানী সাজিয়ে কি অপরূপ পরিবেশ করেছিলেন। আর পরীক্ষা পাসের উপলক্ষে বিশেষ করে অর্ডার দিয়ে লাল চোখ আঁকা হুবহু একটা মাছের আকারের কেক করিয়েছিলেন 'মরেলো'র দোকান থেকে। শিলং-এ কেক, প্যাস্ট্রি ইত্যাদির জন্য 'মরেলো' বলে এক ইটালীয়ানের দোকান ছিল। ঐ কেক-এর মত কেক বিলাতে আসার আগে আর দেশে থাকতে কখনো কোথাও খাইনি।

ইতিমধ্যে পুঁটুর টাইফয়েড হল। দিদি ও মা দুজনে মিলে অক্লান্ত সেবা করতে লাগলেন। যে ঘরে পুঁটুকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল আমাকে সে ঘরে যেত দেওয়া হতো না। আমার তো ভয়ানক মন খারাপ। প্রায়ই এদিক দিয়ে, ওদিক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে পুঁটুকে দেখবার চেষ্টা করতাম। একদিন ডাক্তারবাবু এসেছেন, জানলার বাইরে দেখলাম তিনি একটা স্পিরিটল্যাম্প জ্বেলে পুঁটুর বুকে বসিয়ে কি করছেন। দেখে আমার কান্না এসে গেল। আমি বাইরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছি, মেজদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছিস কেন?' আমি বললাম, 'পুঁটুকে ডাক্তারবাবু আগুনের ছ্যাঁকা দিচ্ছেন।' তখন মেজদি বোঝালেন, 'পুঁটুর টাইফয়েড জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়াও হয়েছে, ঐ ল্যাম্পের গরমে বুকে জমে যাওয়া সব শ্লেষ্মা গলে যাবে।' তারপর হঠাৎ একদিন যখন দেখলাম পুঁটুর মাথার সব চুল ছেঁটে একেবারে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে, সেদিন আর আমার কান্না কেউ থামাতেই পারে না। বাবা, মা, দিদি, মেজদি সবাই মিলে অনেক করে বোঝালেন যে কয়েকদিনের মধ্যে আবার সুন্দর চুল গজিয়ে উঠবে।

জ্বর নামাবার জন্য রোজ 'আইস্‌ব্যাগ' মাথায় দেওয়া হতো, সেজন্য প্যাস্তর ইন্‌স্টিটিউট্ থেকে বেনোয়ারী মালিকে পাঠিয়ে কাঠের করাতের গুঁড়োর ভেতরে করে বস্তাভরে বরফ আনানো হতো। প্যাস্তর ইন্‌স্টিটিউটে বরফ তৈরী করার যন্ত্র ছিল।

পুঁটুর জ্বর ছাড়ার পর তার কাছে গিয়ে বসবার ও খেলা করবার অনুমতি পেয়ে খুবই আনন্দ পেলাম ও আশ্বস্ত হলাম। কয়দিনের মধ্যেই তার ঘন কালো থোকা থোকা কোঁকড়া চুল গজিয়ে উঠলো। পুঁটুর মাথায় ঐ কোঁকড়া কালো চুল দেখে একটু হিংসেই বোধ করতে লাগলাম, যদিও আগে তার ন্যাড়ামাথা দেখে কেঁদেছিলাম।

পরের বছর মেজদিও ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেন। সেই সময় দাদামশায় দিদি ও মেজদিকে পড়াবার জন্য নানারকম বই আনিয়ে আনিয়ে দিতেন। তার মধ্যে 'নারায়ণ' পত্রিকাও আনাতেন, সেটা আমার খুব ভাল মনে আছে।

সেই সময়ে লীলামাসী শিলং বেড়াতে এলেন বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে। ইনি ঢাকায় গিরিশ নাগ (সম্পর্কে মা'র কাকা হতেন) বলে বিশিষ্ট একজন সরকারী চাকুরে ছিলেন, তাঁরই একমাত্র মেয়ে। ইনি পরে বিয়ে করে লীলা রায় হয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশেষ নেত্রী ছিলেন। কয়দিন লীলামাসী ও দিদি-মেজদিরা খুব হৈচৈ করলেন। আমরা ছোটরা শুধু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে সব দেখলাম। তবে সেই সময় থেকে লীলা মাসীকে দেখে মাথায় ঢুকে রইল যে লীলামাসীর মত আমিও কলেজে পড়বো।

॥ ৬ ॥
দিদির বিয়ে ও ভ্রমণ

১৯২১ সনের অক্টোবর মাসে আমাদের কলকাতা যাওয়া ঠিক হলো। শুনলাম দিদির বিয়ে হবে।

আমাদের একজন ড্রয়িংমাস্টার ছিলেন, তিনি শনি-রবিবারে এসে আমাদের 'ড্রয়িং' করা ও দিদি-মেজদিকে রং তুলি দিয়ে 'পেন্টিং' করতে শেখাতেন। দেখলাম তিনি বিয়ের জন্য নানারকম ঘট ও কুলো ইত্যাদিতে এঁকে দিলেন নানা রকম রং দিয়ে এবং মা খুব সযত্নে সেগুলি কাপড় দিয়ে মুড়ে মুড়ে একটা বাক্সে প্যাক্ করলেন।

এর আগে আমরা আর কখনও শিলং থেকে বের হইনি। সেজন্য কৌতূহল হলো খুব বেশী। শিলং থেকে আমরা বাসে রওয়ানা হয়ে গৌহাটি এসে মায়ের এক আত্মীয়ের বাড়ি এক রাতের জন্য রইলাম। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ কলকাতা রওয়ানা হয়ে যাবো। শিলং থেকে গৌহাটি পৌঁছে ভীষণ গরম লাগলো। তারপর গৌহাটির পানবাজারের আশপাশ সব দেখে একটু মুষড়ে গেলাম। চারদিকে সর্বত্র ভাঙাগলায় কা কা করছে ও উড়ে বেড়াচ্ছে নতুন চেহারার কাক, যাকে আমরা পাতিকাক বলে জানতাম। শিলং-এর কাক সব কুচ্‌কুচে কালো রং-এর দাঁড়কাক, তাও বিশেষ চোখে পড়েই না। বাড়িগুলি সব নীচু খড়ের ছাউনি দেওয়া, জানালা ও দরজা সব বাঁশ ও চাটাই-এর। খড়্ খড়্ করে টেনে বন্ধ করতে হয়।

তারপর সন্ধ্যের দিকে আমাদের ট্রাঙ্কগুলো সব লোহার শেকল দিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বেশ করে বেঁধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তালা লাগিয়ে রাখা হলো, যাতে রাত্তিরে চোর

এসে সিঁদ কেটে চুরি করে না পালাতে পারে।

রাত্তিরে সেই বাড়ির এক বৌএর সঙ্গে এক বিছানায় আমায় শুতে দেওয়া হলো। মা পুঁটুকে নিয়ে একটা খাটে ও দিদি-মেজদি আরেকটা খাটে অন্য ঘরে রইলেন। বাবা রইলেন আমাদের খুড়তুতো ভাই বীরেনকে নিয়ে তাঁদের বৈঠকখানায়। রাত্তিরে বৌটি এসে যখন মশারী টাঙিয়ে দিলেন, আমার তো নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। আগে কোনও দিনও মশারী দেখি নি বা তার ভিতরে শুই নি। কারণ শিলং-এ মশা নেই। আমি মশারীর নীচে শুতে ঘোরতর আপত্তি করায় বৌটি আমাকে নানারকম মিষ্টি কথায় বোঝাতে লাগলেন যে মশা কামড়ে কি রকম হাত-পা, মুখ সব ফুলিয়ে দেয়। ঘুম আর আসে না, একে তো মশার কামড়ের আশঙ্কা, দ্বিতীয়তঃ ঐ বাঁশের দরজা-জানালার ভেতর দিয়ে রাত্রে যদি চোর আসে, সেই ভয়। শিলং-এ সেই সময়ে কোনও চোরও ছিল না। সারাদিন শ্রান্তক্লান্ত থাকায় কখন ঘুমিয়ে পড়লাম টের পেলাম না। যখন ঘুম ভাঙলো দেখি দিনের আলোতে ঘর ভরে গেছে। বৌটি উঠে গেছেন।

সকালে উঠে একটু এদিক ওদিক ঘুরেফিরে রওয়ানা হবার জন্য সবাই তৈরী হয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে গাড়ি করে আমরা গৌহাটি স্টেশনে গেলাম।

বাবা আগে থেকেই ফার্স্ট-ক্লাস কম্পার্টমেন্ট 'রিজার্ভ' করিয়ে রেখেছিলেন। সঙ্গে আমাদের দুজন লোক ছিল। স্বরূপদাদি ও অন্যটির নাম ছিল গুপী। তাদের 'সারভেন্টস্ কম্পার্টমেন্টে' পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

প্রথমে গাড়িতে উঠেই চারদিক খুব ভাল করে দেখা শুরু করলাম। বাবা 'চেন' দেখিয়ে বললেন, কোন কিছু বিপদ হলে এই 'চেন' ধরে টানলেই গাড়ি থেমে যায় এবং গার্ড দৌড়ে আসে কি হয়েছে দেখবার জন্য ; এবং আমাকে ও পুঁটুকে খুব সাবধান করে দিলেন, কৌতূহলশতঃ যেন ঐ চেন টেনে না ফেলি। তারপর পাখা ও আলোর সুইচ টিপে দেখালেন পাখা কি করে চলে ও আলো কি করে জ্বলে। শিলং-এ তখনও ইলেকট্রিসিটি হয় নি, বরাবর আমাদের ঘরে ঘরে মোমবাতি জ্বালানো হত, এবং রান্নাঘরের জন্য জ্বালানো হত কেরোসিনের লণ্ঠন। পাখা ও আলো দুটোই দেখে আমাদের খুব আশ্চর্য লাগলো এবং বার বার সুইচ টিপে টিপে আমি আর পুঁটু মজা দেখতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা 'পাণ্ডুঘাট' এসে পৌঁছলাম। আবার কুলির মাথায় মোটঘাট তুলে 'ফেরী'তে উঠলাম, ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে ওপারে আমিনগাঁও স্টেশনে যাবার জন্য।

ফেরীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো ফার্স্ট ক্লাস ডেকে বসে চারদিকের দৃশ্য, উমানন্দ পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র নদীর জল, মাঝে মাঝে জল থেকে শুশুক লাফিয়ে উঠছে এসব দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছিল।

অল্পক্ষণ পরেই ফেরী আমিন গাঁ স্টেশনের ঘাটে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে গিয়ে আমরা ট্রেনের আর একটি রিজার্ভ করা কামরায় গিয়ে উঠলাম। গাড়ি ঘোরতর বেগে চলতে লাগল। সারাদিন শ্রান্তক্লান্ত থাকায় ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে সান্তাহার

জংশনে গাড়ি বদল করে অন্য বড় গাড়িতে চড়া হলো। এ গাড়ি আবার অন্য রকমের। গাড়ির কামরাগুলি ছোট ছোট এবং তার ধার দিয়ে লম্বা বারান্দা চলে গেছে ট্রেনের একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত। মালপত্র বেশীর ভাগ গার্ডের চার্জে দিয়ে অল্প কিছু সঙ্গে রাখা হলো।

মা ও দিদিদের ওপর সব গোছগাছ করবার ভার দিয়ে বাবা আমাকে ও পুঁটুকে রেলগাড়ির প্রকাণ্ড ইঞ্জিন দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন। রেলের লোকেরা ইঞ্জিনের ভিতরে কয়লা দিচ্ছে, ভেতরে গরম লাল আগুন দেখা যাচ্ছে, কেউবা মাথায় একটা সাদা কাপড়ের টুকরা বেঁধে তেলের ক্যান নিয়ে ইঞ্জিনের এদিক ওদিক তেল দিচ্ছে। সাহেব ড্রাইভার হঠাৎ একটা কি টিপে 'পিক্' শব্দ করে খানিকটা বাষ্প ছেড়ে দিল, এসব দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গাড়িতে ফিরে এসে ইঞ্জিনের সব কি রকম কি দেখলাম মা দিদি ও মেজদির কাছে ব্যাখ্যা করতে লাগলাম। আমাদের কাছে সব শুনে বুঝতে পারলাম দিদি-মেজদিও একটু মনে মনে আপসোস করছেন তাঁরা দেখতে পেলেন না বলে। তাঁরা মুখে অবশ্য কিছু বললেন না। তাঁদেরও এই প্রথম রেলগাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা।

আমরা সকলে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে গিয়ে দেখা গেল চাকরদের কামরায় যে বাস্কেট ছিল, সাবানদানি তার মধ্যে রয়ে গেছে। বাবা পোড়াদহ স্টেশনে গাড়ি থামা মাত্র সেটা আনতে গেছেন, এরই মধ্যে বাঁশী বাজিয়ে গাড়ি দিল ছেড়ে। আমাদেরও অসম্ভব মন খারাপ, অতিশয় বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন মা। দিদি আমাদের বোঝাতে লাগলেন যে বাবা নিশ্চয়ই গাড়ি চলামাত্র অন্য কোন কামরায় উঠে পড়েছেন। ক্রমশঃ গাড়ির বেগ বাড়তে লাগলো এবং বেশ খানিক পরে রানাঘাট স্টেশনে এসে যখন থামলো, তখন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি বাবা সাবানদানি হাতে গাড়ির দিকে আসছেন। তখন মার মনটা শান্ত হলো।

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে চারদিক দেখে খুবই আশ্চর্য লাগছিল। মায়ের এক পিসতুতো ভাই হিমাংশুমামা স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে কুলীদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে আসার পর হিমাংশুমামা দুটো ঘোড়ার গাড়ি ডেকে, সেই গাড়ি দুটোর ছাদের উপরে আমাদের মালপত্র তুলিয়ে গাড়িতে চড়ে বসতে বললেন। প্রকাণ্ড বাক্সমত গাড়ি দেখে মনে মনে ভাবলাম এ আবার কি রকমের গাড়ি ? শিলং-এ আমরা টমটম্ কিম্বা ফিটন গাড়িতে চড়ে অভ্যস্ত ছিলাম।

গাড়ি দুখানা অন্দরমহল ও বারমহলের মত ভাগ হলো। মা ও আমরা চার বোন এক গাড়িতে এবং অন্য গাড়িতে বাবা, দাদা (বীরেন), হিমাংশুমামা ও দুই চাকর। বাবাদের গাড়ির জানালা খোলাই রইল। কিন্তু মা ও আমরা পর্দানশীন দলভুক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি জানালা তুলে দিল। আমরা ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে জানালাগুলি খুলে দেবার জন্য কাকুতিমিনতি করতে লাগলাম। পরে যখন আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা চেঁচামেচি করলাম তখন গাড়ির

জানালার খড়খড়ি তুলে দেওয়া হলো। আমরা ঐ খড়খড়ির ভিতর দিয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে মায়ের পিসিমার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম।

সেখানে পৌঁছে আমরা স্নান, খাওয়াদাওয়া সারলাম। ওখানে এই প্রথম জল দিয়ে ফ্লাশ-করা পায়খানা দেখে তো অবাক। আমি, পুঁটু আর দাদা তিনজনে মিলে একটু পরে পরেই গিয়ে ফ্লাশ-এর ট্যাঙ্কের চেইন টেনে দিয়ে খড়খড় শব্দ করে জল পড়ার তামাসা দেখতে লাগলাম। আমাদের জন্য আগেই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটা বাড়ি ভাড়া করে রাখা হয়েছিল। বিকেলবেলা সেই বাড়িতে আসা হলো সবাই মিলে।

আমাদের সঙ্গে শিলং থেকে দুটি চাকর এসেছিল বটে কিন্তু কলকাতায় আরও তিনটি লোক রাখা হল। একটি রান্নাবান্না করবার জন্য ঠাকুর, একটা চাকর বাজার করতো ফাইফরমাস খাটতো এবং ঝি আমাদের সকলের কাপড়চোপড় ধুতো, ঘরদোর ঝাঁট দিতো, মুছতো আর বাসন মাজতো।

প্রথম প্রথম ঝিকে প্রায় খালিগায়ে, ঠাকুরও শুধুগায়ে পৈতে ঝুলিয়ে, ছোকরা চাকরকেও ঐ একই অবস্থায় দেখে আমরা বলাবলি করতাম যে এরা কি অভদ্র, সবসময়ে এরকম খালিগায়ে থাকে, শিলং ঠাণ্ডা দেশ, সেখানে কখনও কেউ সারাক্ষণ শুধুগায়ে থাকে না। নানারকম সব দেখে যেমন আশ্চর্য লাগতো, কতকগুলি ব্যাপারে খুব খারাপও বোধ করতাম।

শিলং-এ বরাবর আমাদের কাঠের জ্বালে রান্না হতো। কয়লার আগুন (কোক্ কয়লা) কখনো দেখি নি। কাঁচা কয়লা 'ফায়ার প্লেসে' জ্বালানো হতো, কিন্তু তার ধোঁয়া সব চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যেতো। কলকাতা এসে ঘুঁটে, কেরোসিন জ্বেলে কয়লা ধরানো, তার বিচ্ছিরি গন্ধে ও ধোঁয়ায় সমস্ত বাড়ি ভরে যাওয়া এবং সন্ধ্যেবেলা সমস্ত কলকাতা শহর ধোঁয়ায় অন্ধকার— যেন অসহ্য বোধ হত।

তবে ঐ সময়টাতে আকাশে সমানে নানা রং-এর ছোটবড় ফানুস উড়তে দেখে এবং সন্ধ্যেবেলায় ছাদে ছাদে আকাশপ্রদীপ জ্বলতে দেখে খুবই আনন্দ পেতাম। কলকাতায় এসে মনে হলো এ আমরা অন্য জগতে এসেছি।

অনেক ব্যাপারে খুবই আশ্চর্য বোধ করতাম। রোজ ভোরে ও বিকেল চারটের সময় দুটি উড়িয়া লোক একটা প্রকাণ্ড মোটা লম্বা নল কাঁধে করে এনে রাস্তার 'হাইড্রেন্ট' খুলে রাস্তায় জল দিত। ভর্‌ভর্ করে জল বার হওয়ার শব্দ শুনলেই আমি আর পুঁটু দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কি ভাবে কি হচ্ছে দেখতাম। তারপর যত বেলা বাড়তো, শুরু হতো ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক। বেলা এগারোটা নাগাদ সুর করে গেয়ে যেতো 'মাথার ফিতে-কাঁটাওয়ালা', ঠেলাগাড়ি হেঁকে নানারকম পুতুল, কাঁচের ও চীনামাটির বাসন নিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতো 'হরেক্ মাল দু-দু'আনা'। আবার 'বরফ, বরফ, পাঙখা বরফ' বলে কেউ বা একটা কাঠের বাক্স মাথায় নিয়ে তার মধ্যে বড় বরফের টুকরা একটা নোংরা বস্তার টুকরো দিয়ে মুড়ে, একটা বোতলে লাল রং-এর সিরাপ জাতীয় জলীয় কি নিয়ে যেতো। বাক্সের কোণায় কিছু বাঁশের

কাঠি ও একটা কাঠের হাতুড়িও থাকতো। 'পাঙখা বরফ' হাঁক শুনতে পেলেই আমি আর পুঁটু পয়সা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির সদর দরজা খুলে গিয়ে লোকটাকে ডাকতাম। সে তার বাক্স মাথা থেকে নাবিয়ে এক টুকরো বরফ ভেঙে তার মধ্যে বাঁশের কাঠি একটা রেখে এক টুকরা ন্যাকড়ায় মুড়ে সেটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পিটে পিটে চ্যাপ্টা একটা ছোট পাখার মত করতো, তারপর বোতল থেকে খানিকটা লাল সিরাপ ঢেলে দিয়ে আমাদের দুজনের হাতে দুটো দিত। আমরা দু বোনে সেগুলি খুব আনন্দের সঙ্গে চুষে চুষে খেতাম। মা কত বারণ করতেন ওগুলো খেতে। বলতেন, 'আমি তোদের তৈরী করে দিচ্ছি।' কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুনতামই না।

বেলা আড়াইটা তিনটা হলে যেতো 'বাসনওয়ালা'। এর আবার আরেক রকম কায়দা। ডাক-হাঁক নেই। একটা লোকের মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানারকম পেতল, কাঁসার বাসন চাপিয়ে বাসনওয়ালা নিজে একটা বাসনে ঠং ঠং করে শব্দ করে আস্তে করে হেঁটে ফুটপাত দিয়ে চলতে থাকতো। বিকেল যখন বেশ ঘনিয়ে আসতো, আবার শুনতাম, কেউ বা হেঁকে যাচ্ছে 'অবাক জলপান' 'ঘুগ্‌নিদানা'। এদের আওয়াজ শুনলে পর আমরা ছটফট করতাম কিনবার জন্য। মা অনেক কষ্টে আমাদের দুই বোনকে ওসব খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতেন। সন্ধ্যে হলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে 'কুলফি বরফ' বলে যেতো হেঁকে হাঁড়ি একটা মাথায় করে। এই দ্রব্যটি কখনো দেখবার চেষ্টা করিনি। কারণ আমাদের বলা হয়েছিল, কুষ্ঠ রোগীকে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে, সেই দুধ দিয়ে কুলফি বরফ তৈরী হয়।

ছেলেমেয়েদের 'সন্দেশ' পত্রিকায় সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' পড়ে খুবই কৌতূহল হয়েছিল যে না-জানি কি উপাদেয় খাদ্য। পরে দেখলাম কিছুই না, একটি চোঙামত কাগজের ঠোঙায় গুটিকয়েক 'চানাচুর'! অলিগলিতে ছোট ছোট খাবার, মিষ্টি এবং মুদীর দোকানে সন্ধ্যে থেকে ঝোলানো তেলের কুপি জ্বলতো দেখে সবই যেন কেমন একটা অদ্ভুত দৃশ্য মনে হতো।

তারপর যখন অন্ধকারে টিম্ টিম্ আলো হাতে নিয়ে আলখাল্লা পরে মুসলমান ফকির 'মুস্কিল আসান' বলে এসে দাঁড়াতো সদরের সামনে, তখন তার ঐ পোশাক, ডাক, চেহারা অন্ধকারের মধ্যে ওপরতলা থেকে দেখে খুবই ভয় পেতাম এবং আস্তে করে জানালা বন্ধ করে দিতাম।

একটা ব্যাপারে খুবই আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা যে বাড়িটায় ছিলাম, ঠিক রাস্তার উল্টোদিকে সামনেই একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। এরকম ইঁট গেঁথে বাড়ি তৈরী হতে কখনো আগে দেখিনি। ভারা বেয়ে বেয়ে ঝুড়িতে ইঁট নিয়ে কুলীরা উপরে উঠে যেতো, তারপর সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কতকগুলি মেয়ে সুর করে গান গেয়ে গেয়ে সারি দিয়ে বসে কাঠের চ্যাপ্টা ডাণ্ডা দিয়ে ছাদ পেটাত, এসব দেখতে খুবই মজা লাগতো। আরও আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে পড়তাম রাজমিস্ত্রীর সুন্দর সূক্ষ্ম ফুল, লতা গড়ে তোলার রকম দেখে। চুন, সুরকি মেখে 'মর্টার' করে এবং কর্ণি দিয়ে থামের মাথায় মাথায় সে অতিশয় নিপুণভাবে ভারার উপর চড়ে

বসে আপনমনে কি চমৎকার নানারকমের ডিজাইনের কারুকার্য করে যেতো। কত সময় বারান্দায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত রাজমিস্ত্রীর কাজ দেখতে দেখতে।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়িতে যাওয়ার দুদিন পর অজিতবাবু (ইনি দিদির ভাসুর হবেন) আমাদের বাড়ি এসে মা-বাবার সঙ্গে আলাপসালাপ করে আমাকে, পুঁটুকে নিয়ে গেলেন 'মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে'। আমরা ট্রামে চড়ে গেলাম। ট্রাম দেখেও একটু অবাক হয়ে গেলাম। দুইটা লোহার লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলেছে, আর গাড়ির মাথায় লোহার ডাণ্ডা একটা তার ছুঁয়ে চলেছে।

অজিতবাবু মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে প্রথমে নিয়ে গেলেন 'আইস্‌ক্রীমে'র দোকানে। সেখানে গোলাপী রং-এর 'আইসক্রীম' কিনে দিলেন। এর আগে আইস্‌ক্রীম কখনও খাইনি। শিলং ঠাণ্ডা জায়গা বলে সেখানে কেউ আইস্‌ক্রীম খেতো না। পুঁটু এক চামচ মুখে দিয়েই অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বলে তাড়াতাড়ি মুখ থেকে বের করতে গিয়ে তার ভাল সিল্কের ফ্রকে ফেলে একাকার করলো। অজিতবাবু নিজে এক পেয়ালা চা খেলেন। তারপর এদিক-ওদিক অন্যান্য সব দোকানপাটের সামনে ঘুরে আমাদের ঠোঙাভর্তি ডালমুট ও লজেঞ্জুস কিনে দিলেন।

ফুলের দোকানগুলি দেখেও খুব আনন্দ হলো। রকমারি মরসুমী ফুল দেখে অভ্যস্ত হলেও নানা রকমের অজানা সুগন্ধি ফুলের গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছিল।

আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছানোর কয়দিন পরেই দিদিমা ছোটমামাকে নিয়ে শিলচর থেকে দিদির বিয়ের জন্য এলেন। দিদিমা আসাতে একদিকে যেমন খুশী হয়েছিলাম, আবার তেমনি খুব বিরক্তি বোধ করতাম। কারণটা হলো—কলকাতায় আসবার সময়টাতে মা বললেন, 'এবার থেকে ফ্রক পরা ছেড়ে দিদিদের মত শাড়ি ব্লাউস পরা আরম্ভ কর।' এই বলে কয়েকটা ব্লাউস ইত্যাদি তৈরী করিয়ে দিলেন, নতুন নতুন শাড়িও কেনা হল। শাড়ি পরা আরম্ভ করলেও সুবিধা পেলেই ওটা খুলে ফেলে দিয়েই ফ্রক পরে বসে থাকতাম। দিদিমা আমাকে শাড়ি ছাড়া দেখলেই খুব বকুনি দিতেন। আমি তাতে মনে মনে খুবই বিরক্তি বোধ করতাম।

দিদির বিয়ের দিনকয়েক আগে বাবা আমাদের মাসতুতো বোন স্নেহদির শ্বশুরবাড়ি দেখা করতে গেলেন। এঁরা সকলে ব্রাহ্ম ছিলেন এবং মাসীমারা দীক্ষিত ব্রাহ্ম ছিলেন। স্নেহদি সেসময় বাপেরবাড়ি ছিলেন। ভগ্নিপতি প্রকৃতিকুমার ঘোষ তখন থেকে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। তিনি বেশ ভাল গান গাইতে পারতেন। তাঁর টেবিল হারমোনিয়ামটা আমাদের বাড়ি নিয়ে এলেন। এবং রোজই সন্ধ্যায় এসে গানবাজনা করে যেতেন।

১৯২১ সনের ১৭ নভেম্বর দিদির বিয়ের দিন ঠিক হলো। কলকাতা পৌঁছেই দিদিকে দেবার জন্য নানারকম জিনিসের অর্ডার বাবা দোকানে দোকানে দিয়ে রাখলেন। তখনকার দিনে বাঙালী মেয়েরা বিশেষ কেউ দোকানে যেতেন না। এইজন্য নানারকমের শাড়ি দোকানদার মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে এলো দেখাবার জন্য। সুন্দর সুন্দর রং-এর সোনালি ও রূপোলি জরির আঁচল ও পাড়ের বেনারসী শাড়ি দেখে

তো মুগ্ধ। এত রকমের রকমারি বেনারসী শাড়ি আগে দেখি নি। একমাত্র মায়ের বিয়ের বেনারসী ছিল বেগুনী রং-এর কিন্তু তার সাইজ খুবই ছোট ছিল। কারণ মার খুবই কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল।

দিদির বিয়ের দু'তিনদিন আগে থেকে আসবাব ও অন্যান্য সব জিনিসপত্র আসতে লাগলো। ক্রমশঃ আমাদের উৎসাহ বেড়ে চললো। এর আগে কখনো এরকম বিয়ে দেখি নি। শিলং-এ একটি মেয়ের বিয়ে দেখেছিলাম বটে, তবে তখন খুবই ছোট ছিলাম। একটু আবছামত মত মনে পড়ে যে বিয়ের কনেকে লাল চেলী পরিয়ে একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত করে পিঁড়িতে বসিয়ে পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক বরের চারদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

দিদির বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল ১৭ নভেম্বর। হঠাৎ শুনলাম, সেইদিন বিলেত থেকে তখনকার 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' যিনি অল্প কিছুদিনের জন্য 'অষ্টম এডওয়ার্ড' হয়ে রাজা হয়েছিলেন তিনি বোম্বাই নামবেন। মহাত্মা গান্ধী সেইদিন ভারতবর্ষের সর্বত্র হরতাল করতে নির্দেশ দিলেন। হরতাল ব্যাপারটা কি ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। তবে বার বার একে-তাকে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম যে, সেদিন বাজারহাট সব বন্ধ থাকবে এবং লোকজন কেউ রাস্তায় বের হবে না।

বাবা হিমাংশুমামার উপর সব কাজের ভার দিয়েছিলেন। বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলা যাবতীয় তৈজসপত্রাদি, তরিতরিকারী ইত্যাদি কিনে আনা হোল। ঝুড়ি ভর্তি করে বড় বড় রুইমাছ ও গলদা চিংড়ি এনে বরফ দিয়ে বাক্সে প্যাক করা হোল। হাঁড়ি হাঁড়ি দই ও রাবড়ী এলো।

আর সন্ধ্যা হতেই চারপাঁচজন ময়রা এলো বড় বড় হাতা, ঝাঁঝরা, কড়া নিয়ে মিষ্টি করবার জন্য। আরও এলো তাল তাল ছানা, খোয়া, বস্তাভর্তি চিনি ইত্যাদি। বড় বড় উনুন তৈরী করে সারারাত ধরে তারা কত রকমারি মিষ্টি তৈরী করে রেখে গেল।

পরদিন ভোরে শানাইওয়ালাদের শানাই-এর 'প্যাঁ' আওয়াজ শুনেই আমি আর পুঁটু লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে সারাদিন ধরে একেবারে দিশেহারা হয়ে রইলাম। কখনো একতলায় উঠোনে মাছকাটা, তরকারী কোটা দেখছি, কখনো ছাদে উঠে ঠাকুরদের রান্নার যোগাড় দেখছি। আবার যে ঘরে সব দানসামগ্রী সাজানো হচ্ছিল তাই খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছি। কখনো বা মায়েদের হুলুধ্বনি ও শঙ্খ বাজিয়ে স্ত্রী-আচারের পর্ব উপভোগ করছি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। বিয়েতে কিছু লোকজন এলেন বটে কিন্তু সকলেই প্রায় পায়ে হেঁটে। হরতালের জন্য সমস্ত কলকাতা সহর একেবারে নিরালা নিঝুম। রাস্তাঘাটে মানুষ কিম্বা যানবাহন কিছুই ছিল না। বরযাত্রী কয়েকজন হেঁটেই এলেন। শুধু বর এলেন এক চৌকো প্রাইভেট ঘোড়ার গাড়ি করে। পরে শুনেছিলাম ঐ গাড়িটা ছিল ভূতপূর্ব সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হেরম্ব মৈত্রের। খাবারদাবারের এত আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু বহু লোক না আসতে পারায় প্রচুর খাবার নষ্ট হল। পরদিন বর-

কনে বিদায় হয়ে যাওয়ায় বাড়ি হয়ে গেল অসম্ভব খালি। তারপর শুরু হলো আমাদের কলকাতা দেখার পালা।

শিলং থাকাকালীন কলকাতার 'চিড়িয়াখানা' ও 'যাদুঘরে'র কথা খুব শুনেছিলাম। এবার চাক্ষুষ দেখা হবে মনে করে খুব ফুর্তি হলো। দিন ঠিক হলো আলিপুরের 'জু' দেখতে যাবার জন্য। সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সেরে রওনা হলাম সবাই মিলে। ধারণা ছিল সব জন্তুকে কেমন সুন্দর দেখবো। কিন্তু যখন তাদের দেখলাম, হতাশ হয়ে বেশ দুঃখ বোধ করতে লাগলাম। বরাবর ছবিতে যেরকম কেশর ফোলানো সিংহ দেখেছি, ভেবেছিলাম সেই রকম দেখবো। তার বদলে অতি নোংরা, রোগা, ঘেয়ো একটা সিংহ দেখে মুষড়ে পড়লাম। বাঘ দেখেও সেই একই অবস্থা। বেচারী বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, উপযুক্ত পরিমাণ খাবারের অভাবে তার পেটের চামড়া ঝুলে পড়েছে। তবে বাঁদরগুলো কেবল লোকদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেয়ে খেয়ে বেশ নেচে বেড়াচ্ছে। নানারকম পাখী দেখতেও বেশ ভাল লাগলো। গণ্ডার ও হিপোপটেমাসকে কাদায় গড়াগড়ি করতে দেখে গা ঘিনঘিন্ করতে লাগলো। সবচেয়ে বিরক্তি বোধ করলাম রেটা উটের কাণ্ড দেখে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, সে ভুষি খেতে খেতে রেলিং-এর ধারে এসে এমন করে মুখ নেড়ে চিবোতে লাগলো যে তার মুখের ভুষি আমাদের গায়ে মাথায় কাপড়ে এসে পড়লো।

কয়েকদিন পর আবার সবাই 'মিউজিয়াম' দেখতে গেলাম। সেখান থেকেও বেশ হতাশ হয়েই ফিরে এলাম। দেখবার মত রকমারি অসংখ্য রকমের জিনিস ছিল কিন্তু যে ঘরেই যাই হিন্দুস্থানী দেহাতি গ্রামের লোক সেখানে গিয়ে ভীড় করছে, আর তাদের গায়ের গন্ধে অসম্ভব হয়েছিল কিছু দেখা। তবে পরে যখন 'ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে' পড়ি, সেসময় ভাল করে দেখতে পেয়েছিলাম, কারণ একদিন শুধু আমাদের স্কুলের মেয়েদের দেখবার জন্য আলাদা করে বিশেষ অনুমতি নেওয়া হয়েছিল।

পরেশনাথের মন্দিরেও একদিন ঘুরে এলাম, কিন্তু সেখানে গিয়ে সবচেয়ে বেশী আনন্দ হলো ট্যাঙ্কের মধ্যে লাল মাছগুলি সাঁতরে বেড়াচ্ছে দেখে ও আমরা মুড়ি ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের খাওয়ার রকম দেখে।

তবে যেটা নাকি দেখে ভাল লেগেছিল সেটা হচ্ছে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'। ঝকঝকে, তক্তকে, বাড়িটা যেমনই সুন্দর, ভেতরটাও সেরকম সাজানো আর সঙ্গে তার বাগানও অতিশয় মনোরম। আমরা যাওয়ার দিনকয়েক আগেই 'প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্' সেটা জনসাধারণের দেখবার জন্য তার দরজা উন্মোচন করেছিলেন।

কিছুদিন আরও এদিক ওদিক ঘোরার পর দিদিমা চলে গেলেন রাঁচী। ছোটমামা এসে নিয়ে গেলেন। দাদা (আমাদের খুড়তুতো ভাই) গেল সীলেটে মা-বাবার কাছে, আর স্বরূপদাদিও গেল দেশে কিছুদিনের জন্য। একই জায়গায় যাচ্ছে বলে একই দিনে একসঙ্গে দুজনে রওনা হয়ে গেল। বাবাও ঠিক করলেন আমাদের সকলকে নিয়ে মাসখানেকের জন্য পুরী বেড়িয়ে আসবেন।

অজিতবাবুকে (দিদির ভাসুর) বাবা একটা বাড়ির খোঁজ করে দেবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৯২২ সনের ২রা জানুয়ারী আমরা সবাই পুরী রওয়ানা হলাম। দিদি ও জামাইদাও (নতুন ভগ্নিপতি) আমাদের সঙ্গে গেলেন। কলকাতা থেকে এক ঠাকুর রান্নাবান্না করবার জন্য ও শিলং থেকে আনা লোক গুপীও গেল।

পুরীতে যে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল সেটা সমুদ্রের ধারেই ছিল। পুরী পৌঁছে চারিদিক দেখে আবার কেমন দিশেহারা হয়ে গেলাম। চারিদিক একেবারে বালিতে ঢাকা। মাঝে মাঝে কাঁটা ও পান্টিয়া ক্যাক্টাস্ এদিক ওদিক গজিয়ে আছে। জুতো পরে হাঁটতে অসুবিধা হয় বলে সবাই বালুর চরে শুধুপায়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র বালিতে ঝিনুক ও শামুক ছড়ানো। আমি আর পুঁটু আনন্দে তখুনি ঝিনুক কুড়োতে লেগে গেলাম।

পুরী গিয়ে সমুদ্র দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ঢেউ-এর পর ঢেউ আসছে অনবরত ডাঙার দিকে আর কাছে এসেই উঁচিয়ে উঠে বিরাট শব্দ করে জলটা আছড়ে ভেঙে পড়ছে. কি তার অদ্ভুত দৃশ্য ! দূরে লাইন ধরে চক্রবাল আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। জলের রং কখনো সবুজ, কখনো নীল, আবার কখনো ধোঁয়াটে কালো। প্রথম ঠিক বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলাম অনেক সময়ে জলের গাঢ়ত্বের জন্য নীল রং ছাড়াও আকাশে মেঘের জন্য যেমন যেমন রং বদলায়, তার ছায়া জলের উপর পড়ে বলে নানা রং-এর জল মনে হয়।

পুরী পৌঁছানোর একটু পরেই জামাইদা বললেন, 'চলো টুনু পুঁটু, আমরা সমুদ্রে চান করে আসি।' আগে তো কোনও দিনও এত জল দেখি নি, তবু মনে সাহস দেখিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে গেলাম। জামাইদার হাত ধরে জলে গিয়ে নামলাম বটে, কিন্তু প্রথমেই ঢেউ-এর বাড়ি খেয়ে ও কয়েক ঢোঁক সমুদ্রের লোনাজল গিলে সমুদ্রস্নানের আমোদ চলে গেল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম ও প্রায়ই নুলিয়ার হাত ধরে সমুদ্রে স্নান করতে যেতাম।

সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলাই সবাই মিলে খুব বেড়াতাম সমুদ্রের ধারে। খুব ভোরে উঠে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। সে কি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য ! সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখতাম, ঢেউ যখন ডাঙায় আছড়ে ভেঙে জল এসে যায়, সেই সময়ে কত রকমারি ঝিনুক, শামুক, তারা মাছ ইত্যাদি এসে পড়ছে জলের সঙ্গে। আমি আর পুঁটু দুজনে দুটো বালিশের ওয়াড় ভরে ফেললাম এই ঝিনুক ও শামুক দিয়ে।

আমাদের ওরকম ঝিনুক কুড়োতে দেখে প্রথম দিনই হঠাৎ একটি ছোট্ট মেয়ে আমাদের আশেপাশে এসে ঘুরতে লাগলো এবং সেও হাতভর্তি ঝিনুক নিয়ে এসে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ভাব করবার চেষ্টা করতে লাগলো। মেয়েটি কে, কোথায় থাকে খোঁজ করে আমরা জানতে পারলাম, যে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে, তার যে হারু বলে পাহারাদার তার মেয়ে। মেয়েটির বয়স বছর চার-পাঁচ হবে। সে অতি

শিশু থাকতে তার মা মরে যায়, তার থুড়থুড়ী বুড়ী দিদিমা হারুর সঙ্গে থেকে ছোট মেয়েটাকে দেখতো। রান্নাবান্নার কোন বালাই ছিল না। অধিকাংশ সময়েই আমাদের খাওয়াদাওয়ার পর উদ্‌বৃত্ত খাবার হারু ও তার শাশুড়ীকে দেওয়া হতো। আর আমরা যখন খেতে বসতাম, ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে একটা ছোট্ট মাটির থালায় করে একটু দূরে বসিয়ে খেতে দেওয়া হতো। আমার এখনো চোখে ভাসে সেই কুচ্‌কুচে কালো ছোট্ট মেয়েটির মুখ। টানা টানা চোখ, উঁচু নাক, খোদাই করা কোন দেবীর মূর্তির মত অপূর্ব তার চেহারা। পরনে কোন কাপড় নেই, শুধু কোমরের ঘুনসী থেকে একটা ন্যাকড়ার ফালির নেংটি। প্রথম দিনই তার ঐ অবস্থা দেখে মা পুঁটুর জাঙ্গিয়া ও ফ্রক দিলেন পরবার জন্য। জামা ও জাঙ্গিয়া যদিও তার খুব ঢলঢলে বড় হলো, কিন্তু সে ওগুলো পরে আনন্দে নাচতে লাগলো।

কিছুদিন পর মেয়েটার বুড়ী দিদিমা কি নিয়ে তার বাপ হারুর সঙ্গে ঝগড়া করে তার পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে কোথায় চলে গেল। তার কয়দিন পর একদিন হারুও হঠাৎ ঐ অসহায় ছোট্ট মেয়েটাকে ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ। সন্ধ্যেবেলা হারুকে ডেকে ডেকে না পেয়ে দেখা গেল, অঘোরে মাটিতে একটা চ্যাটাই-এর উপর শুয়ে মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। মা গুপীকে দিয়ে ঐ মেয়েটাকে কোলে করে আনিয়ে আমাদের শোবার ঘরের কোণায় একটা কম্বলের টুকরোতে জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। হারু আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো।পরে শুনলাম, হারু মাঝে মাঝে খুব মদ খেয়ে কয়েকদিনের জন্য তার ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যায়।

পুরীতে সমুদ্রের ধারে ভোরে ও বিকেলবেলায় বেড়িয়ে, সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেলে, তারপর অতি ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে নুলিয়ারা নৌকা ঠেলে জাল ফেলে ফেলে মাঝসমুদ্রে চলে যেতো এবং পরে মাছভর্তি জাল টেনে টেনে সমুদ্রের পাড়ে তুলে আনতো, এসব দেখে খুবই আমোদ বোধ করতাম। মাঝে মাঝে নুলিয়াদের মাছের জালে হাঙ্গর, করাতে মাছ ইত্যাদিও পড়তো।

সমুদ্রের ধারে বেড়ানো ছাড়া পাণ্ডার সঙ্গে জগন্নাথের মন্দির, মাসীর বাড়ি, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ইত্যাদি অন্যান্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতেও ঘুরে আসা হতো।

আমাদের বাড়িটার কাছেই একটা বড় দোতলা খালি বাড়ি ছিল। দিদি মেজদি সূর্যোদয়ের দৃশ্য রং তুলি দিয়ে আঁকবেন বলাতে, বাবা ঐ দোতলা বাড়ির পাহারাদারকে বলে দরজা খুলিয়ে বাড়ির ছাদে আঁকার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন। 'পুরীর সূর্যোদয়' নাম দিয়ে দুজনে দুটো ছবি এঁকে আনলেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর তার মা না বাবার কার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতায় ফিরে চলে গেল। দিন-পনেরো পরে দিদি ও জামাইদাও চলে গেলেন। এর মধ্যে হঠাৎ গুপীর উঠলো জ্বর। সেই জ্বর আর থামে না, উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। ডাক্তার ডাকা হোল। তিনি এসে রক্ত পরীক্ষা করে বললেন, 'টাইফয়েড্' জ্বর হয়েছে।

পুরীর বাড়িটা সমুদ্রের ধারেই ছিল। সকলের জায়গাটা খুব ভাল লেগেছিল। সেজন্য মা ও বাবা ঠিক করেছিলেন আরও মাসখানেক ওখানে থাকবেন। কিন্তু গুপী

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরে আসতে হোলো।

গুপীর উঠবার শক্তি নেই। কোনক্রমে উড়িয়া পাণ্ডা ও দু'চারজন অন্য লোকের সাহায্যে একটা চারপায়াতে শুইয়ে এনে তাকে ট্রেনে তোলা হল।

জামাইদা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, তাই আমরা কলকাতায় সকালে তাঁদের বাড়ি এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে 'মেয়ো হস্‌পিট্যাল' থেকে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এসে গুপীকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। বাবা ও জামাইদা দুজনে মিলে বিকেল হলে গুপীকে দেখে আসতেন হাসপাতালে গিয়ে। দিনকয়েক কলকাতা থাকার পর আমাদের শিলং-এ ফিরে যাবার আয়োজন চলতে লাগলো।

সেই সময়ে খবর পাওয়া গেল যে ইংলন্ডের একটা যুদ্ধের জাহাজ 'উট্‌ট্রাম' ঘাটে এসে কিছুদিনের জন্য নোঙ্গর করেছে। কেউ জাহাজের ভেতর দেখতে চাইলে বিশেষ অনুমতিও দেওয়া হতো। বাবা একখানা চিঠি লিখে জাহাজ দেখার ব্যবস্থা করে আমাদের ও দিদির জা ও ননদ এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'উট্‌ট্রাম' ঘাটে গেলেন।

জাহাজে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় ক্যাপ্টেন সবাইকে ধরে জাহাজে উঠবার সাহায্য করছিল। মা-র দিকে হাত বাড়াতে তিনি বিনা আপত্তিতে তার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে পড়লেন। এইরকম ব্যবহারে মা অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু দিদির জা ও ননদ ব্রাহ্ম হলেও সাহেবের হাত ধরে উঠতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। বাড়ি এসে তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন যে 'আঁবুইমায়ের' কি রকম সাহস ও তিনি কত আধুনিকা। আমরা আবার এইরকম তফাৎ দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে যেতাম।

আগে আমাদের 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' দেখতে যাওয়া হয়নি বলে সেটা দেখতে সকলে মিলে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে বসবার ব্যবস্থা হোল। আমরা ছোটরা ছুটোছুটি করে চারিদিকে খেলে বেড়ালাম, আর এই বিশাল ঝুরিসুদ্ধ বটগাছ দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

গুপী ধীরে ধীরে ভাল হতে লাগলো। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে দেরী আছে বলে তাকে জামাইদার জিম্মায় রেখে জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নিয়ে আমাদের নিয়ে বাবা শিলং রওয়ানা হলেন।

কলকাতা থেকে ফেরার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর শেষে স্কুল খুললো। শিলং-এ শীতের জন্য প্রায় আড়াইমাস স্কুল বন্ধ থাকতো। হেড্‌মিস্ট্রেস্‌ আগেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমরা বাৎসরিক পরীক্ষা না দিতে পারলেও আমাদের ক্লাসের রেকর্ড খুব ভাল থাকায় প্রমোশন দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

১৯২২ সনে 'মিডিল ইংলিশ' পরীক্ষা দেবো বলে পড়াশুনা করছি। এই পড়ার সঙ্গে সেলাই-এর ডিপ্লোমার পরীক্ষাও দিতে হয়। আসামে তখন সেলাই-এ ডিপ্লোমা না পেলে অন্য পড়ার পরীক্ষা পাস ধরা হতো না। এই পরীক্ষার কিছুদিন আগে সেলাই-এর ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিতে হতো। সেলাইতে খুব ভালভাবে 'অনার্সে' পাস

করলাম। কিন্তু তার কয়দিন পরই সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। 'মিড়িল ইংলিশ' পরীক্ষা আর দিতে পারলাম না। পরের বছর ১৯২৩ সনে আসামে প্রথম হয়ে পাস করলাম এবং মাসে পাঁচ টাকার বৃত্তি পেলাম।

সুষমা দেব, সুলতা চক্রবর্তী ও আমি, আমরা তিনজনে ছিলাম পরীক্ষার্থিনী। সুষমা ও সুলতা দুজনেই আমার বিশেষ প্রিয় বন্ধু ছিল। সুষমাও পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল। আমাদের মধ্যে কিন্তু কোন দিন কোন রেষারেষি ভাব ছিল না। যে কেউ প্রথম হলেই আমরা খুশী হতাম। আমাদের পরীক্ষার ফল বার হওয়ার পর সুষমার বাবা (তিনি আমাদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন) ও মা খুব ঘটা করে খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। এবং আমি প্রথম হওয়ার জন্য আমাকে একটা সুন্দর উপহারও দিয়েছিলেন। বর্তমানে যদিও চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়ে ওঠে না কিন্তু লোকপরম্পরায় সুষমা ও সুলতা দুজনেই যেমন আমার খবর করে থাকে, আমিও তাদের খোঁজখবর করি।

এর মধ্যে আরেকটা খেয়াল মাথায় চাপলো। সেটা হলো কোন্ প্রজাপতি কি রকম সোঁয়াপোকা থেকে হয় এবং কোন্ সোঁয়াপোকা কোন্ গাছের পাতা খায়, এবং কত বিভিন্ন রকমের প্রজাপতি হয়, সেসব আবিষ্কার করা। স্কুলের বিজ্ঞানের ক্লাসে চপলাদি আমাদের নানারকম ছবি দেখিয়ে প্রজাপতির জন্মের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। চপলাদি আমাদের বাড়িতেই থাকতেন কয়েক বছর ধরে। একদিন সন্ধ্যেবেলা আমায় ডেকে বললেন, টুনু, দেখবে এসো।' গিয়ে দেখি তিনি একটা কিরকম শুকনো ব্রাউন গোছের পোকার গুটির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। গুটিটি একটা ছোট ডালে আটকানো। সেটা সুতো দিয়ে দেয়ালের পেরেকে ঝুলোনো। আমি যেতেই বললেন, 'এই দেখ ! লেবু গাছ থেকে এটা তুলে এনেছিলাম। এখন এই গুটি কেটে প্রজাপতি বের হবে এখনি, পুরো সময় হয়ে গিয়েছে।'

লক্ষ্য করলাম ছোট্ট একটা গর্তমত দেখা যাচ্ছে এবং ক্রমশ সেটা বড় হতে লাগলো। আস্তে আস্তে সমস্তটা কেটে একটা কিরকম দুমড়োনো পোকা বের হলো। তারপর আস্তে আস্তে পাখা খুলতে লাগলো। ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে এটা একটা মস্ত রংবেরং-এর পাখাওয়ালা অতি সুন্দর প্রজাপতি হয়ে দাঁড়ালো। সেটা প্রায় আধঘণ্টা আন্দাজ নিঝুম হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ পাখা নাড়া দিতে দিতে অন্ধকারে উড়ে চলে গেল। প্রজাপতিটার ডানাদুটো ঠিক ময়ূরের পেখমের মত দেখতে ছিল এবং রংও ঐ একই রকমের। চপলাদি বললেন, ইংরেজিতেও এই প্রজাপতিকে 'Peacock Butterfly' বলে।

তারপর থেকে বাগানে ঘুরে ঘুরে কোথায় সোঁয়াপোকা আছে দেখতে লাগলাম। অনেক সময় যে গাছে পোকা পেতাম সেই গাছের পাতাসুদ্ধু পোকাকে একটা ছোট কাঠের বাক্সে পুরে রাখতাম। সেই পোকা পাতা খেয়ে থাকতে থাকতে গুটি বাঁধতো, তারপর আবার সময় হলে কিছুদিন পর প্রজাপতি বের হলে পরই উড়িয়ে দিতাম। এইরকম করে করে বহু প্রজাপতির উৎপত্তি কি ভাবে এবং কোন্ গাছ থেকে হয়

বের করে ফেললাম। বাঁধাকপির পাতা খায় এরকম সোঁয়াপোকা থেকে সাদা রং-এর ডানার কালো কালো চোখওয়ালা প্রজাপতি হয়, 'হাইড্রেঞ্জিয়া' ফুলে হতো সবুজ রং-এর একটুকরো দড়ির মত বেশ মোটা বড় পোকা। তার গুটি থেকে যে প্রজাপতি বেরোয় সেটা আবার 'মথ্' জাতীয় রাতের প্রজাপতি হয়। এগুলো দিনের বেলায় অন্ধকার জায়গাতে নিঝুম হয়ে বসে থাকে এবং রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, আলো দেখলে তার ওপর পড়বার চেষ্টা করে। 'হনিসাক্ল্' ফুলগাছে সাংঘাতিক বিষাক্ত রোঁয়াযুক্ত পোকা হয়, সেও 'মথে'ই পরিণত হয়। প্রতিটা পোকাই যে গাছের পাতা খেতো সেই গাছের ডাল কিম্বা পাতার সঙ্গে একেবারে মিশে বসে থাকতো।

কোন কোন সময় পড়াশুনা বাদ দিয়ে ঐ নিয়ে মশগুল হয়ে যেতাম, তাইতে বাড়িতে এবং স্কুলে সকলের কাছেই কিছু বকুনি খেতো হতো। কেউ বুঝতো না, ঐ বিষয়ে জানব্যর একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার রয়েছে।

পড়াশুনা বাদ দিয়ে সর্বক্ষণ ঐ প্রজাপতির উৎপত্তি নিয়ে মশগুল থাকার জন্য বকুনি খেলেও ছেলেবেলা থেকে মা-বাবা আমাদের প্রকৃতির দৃশ্য ও পরিচয় দেখাবার জন্য গভীর চেষ্টা করতেন। কোনসময় বৃষ্টির পর আকাশে রামধনু দেখা গেলে বা সূর্যাস্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘের ওপর আকাশে লাল, সোনালি রং-এর খেলা যেরকম একটা রং-তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মত দেখাতো, সেই দৃশ্য কিম্বা পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাতে আকাশে ঝক্‌ঝকে তারা ও ছায়াপথ ইত্যাদি দেখবার ও চিনবার জন্য যেমন তাঁরা ডাকাডাকি করতেন, তেমনি ভোরের গভীর নিদ্রা ভাঙিয়েও বাগানে বা বাড়ির উঠোনে আসা দয়েল, খঞ্জন, বুলবুলি ইত্যাদি পাখী যা সচরাচর দেখা যেতো না, সেসব দেখাতে বা চিনিয়ে দিতে কোন ত্রুটি করতেন না। অনেক সময় শীতকালে খুব পরিস্কার দিনে ভোরে বহুদূরে বরফে ঢাকা হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ সোনালী রং-এর সূর্যের রশ্মি পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে দেখা যেতো আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে, দেখামাত্র বাবা সবাইকে ডেকে দেখাতেন।

১৯২১ সনে দিদির বিয়ের সময় কলকাতা এসে 'ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল' দেখে বাবার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। আমি 'মিডল ইংলিশ' পরীক্ষা পাস করতেই বাবা বললেন, 'একা একা এখানে 'ওয়েলস্ মিশন' স্কুলে না গিয়ে কলকাতায় 'ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে' ভর্তি করে দিই। যদিও বোর্ডিং-এ থাকবি, তবু তুই আর খুকী (দিদি) দু'বোনে কলকাতাতেই থাকবি, এতে কেউই একা বোধ করবি না।'

সব লেখাপড়া করে 'ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে' ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাবার সঙ্গে ১৯২৩ সনে বড়দিনের সময় কলকাতায় এলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ছাত্রীজীবন

বাবা আমাকে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দেবেন বলে ১৯২৩ সনের শেষে কলকাতা যাওয়া ঠিক করলেন। মেজদি ও পুঁটুকে নিয়ে মা কয়দিন শিলচরে বড়মামা ও দিদিমার ওখানে ঘুরে আসবেন বলে ঠিক হলো এবং সেই অনুযায়ী বড়মামাকে চিঠি লেখা হলো—তিনি যেন গৌহাটি এসে মা-দের নিয়ে যান।

আমরা সবাই একই দিনে গৌহাটি গেলাম। পৌঁছে দেখি বড়মামাও আগের দিন এসে গেছেন। মার এক পিসিমা গৌহাটি থাকতেন। তাঁর বাড়িতেই সবাই উঠেছি। পরদিন বেলা এগারটা নাগাদ আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেলাম। আর ঠিক হলো মা বড়মামার সঙ্গে মেজদি ও পুঁটুকে নিয়ে সন্ধ্যের গাড়িতে শিলচর রওয়ানা হয়ে যাবেন।

এবারেও বাবা আমাদের দুজনের জন্য ফার্স্ট-ক্লাসের একটা ছোট কামরা রিজার্ভ করিয়ে রেখেছিলেন। আমরা পরদিন ভোরে যখন সান্তাহারে অন্য গাড়িতে উঠবো, তখন আমাদের সঙ্গের টিফিন-বাস্কেট ও একটা ঝুড়িতে কমলালেবু ছিল, সেটা রেখে অন্যান্য মালপত্র গার্ড-ভ্যান্-এ বাবা যখন দিতে গিয়েছেন, তখন কুলীর মাথায় কমলালেবুর ঝুড়ি দেখে গার্ড বাবাকে চোখ পাকিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো— 'ঐ ঝুড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তুমি অন্য যাত্রীর অসুবিধে করবে।' বাবাও তেমনি চোখ রাঙা করে তাকে বলে উঠলেন—'What do you mean ? Other passengers will be disturbed ? Do you know that I have got my own Reserved Compartment ?'

সেই শুনে গোঁফওয়ালা গার্ড একটু থতমত খেয়ে গেল।

আমরা নিজেদের কামরায় এসে উঠে বসবার পর বাবা বললেন যে ফলের ঝুড়ি দেখলেই গার্ডদের খুব লোভ পড়ে। ওদের জিম্মা করে দিলেই তারা সুযোগ পেয়ে বেশ কিছু ফল বের করে নিয়ে খেয়ে ফেলে।

এ নিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটা গল্প আছে। এক ঝুড়ি আম আসছিল গার্ড-মশায়ের নিজের বাড়ির জন্য, কিন্তু অন্যের ভেবে অধিকাংশ খেয়ে ফেলেছিল।

আমরা কলকাতায় এসে দিদির শ্বশুরবাড়িতেই উঠলাম। দিদির কোলে তখন বছরখানেকের ছেলে। বহুদিন পর তাকে দেখতে পেয়ে খুবই আনন্দ হলো।

বড়দিনের সময় কলকাতা এসেছি। সে সময় কলকাতার চারদিকে অর্থাৎ চৌরঙ্গী, ইডেন গার্ডেন, গঙ্গার উপর জাহাজগুলি সব আলোকমালায় সজ্জিত। তখন ইংরেজ রাজত্ব। খ্রীসমাসের জন্য তারা একেবারে নানারকম স্ফূর্তি, আমোদ-আহ্লাদে বিভোর।

জার্মানী থেকে জার্মান সার্কাস হেগেনবেক কলকাতার ময়দানে প্রকাণ্ড তাঁবু খাটিয়ে রোজ সার্কাস দেখাচ্ছে। নানারকম লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে সব রঙীন বালব্‌ দিয়ে আলোর মালার মত করে চারদিক আলোকিত। বাবা আমাকে ও দিদির শ্বশুরবাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে সার্কাস দেখতে গেলেন। পরে আরও বহুবার সার্কাস দেখেছি, কিন্তু এই হেগেনবেক সার্কাসের মত এমন সুন্দর সার্কাস আর কখনই দেখি নি।

॥ ১ ॥
ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল

উনিশ-শো চব্বিশ সনের ২রা জানুয়ারী সকাল দশটার সময় বাবার সঙ্গে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে গেলাম। তখন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। আমরা তাঁকে চামেলীদি বলে ডাকতাম। তিনি রেজিস্ট্রীতে নাম ইত্যাদি সব লিখে ভর্তি করে নিলেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে কিছু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে ট্রাঙ্ক, বিছানা ইত্যাদি সব নিয়ে বাবা স্কুলের বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

বোর্ডিং-এ গিয়েই আমার অনেকদিনের শিলং-এরই চেনা একটি অসমীয়া মেয়েকে (নাম—ইন্দিরা সেনাপতি) দেখতে পেলাম। আমরা ছেলেবেলা থেকে বরাবর একসঙ্গেই পড়ে এসেছি। বছর দুই ধরে সে কলকাতায় পড়তে চলে আসে। আমায় দেখতে পেয়ে তক্ষুনি সে এগিয়ে এসে কথাবার্তা কয়ে সব চেনা-পরিচয় করিয়ে দিল। ইন্দিরা থাকাতে তখনকার মত বাড়ির সকলকে ছেড়ে আসার কষ্ট বোধ করি নি। ক্রমশঃ দিন যত যেতে লাগলো মা, মেজদি, পুঁটু ও বাবা সকলের জন্য মন খুব খারাপ লাগতো। তখন ছিল শীতকাল। রোজ রাতে মশারীর ভিতর লেপের নীচে শুয়ে চুপটি করে কাঁদতাম ও শুক্রবার কবে আসবে, সপ্তাহের শেষে কতক্ষণে দিদির কাছে যাবো তাই ভাবতাম।

তবে ইস্কুলে যেতে বেশ ভাল লাগতো। প্রথম দিন স্কুলের ক্লাসে যাবার আগে যখন মেরী কার্পেন্টার হলে আমরা মেয়েরা সকলে মিলে ক্লাস অনুযায়ী সারি দিয়ে দাঁড়ালাম এবং একটি মেয়ে গান ধরলো—'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে', ও সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে একসঙ্গে গানটা গাইল, তারপর একজন শিক্ষয়িত্রী উপাসনা করলেন—এতে খুবই অভিভূত হয়ে পড়লাম। এখনও যখন গ্রামোফোনে কলিম শরাফীর গাওয়া গানটা শুনি, তখুনি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের সেই প্রথম দিনটার কথা মনে ভেসে ওঠে।

তারপর পড়ার পালা শুরু হলো। একে একে টিচাররা ক্লাসে এসে নতুন আগন্তুক মেয়েদের নামধাম, কোথায় থাকি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে পড়ানো আরম্ভ করলেন। তাঁদের সেই পড়ানোর ভঙ্গীও খুব ভাল লাগলো।

দিদির বাড়ি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের কাছেই বৃন্দাবন মল্লিক লেনে ছিল। সপ্তাহের শেষে শনি-রবি কাটাতে যখন দিদির কাছে যেতাম, ও বাড়ির ছাদে উঠে উঠে দূরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের 'আমস্ হাউস্'-এর একটা অংশ যা দেখা যেতো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাতে তামাসা দেখতাম। বুড়ো বুড়ো সাহেবরা, তাদের পোশাকপরিচ্ছদ দেখলে খুবই গরীব

বোঝা যেতো, কেউ বা ঝাঁটা নিয়ে উঠোম ঝাঁট দিত, কেউ বা হুইল ব্যারো নিয়ে গাছের তলায় শুকনো পাতা সব কুড়তো। আবার কেউ কেউ গাছের তলায় বেঞ্চিতে শীতের রোদ্দুরে এসে আরাম করতো। পরে সেটা উঠে গিয়ে পুলিসের থানা হয়।

ঐ আম্‌স্‌ হাউসের সমস্ত কম্পাউন্ড বড় বড় দেবদারু গাছে ভরা ছিল। ঐ বড় বড় লম্বা লম্বা গাছ দেখতে যেমনি ভাল লাগতো, তেমনি মজা ল্যাগতো বড় বড় বাদুড় গাছগুলি ভরে ঝুলে থাকতো দেখে। গাছগুলিকে বাংলাতে দেবদারু বললেও, পরে যখন কলেজে গিয়ে বোটানী পড়তে আরম্ভ করলাম তখন জানলাম, ঐ গাছকে বলে 'পলিয়ালথিয়া লঙ্গিফোলিয়া'। আসল দেবদারু গাছ হিমালয়েই একমাত্র দেখা যায়। অন্যত্র ঐ গাছ জন্মায় না।

ইংরেজীর ক্লাসে সুমতিদি বলে একজন টিচার যেদিন Wordsworth-এর 'Daffodil' কবিতাটি বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়াতে লাগলেন, তখন মনে হয়েছে যে চোখের সামনে হলদে রংএর মৃদু গন্ধযুক্ত গোছা গোছা ফুল, হাওয়াতে মাথা এপাশে ওপাশে নড়ছে, আর যেন একটা ফুলের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বসন্তের প্রাক্কালে সেই একই দৃশ্য ও সৌন্দর্য প্রায় পঁয়ষট্টি বছর পরেও যখন বিলেতে অক্সফোর্ডের বাড়ির বাগানে দেখতে পাই, মন তখন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঐ দৃশ্য দেখলেই সুমতিদির সেই মুখখানা ও পড়ানোর ভঙ্গী চোখের সামনে ছবির মত মনে হয়।

এর পর হেরিকের লেখা কবিতাটিও পড়েছিলাম। ১৯৭১ সনের প্রথম দিকে অক্সফোর্ডের কাছে হুইট্‌লী বলে একটা গ্রামে থাকার সময়ে চোখে ড্যাফোডিল ফুল দেখে একটা সমস্যার উৎপত্তি হলো। এ-বিষয়ে আমি স্বর্গগত পরিমল গোস্বামীকে ১৯৭১ সনের ২৭শে এপ্রিল একটা চিঠিতে ড্যাফোডিল সম্বন্ধে সেই সমস্যার উল্লেখ করে চিঠি লিখি। পরিমলবাবু ওনার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাইতে বরাবরই আমাদের মধ্যে চিঠির আদানপ্রদান ছিল। আমি তাঁকে ড্যাফোডিল সম্বন্ধে হেরিকের উক্তি নিয়ে লিখলাম—

'এখন ক'দিন ধরে একটা প্রশ্ন মনে খুব তোলপাড় করছে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি বললেন হেরিকের ড্যাফোডিল পড়েননি। সেদিন এক ইংরেজী সাহিত্যের লেকচারারকে জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাওয়া যায়নি। হেরিকের ড্যাফোডিল কবিতায় পড়েছি—'Fair daffodils, we weep to see, you haste away so soon.' কিন্তু ড্যাফোডিল ত দু চার দিনে শুকোয় না দেখছি। আমাদের বাগানে যে ড্যাফোডিল ফুটেছে ও ফুটেছিল, এক মাসের উপর গাছেই তাজা আছে। আর ফুলদানিতে ঘরে সাজালে দিন-দশ-বারো তো থাকেই।...আবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর ড্যাফোডিল কবিতাটিও যখনই মাঠে-ঘাটে তাকানো যায় তখনই মনে পড়ে।'

এর উত্তরে তিনি লিখেছিলেন—

'আমার নিজের ধারণা; "You haste away so soon"-এর "so soon" কথাটি যে-কোন প্রিয় ফুল সম্বন্ধেই বলা যায়, তার আয়ু এক দিন হোক বা এক মাস হোক। মানুষ সম্বন্ধে যখন কথা আছে life is short—১০০ বছর পরমায়ু হওয়া সত্ত্বেও,

তখন এক মাসের আয়ুকে স্বল্পায়ু বলায় বাধা কি?'

এর ছয় মাস পর আমরা আমেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। ওঁর সেখানে চারটা বক্তৃতা ছিল। একদিন তাঁদের হাই টেবিলে খাবার সময় কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজীর প্রফেসারকে প্রশ্ন করেও কোন হদিস হলো না।

তবে বছর দুই পরে একটি নার্সারীর ক্যাটালগ্ দেখতে পেয়ে অবশ্য আমি নিজেই হেরিকের ড্যাফোডিল কবিতার সম্বন্ধে আমার সমস্যার সমাধান করে ফেললাম। একটি নার্সারীর ক্যাটালগে একরকম 'ওয়াইল্ড' ড্যাফোডিলে'র বালবের বিজ্ঞাপন ছিল। তাতে লেখা ছিল—এই ফুলগুলি সাইজে ছোট হয় এবং সকালে ফোটে ও সন্ধ্যাবেলা শুকিয়ে যায়। কবি হেরিকও নিশ্চয়ই এই ড্যাফোডিল ফুলেরই উল্লেখ করে কবিতাটি লিখেছিলেন।

ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে অন্যান্য ক্লাসগুলিও বেশ ভালভাবে কাটতে আরম্ভ হলো। কিরণমাসিমা পড়াতেন বাংলা কবিতা। কিরণমাসিমা চিত্রপরিচালক ভানু ব্যানার্জীর মা ছিলেন এবং তাঁর মেয়ে ঝুনুদি অসাধারণ সুন্দর গান গাইতেন। বিখ্যাত প্রফেসার শ্রীযুক্ত নির্মল সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। প্রথম দিনই কিরণমাসিমা তাঁর বাংলা কবিতার ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' খুলে 'কাশীনাথ' কবিতা পড়াতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ঐ সুন্দর গলায় কবিতাটি পড়ার ও বোঝানোর ভঙ্গীতে তিনি এক অপূর্ব দৃশ্য মনের মধ্যে সারাজন্মের জন্য জলছবির ছাপের মত ছাপ বসিয়ে দিলেন। বৃদ্ধ 'বরজলাল' গাইছে, শ্রোতারা কেউ বা হাই তুলছে, কেউ কথা কইছে, তারপর বুড়ো বরজলালের কেঁদে ফেলার ব্যাপার এর যে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখের সামনে ধরে দেওয়া, সেটা বহু শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরই দ্বারা হয় না।

কিরণমাসিমা বাংলা কবিতা পড়ানো ছাড়া আমাদের সেলাই ও উলবোনাও শেখাতেন। আমাদের সেলাইয়ের ক্লাসে বোনা শেখাতে গিয়ে যখন দেখলেন আমি বেশ ভাল বুনতে পারি, তখন তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'ওমা! তুমি তো খুব সুন্দর বুনতে পার, তোমায় মোজা বোনার জন্য একটা সুন্দর প্যাটার্ন দেব।' এই বলে একটা সুন্দর প্যাটার্ন দিয়ে ছোটদের মোজা বুনতে দিলেন।

আট বছর বয়স থেকে বোনা শিখে ফেলেছি, তারপর ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে আসবার আগেই আসামের ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড নিড্ল ডিপ্লোমা সেলাইয়ের জন্য প্রথম হয়ে অনার্সে পাস করে গিয়েছি, সুতরাং ফোর্থ ক্লাসের সেলাই আমার কাছে কিছুই নয়।

আমাকে প্যাটার্ন দিয়ে মোজা বুনতে দেখে আমার সহপাঠী কয়েকজন বলে উঠলো, 'ওকে একা একা প্যাটার্ন দিচ্ছেন কেন? আমাদেরও প্যাটার্ন দিন।' তাই শুনে কিরণমাসিমা বললেন, 'বেশ তো, তোমরাও ওর মত বোনো, তোমাদেরও প্যাটার্ন দিচ্ছি। তখন কি করে করবো বলে আমায় জ্বালাতন কোরো না।'

এরকম ব্যাপার ড্রইং-মাস্টারের বেলাতেও দাঁড়াতো। শিলং-এ ছেলেবেলা থেকে আমাদের ড্রইং পেন্টিং শিখবার জন্য একজন ড্রইং-মাস্টার রেখে দেওয়া হয়েছিল।

স্কুলেও ড্রইংএর ক্লাস হতো। তবে এই ড্রইং-মাস্টারটি প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার দুপুরের পর এসে ড্রইং আঁকা শেখাতেন। এছাড়া 'Vere Foster'এর ড্রইং-এর পদ্ধতির নানারকম বইও বাবা কিনে দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে আসবার পর ড্রইং বেশ ভাল করতে পারি দেখে ড্রইং-মাস্টারটিও আমার ওপর খুব খুশী ছিলেন এবং ছবি আঁকার নানারকম টেকনিক শেখাতেন ও উৎসাহ দিতেন।

ছেলেবেলায় এমনি নানারকম দুষ্টুমি করলেও কখনও মা-দিদিদের অবাধ্য হইনি। সেজন্য বোর্ডিং-এ এসেও টিচার ও মেট্রনদের সকলের খুব বাধ্য ছিলাম। এতে সবাই বেশ স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ভর্তি হওয়ার কয়েক মাস পরেই চামেলিদি প্রিন্সিপ্যালের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় সুনীতি দাশগুপ্ত বলে আরেকজন এলেন। তিনিও বছরখানেক পরে এই স্কুল ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় মিস্ সরকার হলেন আমাদের প্রিন্সিপ্যাল। সেই সময়ে চারুলতা সেন ছিলেন বহুকালের পুরনো টিচার। তিনি আমাদের ভূগোল পড়াতেন। আমি আসাম মিডিল ইংলিশ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আসাম গবর্ণমেন্ট থেকে একটা বৃত্তি পেয়েছিলাম। চারুদির ওপর ভার ছিল যেসব মেয়েরা বৃত্তি পেয়ে এসেছে, সেই টাকা তাঁর হাতে পৌঁছলে পর তিনি যার বৃত্তি তাকে ডেকে একটা রেজেস্ট্রী বইএ সেই মেয়ের সই নিয়ে সেই টাকাটা দেওয়ার—এই সূত্রে চারুদির সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। কালুদিও (তাঁর ভাল নাম ছিল সরিৎ ঘোষ) আমাদের অঙ্কের টিচার ছিলেন। তিনি আবার আমাদের মাসতুতো বোন স্নেহদির ননদ। বোর্ডিং-এ আমার দেখাশোনা করবার ভার বাবা তাঁর ওপরেই দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি নিজেও একজন সম্পর্কিত আপনার জন আছেন বলে খুবই আশ্বস্ত বোধ করতাম। তিনি আমাকে তাঁর ছোটবোনের মত স্নেহ করতেন।

সংস্কৃত পড়াতেন একজন পণ্ডিতমশাই। তাঁর কাণ্ড দেখে আমরা হাসতাম। রোজই ক্লাসে এসে বলতেন, 'সুরূপা, পড়া বলো?' সুরূপা আমার সঙ্গে পড়তো, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে। পণ্ডিতমশাইকে মেয়েরা যখন চেঁচামেচি করে জিজ্ঞেস করতো যে 'রোজ শুধু সুরূপাকে পড়া জিজ্ঞেস করেন, আর অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেন না'—তার উত্তরে বলতেন, আরে হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হলো কিনা বুঝতে হলে যেমন একটা চাল টিপলেই বোঝা যায়, সেরকম একজনকেই পড়া জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় অন্যরা পড়ছে কিনা।

আমি যখন ব্রাহ্ম গার্লস-এ ভর্তি হলাম তখন বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন ললিতা বোস। ইনি বছরখানেকের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়ার পর এলেন উষালতিকা হালদার। উষাদি আসার পর আমাদের বোর্ডিং-এর কতকগুলি ব্যবস্থা বদলে দিলেন। আমাদের তিনটে বড় বড় খাবার ঘর ছিল। মেঝেতে সারি দিয়ে পিঁড়ি পেতে আমরা খেতাম। উষাদি এসে টেবিল ও বেঞ্চি করিয়ে দিলেন খাবার ঘরের জন্য। এ ছাড়া আমাদের যার যার ট্রাঙ্ক বা সুটকেসে ড্রেসিংরুমে কাপড়চোপড় থাকতো, সেই জায়গায়

ওয়ারড্রোব তৈরী হয়ে এলো। আমাদের যার যার তাক দেওয়া হলো কাপড় রাখবার জন্য এবং ট্রাঙ্ক, বাক্স(খালি) একটা আলাদা বক্সরুমে রেখে দেওয়া হতো। বাড়ি যাবার সময় যার যার বাক্স বের করে দেওয়া হতো কাপড় গুছিয়ে নেবার জন্য।

॥ ২ ॥
বোর্ডিং ও স্কুল : নূতন অভিজ্ঞতা

স্কুলের ভিতরে বোর্ডিংএর বাড়ি ছাড়া অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেলার মাঠ ও বাগান ইত্যাদি ছিল, তাতে অনেকগুলি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পেয়ারা গাছ ছিল। আমার ফলের ওপর লোভ বরাবরের। পেয়ারা পাকবার পর সুবিধে পেলেই গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়তাম। একটা করমচা ফলের গাছও ছিল। আগে কখনও করমচা দেখিনি। করমচা পাকলেও কোঁচড় ভর্তি করে পেড়ে নিয়ে রান্নাঘরের মাসীমাকে(২য় মেট্রন) দিতাম। তাই দিয়ে বোর্ডিংএর সবার জন্য চাটনী রান্না হতো।

একদিন রান্নাঘরের মাসীমাকে বাগান থেকে দুটো-তিনটে লেবু পেড়ে নিয়ে গিয়ে দিয়েছি, পরে তিনি বললেন, 'অমিয় ! তুমি কি সুপ্রভাদিকে বলে লেবু পেড়েছ ?' (ইনি সব সময় অমিয়া না বলে আমায় অমিয় বলে ডাকতেন) আমি বললাম, 'না তো !' তখন তিনি আমায় বোঝালেন যে মেয়েদের গাছে হাত দেওয়া বারণ। আর বাগান দেখাশোনা করবার ভার সুপ্রভাদির ওপর। তারপর আমি নিজেই সুপ্রভাদিকে একদিন বললাম যে আমি এরকম লেবু পেড়েছি ও গাছ থেকে ফল পাড়তে খুব ভালবাসি। তার উত্তরে তিনি খুশী হয়েই বললেন, 'বেশ, বেশ, এর পর কোন ফল পাড়বার মত হলেই আমি তোমায় ডেকে পাঠাবো।' তারপর প্রায়ই আমরা দুজনে বাগানে ঘুরতাম। আমার কিছু বাগানের জ্ঞান আছে দেখে খুশীও হতেন।

বোর্ডিংএ আমাদের শোবার ডরমিটারি ছিল মেরী কার্পেন্টার হলের ওপরে। সমস্ত জানলা দরজা খোলাই থাকতো। শীত কমে একটু গরমভাব শুরু হয়েছে। রোজ রাতে একটা ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ শুনতে পেতাম। স্কুলের লাগাই লেডিস পার্ক ছিল, তার দক্ষিণদিকে একটা ধোপাদের বস্তি ছিল। আওয়াজটা সেদিক থেকে আসতো। একদিন রাতে ঐরকম ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ হতেই তাড়াতাড়ি আমি উঠে বারান্দায় গিয়ে দেখছি কোথা থেকে ঐ শব্দটা আসছে ? বারান্দার ধারে ম্যাট্রিক ক্লাসের মেয়েদের সারি দিয়ে খাট ছিল। আমায় বারান্দায় যেতে দেখে একজন ম্যাট্রিক ক্লাসের মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখছিস রে ?' আমার ধারণা জন্মেছিল যে, বলদে কলুর ঘানি ঘুরে ঘুরে টেনে নিয়ে তেল তৈরী হচ্ছে সেই দৃশ্য আমি দেখতে পাবো।

আমি সেই মেয়েটিকে বললাম, 'এখানে কলুর বাড়ি কোথায় ? রোজ ক্যাঁচ-কোঁচ করে কলুর ঘানির আওয়াজ হয়।' সে তো হেসেই গড়াগড়ি। বলল, 'দূর বোকা ! ওটা তো ধোপাদের বস্তিতে গাধা ডাকছে, তারই আওয়াজ আসছে।' আমি তো আগে শিলংএ কখনো গাধা দেখিওনি, তার ডাক কেমন হয় তাও শুনিনি। বরঞ্চ

শিলংএ মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলে পড়বার সময়ে জেলখানা কাছেই ছিল, সেখানে কয়েদীরা তেলের ঘানি টানতো কঁ্যাচ-কোঁচ শব্দে, তারই আওয়াজে অভ্যস্ত ছিলাম।

এরপর আরেকটি বিষয়ে জ্ঞান হলো। শিলংএ মশা নেই, আর কলকাতায় শীতকালে বেজায় মশা। মশারি টাঙিয়ে শুতে হয়। শীতকালের পর দক্ষিণে বসন্তের হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু হাওয়ায় মশা যে উড়ে যায় আমার তার ধারণা ছিল না। আমার পাশে যে মেয়েটি শুতো সে রোজ সন্ধ্যায় মশারি টাঙাতে বারণ করতো। 'তুই মশারি টাঙাস নে, এখন মশা নেই। তুই মশারি টাঙালে আমায়ও দুই একটা মশা যা থাকে কামড়ায়।' আমি তার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। একবার শুক্রবার বিকেলে সপ্তাহের শেষ কাটাবার জন্য দিদির বাড়ি গিয়েছি, দিদি দেখলাম মশারি ব্যবহার করছেন না। দিদিকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'এখন মশা নেই। সব ঐ দক্ষিণে হাওয়াতে উড়িয়ে নিয়ে যায়।' আমি সোমবারে ফিরে এসে আর মশারি টাঙালাম না। আমার পাশের খাটের সেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, 'আজ মশারি টাঙালি না?' আমি বললাম, 'না। দিদি বলেছেন এখন মশা নেই।' সে তখন বলে উঠলো, 'হুঁঃ, দিদি তোর গুরুঠাকুর!' তার এই উক্তিতে একটু হকচকিয়ে গেলেও মনে মনে স্বীকার পেলাম দোষটা আমারই—প্রথমেই তার কথা অবহেলা করার জন্য।

তবে বোর্ডিংএ এমনিতে ছোট বড় উপরের ক্লাস থেকে নীচু ক্লাসের মেয়েদের সকলের সঙ্গেই সবার হৃদ্যতা ছিল। সকলেই একই পরিবারভুক্ত মনে করতো একজন আর একজনকে। উপরের ক্লাসের বড় মেয়েরা নীচের ক্লাসের মেয়েদের খুবই স্নেহের চোখে দেখতো। বোর্ডিংএ সপ্তাহে একদিন করে একরকমের কাজের পালা পড়তো এক একজনের। ম্যাট্রিক ক্লাসের থেকে আরম্ভ করে একেবারে নীচু ক্লাস পর্যন্ত এক দলে দশজন করে। বিশেষ করে আমাদের দুটি বেলা পরিবেশনের পালা পড়তো। সব মেয়েদের খাওয়া হয়ে গেলে এই দশজন পরিবেশনকারী মেয়েদের মাসীমা নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। স্কুলের সময়ের আগেই সব খাওয়া শেষ করে ফেলতে হতো। সব কাজ একেবারে ঘড়ি ধরে করতে হতো। ভোর ছয়টায় ঘন্টা বাজা মাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে বিছানা ঠিক করে রেখে নীচে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে, আবার সাড়ে ছয়টায় উপাসনার ঘরে যেতে হতো, তারপর সাতটায় সকালের চা ও জলখাবারের পালা। এরপর সবাই বইপত্র নিয়ে স্টাডিরুমে গিয়ে পড়াশুনা অর্থাৎ স্কুলের পড়া তৈরী, নয়টা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে পনেরো মিনিট পর পর একটা করে ঢং করে ঘন্টা বাজতো, আর দশজন করে মেয়ের পনেরো মিনিটে স্নান করে নিতে হতো। আমাদের দশটা স্নানের ঘর ছিল। দশটার ঘন্টা পড়তেই সকলের স্কুলে যেতে হতো। প্রথম মেরী কার্পেন্টার হলে গান, উপাসনা ইত্যাদি, তারপর স্কুল বিল্ডিং-এ ক্লাস শুরু হতো। দুপুরে আধঘন্টার ছুটিতে বোর্ডিংএ এসে টিফিন খেয়ে আবার স্কুলে ক্লাস হতো বিকেল চারটা পর্যন্ত। স্কুল থেকে ফিরে এসে বিছানা ইত্যাদি সন্ধ্যের জন্য করে, যার যার সকালে ধোওয়া কাপড় ছাদ থেকে এনে হাত ধুয়ে তৈরী হতে হতো। বিকেল

পাঁচটায় আবার ঘন্টা বাজতো রাতের পুরো খাবার খাওয়ার জন্য। তারপর বেলা সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত মাঠে খেলাধূলা। সাড়ে ছয়টায় আবার উপাসনা এবং পরে সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত স্টাডিরুমে গিয়ে ক্লাসের পড়া তৈরী করা। স্কুল বিল্ডিংএর একতলার দুখানা ঘর যাতে দিনে নীচু ক্লাসের মেয়েদের পড়ানো হতো, সেই দুটো ঘর বোর্ডিংএর মেয়েদের জন্য সকাল, সন্ধ্যা স্টাডিরুম হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

বোর্ডিংএর বাড়ি থেকে আমাদের একটা উঠোনমত পার হয়ে আসতে হতো। ১৯২৬ সনে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হওয়ার কয়দিন পরই সেই সময়ে আমি ঐ স্কুল ছেড়ে আবার শিলংএ পড়তে চলে এসেছি। তখন সমস্ত বোর্ডিংএর বাড়ি ভেঙেচুরে আবার অন্যরকমের তৈরী হয়।

স্টাডিরুমে নিজেদের পড়া ছাড়া কারও অন্য কিছু বই পড়া বা অন্য কাজ কিছুই করবার নিয়ম ছিল না। এমন কি কেউ কারো সঙ্গে কথা বলাও বারণ ছিল। একজন টিচারের ওপর সব তত্ত্বাবধানের ভার থাকতো। মেয়েরা কেউ দুষ্টুমি করলে কড়া শাস্তি পেতে হতো। মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন মেয়ে সরুগলায় শুরু করে দিত গান গাইতে—'সুরে সুরে সুর মেলাতে...' আর যাবে কোথায়, অমনি ঘরসুদ্ধু মেয়ে কোরাসে জোরে জোরে গান আরম্ভ করে দিত। এর মধ্যে বিশেষ করে একেবারে গলা ছেড়ে 'চন্দ্রাবতী' (আমার সঙ্গে পড়তো, পরে তার বিষয়ে বলছি) গান গাইতে আরম্ভ করে দিতো। এই জন্য যে টিচার সেদিনের ডিউটিতে থাকতেন তিনি ঘরসুদ্ধু ছোট বড় সব মেয়েকে শাস্তি দিতেন। পড়াশুনা কাজকর্ম সব বন্ধ রেখে ৫০০ লাইন টাস্ক লিখে তবে নিস্তার।

হিতোপদেশের গল্প বক পায়রার জালে পড়ার মত আমাদের অনেককেই বিনাদোষে এই শাস্তি বহন করতে হতো।

এরপর সামান্য জলখাবারের পালা শেষ করে দশটার ঘন্টা বাজলে সবাই বেড্রুমে গিয়ে ঘুমোবার যোগাড়। এই রাত দশটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত একজনের সঙ্গে আরেকজনের কথা বলার নিয়ম ছিল না। আমরা অবশ্য চুপিচুপি ফিসফাস করে অল্পবিস্তর কথা কখনো কখনো চালিয়ে যেতাম কিন্তু ধরা পড়লেই মেট্রনের কাছে বকুনি খেতে হতো এবং শাস্তিস্বরূপ একেবারে ছোট মেয়েদের বেড্রুমে মেট্রনের পাশের ঘরে গিয়ে শুতে হতো। খুব বেশী কড়া নিয়ম ছিল। কিন্তু এতে কেউই কোন দুঃখ বোধ করতো না।

আরেকটা কাজ পড়তো খাবার পরিবেশনের মত। সেটা ছিল প্রতি শনিবার ধোপানী সকলের কাপড় ধুয়ে এনে মেট্রনকে গুনে দিয়ে গেলে একদল ছোট বড় মিশিয়ে মেয়েদের কাপড়ের নম্বর দেখে, সেই অনুযায়ী স্তূপ করে বেছে বেছে কাপড় রাখতে হতো। বোর্ডিংএ ঢুকেই মেট্রনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ামাত্র তিনি কার কত নম্বর জানিয়ে দিতেন এবং যার যার নম্বর প্রত্যেক জামা, কাপড়ের কোণে রঙীন সূতো দিয়ে সেলাই করে রাখতে হতো, কার কাপড় সেটা চিনবার জন্য। কাপড় বাছা হয়ে গেলে ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে কাপড় নিয়ে যাবার জন্য জানিয়ে দেওয়া হতো। শনিবার ছুটির

দিন। বোর্ডিং-এর অনেক মেয়েই দুদিনের জন্য কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি চলে যেতো, যারা অনুপস্থিত থাকতো মেট্রন তাঁর নিজের জিম্মায় কাপড়গুলি তাঁর ঘরে রেখে দিতেন। এসব কাজকর্ম যা করতে হতো তা ভাল সুনিপুণভাবে করতে পারতাম দেখে মেট্রন এবং উঁচু ক্লাসের মেয়েরা সবাই আমার উপর খুব খুশী হতেন।

শনিবারে বোর্ডিং-এর এলাকার উঠোনের এক কোণায় মুচি এসে তার হাতিয়ার সরঞ্জাম নিয়ে বসতো সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। মেয়েরা যার যার দরকারমত তাকে দিয়ে জুতো মেরামত করিয়ে নিত, কিম্বা পালিশ করাতো।

বোর্ডিং-এ যাওয়ার দু'তিনমাস পরে একদিন বিকেলে খাবার ঘরে ভাত খাচ্ছি, হঠাৎ একটি মেয়ে এসে আমায় বললো, 'আমায় চিনতে পারছো ?' তার দিকে চেয়ে তাকিয়েই চিনে ফেললাম। আরে ! এ তো আমাদের রাণু। আমি ও রাণু বছর তিনেক বয়েস থেকে শিলং-এ বহুদিন এক সঙ্গে খেলাধূলা করে বড় হয়েছিলাম। সে তার এক দাদা ও বৌদিদির কাছে থাকতো। তার দাদা শিলং থেকে আসামে অন্যান্য জায়গায় বদলী হয়ে যাওয়াতে তাকে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাণুর সে বছর বোর্ডিং-এ আসতে কি কারণে দেরি হয়েছিল। কিন্তু সে আসার পর খুবই আনন্দে দুজনে সব সময়ে প্রায় একই সঙ্গে থাকতাম।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার কয়দিন পর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান হবে বলে খুব তোড়জোড় চলতে লাগলো। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল চামেলীদি ও আরও দু'একজন টিচার মিলে মেয়েদের নানারকম গান ও অভিনয়, নাট্য ইত্যাদি শেখাতে লাগলেন। বোর্ডিং-এ আমার ক্লাসের একটি মেয়ে খুব ভাল অভিনয় করতে পারতো, এবং সুন্দর গানও গাইত। কতকগুলি অভিনয়ের ও গানের পার্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল। তার নাম ছিল 'চন্দ্রাবতী'। পরে চলচ্চিত্রের একজন বিশেষ অভিনেত্রী বলে তার নাম হয়েছিল। তার দিদি কঙ্কাবতীও বেথুন কলেজ থেকে বি-এ পাস করার পরে বরাবর শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে অভিনয় করতেন। তিনি নাট্যে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আমাদের গানের মাস্টার ছিলেন সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের উপলক্ষে নানারকম গান শেখাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর গান শেখানোর টেকনিক খুব চমৎকার ছিল। তাঁর শেখানোর পদ্ধতিতে আমরা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের মেয়েরা গানের কম্পিটিশনে অন্যান্য স্কুলকে হারিয়ে ট্রফি নিয়ে আসতাম। সেই সময়কারের অধিকাংশ রবিবাবুর গানই আমার তাঁর কাছ থেকে শেখা। তিনি সবাইকে একসঙ্গে কোরাসে গান খুবই ভাল শেখাতেন। গান শেখানোর পর আমরা আব্দার করতাম তাঁর পানের ডিবে থেকে পান খাবো বলে। তিনি পকেট থেকে পানের ডিবে বের করে আমাদের পান ভাগ করে দিতে দিতে বলতেন খুব স্নেহভরে, 'আর তোরা আমায় জ্বালাতন করিসনে, এবারে আমায় বাড়ি যেতে দে।' এত বছর পরেও তাঁর কথা মনে হলে তাঁর সেই হাসিপূর্ণ চেহারার একটি ছবি চোখে ভেসে ওঠে।

কয়দিন পর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন এসে গেল। মেরী কার্পেন্টার হলের

একধারে স্টেজ সাজানো হয়েছে। পাশেই একটি কামরাতে যারা অভিনয় করবে তাদের সাজগোজ আরম্ভ হয়েছে। হল লোকে লোকারণ্য। একধারে স্কুলের মেয়েদের জন্য সারি দিয়ে বেঞ্চি পাতা। আমি আর রাণু পাশাপাশি বসেছি। আমি একেবারে নতুন, তাইতে এই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপার, খুব কৌতূহলবশতঃ চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এর মধ্যে হঠাৎ দেখলাম যাঁরা বিশেষ আগন্তুক হিসেবে এসে সামনে চেয়ারে বসেছেন, তার মধ্যে একজনকে একটি মেয়ে গিয়ে একটা মোটা গাঁদাফুলের মালা দিলে। যাঁকে মালা দেওয়া হলো তাঁর চেহারা দেখে হতাশ হয়ে রাণুর কানে কানে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই অতি বিচ্ছিরি দেখতে লোকটাকে মালা দিলে কেন রে ?' রাণু তার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললো, 'চুপ ! চুপ ! কাকে কি বলছিস ? ইনি যে সায়েন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আচার্য পি. সি. রায় (স্যার পি. সি. রায়)।'

সেই সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকেও দেখলাম। তাঁকে দেখে বেশ ভাল লেগে গেল। সুন্দর ছোটখাটো মানুষ, দেখতে ঠিক একটি পুতুলের মত, দামী শাল গায়ে দিয়ে বসে আছেন। তাঁর স্ত্রী লেডী অবলা বসু আমাদের স্কুলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি অতিশয় নিপুণভাবে সব চালাতেন। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের উল্টোদিকে বোস ইনস্টিটিউট ছিল। তিনি রোজই একবার এসে স্কুল ও বোর্ডিং-এর সব তদারক করে যেতেন। তিনি লম্বা-চওড়া দীর্ঘ অবয়বের মানুষ ছিলেন।

প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যাওয়ার পর থেকে ক্লাসে পড়াশুনার পালা খুব জোর দিয়ে আরম্ভ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সময় কেটে যেতে লাগলো, গরমের দিন এসে গেল। এই প্রথম গ্রীষ্মের গরম, বেশ কষ্টবোধ হতে লাগলো। মাসতিনেক পরে গ্রীষ্মের ছুটির জন্য স্কুল বন্ধ হলো। ছুটিতে বাড়ি যাবো বলে ট্রাঙ্ক বাক্স গুছিয়ে নিয়ে দিদির বাড়ি গেলাম। জামাইদা এসে একটা ঘোড়ার গাড়ির মাথায় আমার সব জিনিসপত্র চাপিয়ে নিয়ে গেলেন। ঠিক হলো দিদি, তাঁর দেড়বছরের ছেলে, জামাইদা ও আমি সবাই একসঙ্গে শিলং যাবো। আমরা যাচ্ছি শুনে আমাদের এক মাসতুতো বোন স্নেহদি ঠিক করলেন, তিনিও তাঁর মাস-দশেকের মেয়ে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গোলকগঞ্জ পর্যন্ত যাবেন এবং সেখানে আমার মাসতুতো ভাই এসে তাঁকে ধুবড়ী নিয়ে যাবেন।

আমরা সবাই আসাম মেলে শিয়ালদহ থেকে শিলং রওয়ানা হলাম। আবার সেই পথ ; শান্তাহারে গাড়ি বদল করে অন্য গাড়িতে আমিনগাঁও স্টেশনে পৌঁছে ফেরীতে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে পান্ডুঘাটে নামলাম। সেখানে মেইল মোটরগাড়িতে রাত দশটার সময় আমরা শিলং পৌঁছলাম। আবার বাড়ির সকলে একত্র হওয়ায় খুবই আনন্দ হলো। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আর কোনদিকে না তাকিয়েই দৌড়ে পেছনের বাগানে তদারক করে দেখতে গেলাম প্লাম্ কি রকম ধরেছে, কতখানি পাক ধরেছে। পুঁটু বললো, 'এখনও সে রকম পাকেনি রে টুনু ! সবে লাল রং দেখা দিয়েছে। দিন পনেরো পরে হয়ত পাড়া যাবে।' (পুঁটু চিরকালই আমার নাম ধরে ডাকতো, সকলে অনেক বলা সত্ত্বেও, আমরা দু বোনে একবারে যমজের মত ছিলাম বলে বোধহয়

সে আর কিছুতেই দিদি বলতে পারেনি এবং আমিও নিজে তার নাম ধরে ডাকাই পছন্দ করতাম।) মা বললেন, 'এতদিন পর বাড়ি এসে প্রথমেই প্লাম কি রকম পেকেছে সেই চিন্তা!'

আবার আমরা দুজনে মিলে জঙ্গলে জঙ্গলে, গাছের তলায় তলায় ঘোরা শুরু করে দিলাম।

দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে গেল। বাবা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে আমায় গৌহাটী পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক হলো, এক রাত তাঁর বাড়িতে থেকে পরদিন সেখান থেকে পান্ডুঘাটে আমায় পৌঁছিয়ে দেবেন এবং পান্ডুঘাট থেকে আমরা আসামের আরও দু'চারজন মেয়ে একত্র হয়ে কলকাতা চলে যাবো। গৌহাটী থেকে আমাদের সঙ্গে এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট ছেলে নিয়ে গাড়িতে উঠেছেন। সকলে ইন্টার ক্লাস গাড়িতেই যাচ্ছিলাম। আলাপ-পরিচয়ে জানা গেল তিনি কোন স্কুলের শিক্ষক। হঠাৎ তাঁর ছেলে দুটিতে মারামারি লেগে গেল এবং একটা ভাই রেগে অন্য ভাইয়ের জামা টেনে ছিঁড়ে দিলে। জামা ঐরকম ভাবে ছিঁড়ে যাওয়াতে পিতামাতা দু'জনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এখন উপায়! ভদ্রলোক বললেন, 'থাকো এখন ছেঁড়া জামা পরেই।' তাদের সকলের অবস্থা দেখে আমি বললাম, 'আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' বলে ছুঁচ-সূতো বের করলাম আমার এ্যাটেসি কেস থেকে। আমার হাত থেকে ছুঁচ-সূতো নিয়ে ছেলেদের মা ছেঁড়া জামা নিজেই সেলাই করে নিলেন। তার একটু পরে আরেকটা ছেলে ট্রেনের জানালা ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে হঠাৎ আঙুল কেটে ফেললো দুটো। কান্নাকাটি, রক্তাক্ত। আমি আবার আমার এ্যাটেসি কেস খুললাম এবং এ্যান্টিসেপটিক মলম, তুলো ও ব্যান্ডেজের রোল বের করে ছেলেটার আঙুল দুটো বেঁধে দিলাম। সব দেখে ভদ্রলোক আমায় বললেন, 'অতি উত্তম ব্যবস্থার সব বন্দোবস্ত।' আমি বললাম, 'আমার মা এসব দরকারী জিনিস গুছিয়ে সঙ্গে নেবার জন্য নির্দেশ দেন এবং রওয়ানা হবার আগে সব নেওয়া হয়েছে কিনা তদারক করেন।'

॥ ৩ ॥
কলকাতায় আরো দু'বছর

আবার বোর্ডিংএ এসে বাড়ীর সকলের জন্য যেমনি মন খারাপ লাগতো তেমনি গরমেও খুব কষ্ট হতো। সাংঘাতিক গরম, বৃষ্টি পড়লে যেন আরও ভ্যাপ্সা গুমোট গরম। তবে নতুন নতুন কতকগুলি জিনিস দেখে খুবই আনন্দ পেতাম। সুগন্ধ বেলফুল দেখে বেশ ভাল লাগতো।

আমাদের স্কুলের সামনে রাস্তার ধারে প্রায় পাঁচ-ছয়টা সারি দিয়ে বড় বড় গাছ ছিল। আগে কখনও দেখিনি, জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম সেগুলো কদমফুলের গাছ। গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে দেখলাম গাছগুলি হলদে রং-এর গোল গোল তুলোর বলের মত ফুলে ভরে আছে। স্কুলের দোতলার বারান্দা থেকে হাত বাড়ালেই গাছের ডাল

ধরা যেতো। একদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর ঐ বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঐ ফুলের শোভা দেখছি, এক সহপাঠী জিজ্ঞেস করলো, 'কি দেখছিস ?' আমি বললাম, 'ফুল ফুটে গাছগুলি কি সুন্দর দেখাচ্ছে।' সে মুখ বিকৃত করে আমায় বললে, 'আহাহা ! বড্ড কবিত্ব হচ্ছে।' এ শুনে আমার মনে মনে খুব রাগ হলো এবং বিশেষ দুঃখও বোধ করলাম। সেই গাছের সৌন্দর্য এখনও ভুলতে পারি না। পঁয়ষট্টি বছর পরেও স্মরণে এলেই সেই কদমগাছের দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মনে হয়।

ছুটির পর বোর্ডিং-এ এসে আরেকটা জিনিস দেখলাম। সেই বছরে মহরমের পর্ব পড়েছিল জুলাই মাসে। রোজ সন্ধ্যা থেকে স্কুলের সামনে আপার সার্কুলার রোডের* দুধারের ফুটপাতে মেলা বসতো বহু রাত অবধি। গ্যাসের আলো জ্বেলে মুসলমানেরা নানারকম মণিহারী জিনিস, কাঁচের বাসন, খেলনা, পুতুল নিয়ে বসতো। অনেক রাত্রে মহরমের মিছিল বের হতো। কয়েকটা লোক লাঠির ডগায় মশাল জ্বালিয়ে 'হাসান হোসেন' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে লাফিয়ে লাফিয়ে বুক চাপড়িয়ে লাঠি খেলে যেতো। তাদের উত্তেজিত করবার জন্য ঢোলকওয়ালারা প্রাণপণে ঢোল বাজাতো, আর একেবারে পেছনে প্রোশেসন করে তাজিয়া মাথায় নিয়ে আরেক দল কারবালা ট্যাঙ্কের দিকে চলে যেতো। কয় রাত জুড়ে এরকম চলতো। তারপর আসল পর্বের দিনে কারবালা ট্যাঙ্কে তাজিয়া ভাসিয়ে দিত। এই দৃশ্যটি আমার বড়ই দুঃখের মনে হতো। মহরমের মিছিলের ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই বেশীর ভাগ মেয়েরা বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে শোবার ঘরের জানলা দিয়ে মিছিল ও কসরত দেখতো। কিন্তু আমার কাছে ঐ আগুন নিয়ে লাফানোটা বড়ই ভয়াবহ ছিল।

স্কুলের পড়াশুনা সব খুব ভালভাবে চলতে লাগলো। দেখতে দেখতে এসে গেল শরৎকাল। কলকাতা এবং শিলং এই দুই জায়গার ঋতুতে কত তফাৎ বেশ বুঝতে পারতাম। লক্ষ্য করলাম, বর্ষার মেঘ কেটে গিয়ে নীল পরিষ্কার আকাশ, মাঝে মাঝে থোকা থোকা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ উড়ে যাচ্ছে। ভোরবেলা ঘাস শিশিরে ভিজে আছে আর শিউলিফুল ঝরে গাছতলায় পড়ে তার সৌরভে চারদিক আমোদিত করে তুলেছে। আমরা যে যেমন ভোরে উঠতাম, কোঁচড় ভর্তি করে শিউলি ফুল কুড়োতাম।

দেখতে দেখতে পুজোর ছুটি এসে গেল। আমি জামাইদার সঙ্গে শিলং রওয়ানা হলাম। পুজোর পর দিদিকে শিলং থেকে নিয়ে আসবেন বলে তিনি গেলেন। রাত্রে ট্রেনে যেতে যেতে অন্ধকারের মধ্যে আলোর ফুলকির মত হাজারে হাজারে জোনাকী পোকা জ্বলতে দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এর আগে কখনো-সখনো সন্ধ্যায় একটা, দুটো জোনাকী পোকা জ্বলতে দেখেছি কিন্তু এ যা দৃশ্য দেখলাম চোখে, কখনও ভোলা যায় না।

পুজোর ছুটিতে সবাই মিলে বাড়ীতে হৈ চৈ করে কাটিয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

* এখন এই রাস্তার নাম— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড।

সকলেই জানাশোনার মধ্যে বোর্ডিং-এ ও স্কুলে, সেজন্য আগের মত অতটা খারাপ লাগেনি। মাসদেড়েক পরেই বার্ষিক পরীক্ষা, সেইজন্যও পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

পরীক্ষার ফল ভালই হলো। সেলাই ও ড্রয়িং পরীক্ষায় প্রথম হলাম। প্রমোশন হয়ে গিয়ে বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হলো। বোর্ডিং-এর কেউ কেউ বাড়ী গেল ছুটিতে। আমরা দূরের মেয়েরা অল্পদিনের ছুটিতে যাতায়াতের অসুবিধা বলে বোর্ডিং-এই থেকে গেলাম। শুনেছিলাম ছুটির সময় এ-কয়দিন স্কুলের বাসে করে এদিক ওদিক নানান্ জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। চারদিক বেড়িয়ে দেখবার ইচ্ছায় দিদির বাড়ীও বিশেষ গেলাম না। এক একজন বোর্ডিং-এর টিচার এর উপর ভার থাকতো মেয়েদের দেখাশোনা করবার ও বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও যাওয়া হলো। সব জায়গাগুলি এবারে বেশ ভাল করে দেখতে পারায় খুব ভাল লাগলো। তবে বিশেষ আনন্দ হলো ও সবচেয়ে চোখ জুড়িয়ে রইল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে নানা রং-এর ক্যানা ফুলের বেডগুলি দেখে।

ক্রীসমাসের ছুটির পর নতুন বছরের আরম্ভে স্কুল খুলে গেল। নতুন ক্লাসে নতুন নতুন টিচাররা ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেও প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের পর্বের জন্য তেমন করে পড়াশুনা শুরু হলো না। গতবছরের মত এবারেও গান, বাজনা, অভিনয় করার জন্য একমাস জুড়ে রিহার্সেল চলতে লাগলো। এবারে আমিও পুরনো মেয়েদের দলে, আমাকেও নাটকের একটা পার্ট দেওয়া হল। আমি মোটাসোটা, খাটো মত ছিলাম বলে আমাকে ভীমের পার্ট দেওয়া হল।

প্রাইজের দিন সকাল থেকে মেরী কার্পেন্টার হলে চেয়ার পাতা হচ্ছে যাঁরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন দেখতে আসবেন তাঁদের জন্যে, একধারে মেয়েদের জন্যে ক্লাস হিসেবে বেঞ্চি পাতা হচ্ছে, ড্রয়িংমাস্টার ও বেয়ারারা মিলে স্টেজ সাজাতে ব্যস্ত। আবার দু'চারজন টিচার মিলে সকলের প্রাইজগুলি ক্লাস ও নাম অনুযায়ী হলের একধারে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছেন। প্রাইজগুলি সব রঙীন কাগজে মোড়া, জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা। একবার দৌড়ে আমরা দু'চারজন বন্ধু মিলে প্রাইজগুলি সব দেখতে গেলাম কৌতূহলবশতঃ। চোখে পড়লো, আমার নামেও দুটো প্যাকেট জরির ফিতেয় বাঁধা টেবিলের উপর রয়েছে। মনটা খুশিতে খুবই নেচে উঠলো।

দুপুর থেকেই নাটক ও গান বাজনার জন্য সকলে প্রস্তুত হতে লাগলাম। কর্ক পুড়িয়ে কয়লা করে তাই দিয়ে ঠোঁটের উপর এয়া বড় মোটা গোঁফ এঁকে, মাথায় একটা সিল্কের চাদর দিয়ে পাগড়ী বেঁধে, কাঁধে মোটা গদা নিয়ে আমায় ভীম সাজিয়ে দেওয়া হল। আমাদের ড্রয়িংমাস্টার আমাদের নাটকের জন্য সব সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে দিতেন। তিনি কাগজ পাকিয়ে কালো রং করে ভীমের গদা তৈরী করে দিয়েছিলেন। হুবহু কাঠের গদার মত দেখতে হয়েছিল। প্রথমে ওটা দেখে মনে মনে ভয় হয়েছিল, ঐ ভারী জিনিসটা কি করে কাঁধে নেবো। পরে দেখলাম একেবারে

হাল্কা। তারপর নাটক আরম্ভে হঠাৎ যখন চোখ পাকাতে পাকাতে গদা কাঁধে স্টেজে এসে দাঁড়ালাম, আমায় দেখে দর্শকদের মধ্যে ভীষণ এক হাসির রোল আরম্ভ হয়ে গেল। ঐ হাসি শুনে আমার নিজেরও হাসিতে পেট ফুলতে লাগলো। খাঁদুদির ওপর নাটক শেখাবার ভার ছিল। সে আগেই বলে রেখেছিল, 'খবরদার, হাসবি না কিন্তু।' কোনক্রমে হাসি চেপে আমার পার্ট বলেই দিলাম ছুট ভেতরে।

এসব হৈ-হল্লা সব হয়ে যাওয়ার পর একেবারে চেপে কাজ-কর্ম আরম্ভ হলো।

নতুন বছর, ১৯২৫ সন। নতুন ক্লাস, নতুন নতুন টিচার, নতুন নতুন বই, অনেক মেয়ে নতুন, এই নিয়ে বেশ একটা নতুন আবেষ্টনীতে দিন যেতে সুরু করলো। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই অন্যরকম পথ ধরতে হলো।

হঠাৎ ঠিক হলো জামাইদা নাগাপাহাড়ে কংডান(আসামে) বলে একটা জায়গায় ডাক্তার হয়ে চলে যাবেন কলকাতায় থাকার পাট তুলে দিয়ে। দিদি কয়েকমাস ছেলেকে নিয়ে শিলং-এ মা-বাবার কাছে থাকবেন। ঠিক করলেন মার্চ মাসের শেষের দিকে রওয়ানা হবেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হলে পর যদি কোন সঙ্গী না পাই শিলং যাবার জন্য, সেজন্য ছুটি আরম্ভ হবার একমাস আগেই প্রিন্সিপ্যালকে বলে বাড়ী যাওয়ার অনুমতি নেওয়া হল। নির্ধারিত দিনে সবাই রওয়ানা হয়ে পড়লাম। আবার ট্রেনে যেতে যেতে অন্য রকমের দৃশ্য দেখা যেতে লাগলো। কিন্তু একটা দৃশ্য যা অদ্ভুত চমকপ্রদ দেখলাম, সেটা সমস্ত জীবনে মনে রাখার মত।

কলকাতা থেকে রওয়ানা হওয়ার পরের দিন সকালে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ভেতর দিয়ে গোলকগঞ্জ পার হয়ে রঙ্গিয়ার দিকে যেতে যেতে দূরে সাদা বরফে ঢাকা হিমালয় শ্রেণী দেখতে পেলাম। কুয়াসা না থাকাতে পরিস্কার দিনে ভোরবেলার সূর্যের রশ্মি বরফের উপর পড়ে অপূর্ব মনোরম দৃশ্য দেখা যেতে লাগলো। বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে আরও পরিস্কার ভালভাবে দেখা যেতে লাগলো। এত লম্বা তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী, মনে হচ্ছিল ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে সমানে চলেছে। দিদিকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওটা হল প্রধান হিমালয় পর্বতশ্রেণী, ইংরেজীতে 'গ্রেট হিমালয়ান রেঞ্জ' বলে। ঐ পর্বতশ্রেণী চিরকাল বরফে ঢাকা থাকে। ওখান থেকে যে উচ্চ শিখর দেখা যায়, তার নাম 'কুলা-কাংড়ি'।

শিলং পৌঁছবার মাসখানেক পরে স্কুল ছুটি হওয়ার কয়দিন পরে রাণু তার দিদি, দাদা, বৌদি সকলের সঙ্গে শিলং গেল। স্কুল, বোর্ডিং-এর সব খবর রাণু জানাতে গিয়ে বললো, 'এ বছর থেকে কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে। ছুটির পর গিয়ে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা হবে।' মনে মনে ভেবেছিলাম কোয়ার্টার্লি পরীক্ষার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি মার্চ মাসে চলে আসাতে, কারণ প্রথম কোয়ার্টালি ছিল এপ্রিলে ঠিক স্কুল বন্ধ হবার আগে। কিন্তু পরীক্ষা বলে আপদ জিনিসটা রয়েই গেল। ছুটিতে আর নিস্তার নেই। পড়াশুনা করেই যেতে হবে পরীক্ষার জন্যে। তবে একদিকে মাসখানেক আগে শিলং চলে আসাতে কিছুদিন বেশী বাড়ী থাকা গেল।

ছুটি শেষ হতে আমি ও রাণু বোর্ডিংএ ফিরলাম একসঙ্গে। প্রতিভাদি (রাণুর

দিদি) আমাদের দেখাশোনা করে শিলং থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন।

ফিরে আসার কিছুদিন পর একদিন স্কুলের শেষে বোর্ডিংএ কি যেন নিজের কাজকর্ম করছি, এমন সময়ে একটি মেয়ে এসে বললো, 'তোমার সঙ্গে কে একজন বুড়ীমত দেখা করতে চায়।' আমি তাই শুনে তাড়াতাড়ি সব ফেলে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে মিউজিক রুমে গিয়ে আগন্তুককে দেখেই আনন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, 'আরে, এ যে আমাদের সেজদি।' ইনি ছিলেন আমাদের "ইউনিভার্সেল" সেজদি। দিদিরা বৃন্দাবন মল্লিক লেনে যে বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীটা ছিল সেজদির বাবার। বাড়ীটা বেশ বড় ছিল। দু-ভাগে ভাগ করা, আলাদা আলাদা সব ব্যবস্থা। একদিকটা ভাড়া দিয়েছিলেন দিদির ভাসুর অজিতবাবুকে, আর অন্য দিকটায় তাঁর ছেলে পানুবাবু ও মেয়ে অর্থাৎ সেজদিকে নিয়ে থাকতেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সেজদি ছিলেন বালবিধবা। তিনি বাড়ীতেই তাঁর বাবার কাছে পড়াশুনা করে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। ইংরেজী খুব ভাল জানতেন। বাবা ও ভাই-এর দেখাশোনার যাবতীয় ভার সেজদির ওপরেই ছিল। সেজদি অতিশয় হাসিখুশি, ভালমানুষ ছিলেন। তিনি বরাবর দিনে দু তিন ঘন্টা করে চরকায় সুতা কাটতেন। আমি অনেক সময় শনি-রবিবারে যখন দিদির বাড়ী যেতাম, শীতকালে ছাদে ঘুরে ঘুরে পড়বার সময় দেখতাম, সেজদি শীতের রোদ্দুরে ছাদে বসে একগামলা ডালবাটা নিয়ে বড়ি দিচ্ছেন। তখন আমার সঙ্গে সেজদির অনেক গল্পগুজব হত এবং সেই থেকে দুজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। আমায় একেবারে তাঁর নিজের ছোট বোনের মত মনে করতেন।

সেজদি বোর্ডিং-এ দেখা করতে এসে বললেন, 'টুনু, অজিতবাবুরা বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার পর আর তোর সঙ্গে দেখা হয় না। তাই দেখতে এলুম কেমন আছিস। একা একা বোর্ডিং-এ আছিস্, কোন কিছুর দরকার হলে বলিস্। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে তোকে এসে দেখে যাবো।'

দুজনে খেলার মাঠে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে অনেকক্ষণ গল্পসল্প করার পর সেজদি ফিরে গেলেন। এরপর প্রায়ই আমায় দেখতে আসতেন। সেজদি খদ্দরের সাদা থানকাপড় পরতেন এবং রাস্তায় বের হবার সময় একটা খদ্দরের চাদর মুড়ি দিতেন। তাঁর ঐ রকম পোশাক দেখে বোর্ডিং-এর কোন কোন মেয়ে হাসাহাসি করতো। আমার বড় কষ্ট হতো, ভাবতাম সেজদি এই দুঃখী মানুষটি যে কি গুণের, তার মর্যাদা তারা কি বুঝবে ? কোন কোন সময় ছুটির দিনে দুপুরের পর সেজদি এসে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে বলে তাঁদের বাড়ী আমায় নিয়ে যেতেন। নানারকম রান্না করে, লুচি ভেজে মিষ্টি পায়েস ইত্যাদি দিয়ে সন্ধ্যের খাওয়া খাইয়ে, আবার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বোর্ডিং-এ পৌঁছে দিয়ে যেতেন। মাঝে বহুবছর তাঁর সঙ্গে দেখাশোনার সুযোগ হয়নি। কিন্তু ১৯৩২ সালে আমার বিয়ের খবর পাওয়ামাত্র সেদিন অর্থাৎ ৮ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল বিয়ের দিন সকালবেলা সেই কতদূর থেকে ভবানীপুরে এসে একখানা সুন্দর রঙীন খদ্দরের শাড়ী দিয়ে আমায় কত আশীর্বাদ করে গেলেন। আমার বিয়ের পর

মাঝে মাঝে আমাদের শ্যামবাজারের ফ্ল্যাট বাড়ীতেও চলে আসতেন হেঁটে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

এবার গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে শুনলাম বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট বেবীদি (ললিতা বোস) কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বছরের শেষ পর্যন্ত স্কুলের টিচার বলে রইলেন। এবং তাঁর জায়গায় উষাদি (উষালতিকা হালদার) সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে এলেন। তিনি এসে অনেক নিয়মকানুন অদলবদল করিয়ে দিলেন। প্রথমতঃ মেয়েরা যার যেমন খুশি এলোচুলে, খালিপায়ে স্কুলে ক্লাস করতে চলে যেতো। তিনি নিয়ম করে দিলেন—বোর্ডিং-এর সব মেয়েদের চুল বিনুনী করে বেঁধে ক্লাসে যেতে হবে। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা এক বিনুনী বাঁধবে এবং নীচু ক্লাসের ছোট মেয়েরা দুটো বিনুনী করবে। সবাইকে জুতো পরে স্কুলে যেতে হবে। কেউ স্লিপার পরে বা শুধুপায়ে ক্লাসে যাবে না। শাড়ী পরা সম্বন্ধেও নিয়ম হল। আগে আমরা শাড়ীর আঁচল সামনে এনে একটা কোণা পিন দিয়ে আটকে রাখতাম কাঁধের ওপরে। এবারে বলা হল সবাইকে বম্বের পার্শিদের স্টাইলে শাড়ী পরতে হবে। তবে পার্শিদের মত ডানদিকের কাঁধে শাড়ী না রেখে বাঁদিকে রাখতে হবে। এই নিয়মে কিন্তু সবাইকে বেশ ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখাতে লাগলো। খাবারঘরেরও চেহারা বদলে গেল পিঁড়ি তুলে টেবিল করিয়ে দেওয়ায়। আর ড্রেসিংরুমের জন্য বড় বড় ওয়ার্ড্রোব এলো।

দেখতে দেখতে আমাদের পূজোর ছুটি এসে গেল। সেবারে পূজোর ছুটিতে শিলং যাবার কোন সঙ্গী না পাওয়াতে বোর্ডিং-এই থেকে গেলাম। আমরা জনা-দশ-বারোজন দূরের মেয়ে যাদের বাড়ী যাতায়াতের অসুবিধা তারাই রইলাম। আর বেথুন কলেজের তিন-চারজন বি-এ ও এম-এ ক্লাসের ছাত্রী তাদেরও কলেজ হস্টেল বন্ধ হয়ে যায় অথচ বাড়ী না গিয়ে কলকাতাতেই থাকবেন বলে আমাদের বোর্ডিং-এ বিশেষ অতিথি হিসেবে এসে রইলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। সেবারে রাণুও বোর্ডিং-এ থেকে গেল।

আমরা কয়েকজন মাত্র মেয়ে হওয়াতে এবং একটু স্ফূর্তিতে যাতে ছুটি কাটাতে পারি সেজন্য আমাদের জন্য রকমারি রান্না, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ও নানান্ জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। একদিন স্কুলের বাসে আমরা সব মেয়েরা ও মেট্রন এবং দু'চারজন টিচার মিলে ধামাভর্তি লুচি, তরকারী, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি প্রচুর খাবারদাবার নিয়ে শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলাম; সেখানে পৌঁছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই বিরাট বটগাছের তলায় শতরঞ্চ পেতে সকলের বসবার জায়গা করা হল। মাসীমা ও টিচাররা খাবারদাবারের তত্ত্বাবধানে রইলেন, আমরা মেয়েরা আলগা আলগা দল করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। বেড়াতে বেড়াতে একটা ঝিলের ধারে গিয়ে দেখি অজস্র পদ্মফুল ফুটে একেবারে গোলাপী একটা কার্পেটের মত দেখাচ্ছে। বরাবর ট্রেনে যাওয়া-আসা করবার সময় রেলের দুধারে সাদাশালুক ফুল এঁদোপুকুরে ফুটে আছে, তাই দেখতে খুব ভাল লাগতো এবং সে সঙ্গে দু-একটা পদ্মফুল গোলাপী রং-এর দেখতেও বেশ ভাল লাগতো।

কিন্তু যখন একসঙ্গে এতগুলি গোলাপী পদ্ম দেখলাম খুবই আনন্দ হলো।

ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলের শোভা দেখছি, এর মধ্যে হঠাৎ দেখি একটা লোক ডুবে ডুবে জল থেকে পদ্মফুল তুলছে। আমি আর রাণু দুজনে একটু এগিয়ে পুকুরের বেশ ধারে গিয়ে তাকে বললাম, 'চার আনা পয়সা দেবো আমাদের কয়টা ফুল তুলে দেবে ? সে আট-দশটা ফুল তুলে এনে পয়সা নিয়ে আবার জলে ঝুপ্ করে ডুব দিল। আমরা দুজনে খুব খুসী মনে হাসতে হাসতে যেখানে গাছতলায় সবাই বসেছিলেন সেখানে গিয়ে ফুলগুলি রাখলাম।

একটু পরে ঐ লোকটা (যে পদ্মফুল তুলে দিয়েছিল) এসে টিচারদের বললো, 'দেখুন, আমি পূজোর জন্য ফুল তুলে নেবো বলে অনুমতি নিয়ে 'পাস্" করিয়েছি, আমি কোনক্রমে সাইকেলে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আপনারা বের হবার সময় ঐ ফুলের জন্য "পাস্" দেখতে চাইতে পারে, এবং এতে গণ্ডগোল হতে পারে, সেজন্য আমি আমার "পাস"টা দিয়ে যাচ্ছি।' বলেই—সবাই যেখানে বসেছিল সেদিকটায় একটা কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল। তখন আমি আর রাণু এই পদ্মফুল আনার জন্য খুব বকুনি খেলাম টিচারদের কাছে। আমি খুব ঘাবড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'তাহলে ফুলগুলি আবার ফেলে দিয়ে আসি !' তাইতে খাঁদুদি, তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়তো, বললে, 'হুঁঃ ! ফুল ফেলতে যাবি কেন ? আমাদের এই ধামা, শতরঞ্চি সব আছে, ওগুলোর ভেতরে করে বেশ নির্বিবাদে ফুল নিয়ে চলে যাওয়া হবে।' এই পদ্মফুল নিয়ে এরকম অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে যাওয়াতে বোর্ডিং-এ ফিরে এসে ওগুলোর দিকে তাকালামও না।

আমি ব্রাহ্ম না হলেও ছেলেবেলা থেকে বরাবর ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। বোর্ডিং-এ এসেও প্রতি রবিবারে সন্ধ্যেবেলার উপাসনায় যোগ দেবার জন্য কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ব্রাহ্মসমাজে যেতাম এবং শীতকালে মাঘোৎসবের সময়ও কোন অনুষ্ঠান বাদ দিতাম না।

মেরী কার্পেন্টার হলে, কিম্বা আমাদের স্কুলের খেলার মাঠে ব্রাহ্মদের নানারকম আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হতো। এসব অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অশোক চ্যাটার্জি, সুবিনয় রায় প্রভৃতি বহুজনকে আসতে দেখেছি। প্রায়ই বুলা মহলানবীশ খুব সুন্দর বাঁশী বাজাতেন, আরও গানবাজনাও হতো। আবার কোন কোন সময় কাজী নজরুল ইস্‌লামকে ডাকা হতো। তিনি গেরুয়া রং-এর মেরজাই পরে এসে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন। এই সব অনুষ্ঠানের পর চা ও নানারকম খাবারদাবারের ব্যবস্থা হতো ও বেশীর ভাগ সময়েই বোর্ডিং-এর রান্নাঘর থেকে এসব তৈরী করে দেওয়া হতো। সিঙ্গাড়া তৈরী করা, কমলালেবু ছাড়ানো—এসব কাজে সাহায্য করবার জন্য রান্নাঘরের মাসীমা বোর্ডিং-এর মেয়েদের ডাকতেন। সর্বদাই আমরা দু-চারজন গিয়ে সাহায্য করতাম। এতে মাসীমাও খুব খুসী হতেন আমাদের উপর, আর তাছাড়া আমরা—যারা সাহায্য করতাম, তাদের এই অনুষ্ঠানগুলিতে গিয়ে যোগ দেবার জন্য উদ্যোক্তারা ডেকে পাঠাতেন। এই ব্যাপারে যে-মেয়েরা আবার কোন সাহায্য করতো না, তারা আমাদের

উপর বেশ একটা বিরক্তির ভাব দেখাতো।

স্কুলে এবং বোর্ডিং-এ আমি ভাল সেলাই ও ড্রয়িং করতে পারি বলে আমার একটু নাম সকলের মধ্যেই বেশ জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ম্যাপ—রিলিফ এবং পলিটিক্যাল—দুটোই খুব ভাল আঁকতে পারতাম। শিলং মিডিল ইংলিশ স্কুলে আমাদের খুব বেশী ম্যাপ আঁকার দিকে জোর দেওয়া হতো। এতে ম্যাপ আঁকায় খুবই অভ্যস্ত ছিলাম। এর দরুণ বোর্ডিং-এর উপরের ক্লাসের মেয়েরা যারা অতিরিক্ত ভূগোল পড়তো তাদের ম্যাপ আঁকার জন্য টিচাররা বললেই, তারা খাতাপত্র নিয়ে আমার কাছে এসে তাদের ম্যাপ আঁকিয়ে নিত। আমি তাদের ম্যাপ এঁকে দিতাম বলে প্রায় সকলেরই খুব সুনজরে পড়ে গিয়েছিলাম। এই সূত্রে প্রমীলাদির সঙ্গে খুব ভাব জমে গিয়েছিল, প্রমীলাদি যদিও আমার দুই ক্লাস উঁচুতে পড়তো। কিন্তু সে আমাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতো। আরেকটা ব্যাপারে আমার তার উপরে খুব বেশী একটা সহানুভূতি-ভাব হয়ে উঠলো, যখন শুনলাম সে পিতৃমাতৃহীনা, একেবারে একা। তার এক জেঠামশায় আচার্য অমৃতলাল গুপ্তের কাছে মানুষ। পরে কলেজে পড়াকালীনও আমরা এক হস্টেলে ছিলাম এবং নিজের বোনের মতই দুজনে মনে করতাম।

ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ক্লাসে উঠলাম। যদিও সেলাই, ড্রয়িং, রিলিফ ম্যাপ মডেলিং-এ প্রথম হলাম, কিন্তু থার্ডক্লাসের পরীক্ষার ফল তেমন ভাল হলো না। কারণ অতিরিক্ত বিষয় সংস্কৃত নিয়েছিলাম আর ঐ সংস্কৃতের শব্দরূপ, বিসর্গ ইত্যাদি কিছুতেই মাথায় ঢুকতো না। এজন্য পরীক্ষায় ১০০ নম্বরে একেবারে ০ পেলাম। সেদিন থেকেই সংস্কৃত পড়া ছেড়ে দিলাম। অন্যান্য বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়েও 'পজিশন' অনেক নীচে হয়ে গেল।

বড়দিনের ছুটিতে স্কুলের বাড়ীতে দুটো ঘর নিয়ে খুব ধুমধাম করে নারীশিক্ষা সমিতির তরফ থেকে একটা বড় শিল্পের একজিবিশন হয়। এই একজিবিশনের উদ্যোক্তা ছিলেন নারীশিক্ষা সমিতির সেক্রেটারী টুলুদি। তিনি ছিলেন সুকুমার রায়ের স্ত্রী ও সত্যজিৎ রায়ের মা। সত্যজিৎ অবশ্য তখন খুব ছোট। টুলুদি আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর কাছে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন মেয়েকে চাইলেন। ঊষাদি কয়েকজন উপর ক্লাসের মেয়ের সঙ্গে আমাকেও গিয়ে সাহায্য করতে বললেন ও আমার কিছু হাতের কাজ একজিবিশনে দিতে বললেন। এক সপ্তাহ ধরে ভলান্টিয়ারের কাজ এবং সব যা একজিবিশনে দেখানো হয়েছিল, সেগুলি প্রথমে সাজানো এবং পরে গোটানো এসব কাজ করে দেওয়াতে টুলুদি খুবই খুসী হয়েছিলেন।

সেবারে পূজোর ছুটিতে বাড়ী যেতে পারিনি বলে মা ও বাবার মন খুবই খারাপ। শীতকাল পড়তে যখন বেশ ভাল কমলালেবু বাজারে উঠেছে, বাবা একটা প্যাকিং বাক্স ভর্তি করে আমার জন্য কালুদির নামে রেলওয়ে পার্শেলে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু কমলালেবু বোর্ডিং-এর সব মেয়েদের ও টিচারদের দেবার জন্য মাসীমাকে দেওয়া হল। বাকীটা কালুদির ঘরেই রইল। একদিন কালুদি বললেন,—'কমলালেবু সব খারাপ

হয়ে যাবে, তুই নিয়ে খাচ্ছিস্ না কেন ?' আমি দশ-বারোটা কমলালেবু নিয়ে আমার দুই-চারজন সঙ্গিনীকে নিয়ে খাচ্ছি, দু-একটায় একটু পচ্‌ও ধরেছে, আলাদা করে রেখেছি। এর মধ্যে দেখি, আমাদের একজন খ্রীষ্টান টিচার, তিনি নীচের ক্লাসের মেয়েদের পড়াতেন ও বোর্ডিং-এই থাকতেন, তাঁর নাম ছিল মিসেস পাত্র, আমাদের দিকে আসছেন। তাঁর সব খাবারে বড্ড আসক্তি ছিল। আমি তাড়াতাড়ি একটা পচা কমলালেবু নিয়ে বেশ করে বইপত্র রাখবার যে আলমারী ছিল তার উপরে রেখে দিলাম আর আমরা যারা মিলে কমলালেবু খাচ্ছিলাম, আলমারীর পিছনে লুকিয়ে রইলাম। মিসেস পাত্র কমলালেবু দেখতে পেয়ে নিজে জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'ওমা, গো ! কে এই কমলালেবু ফেলে রেখেছে গা ?' এই বলে কমলালেবু হাতে তুলে নিয়ে পচা দেখে বললেন, 'ওমাঃ এ তো পচা !' আমরা কি আর চুপ থাকতে পারি ? খিলখিল করে হেসে উঠেছি। উনি চোখ পাকিয়ে বক্‌বার উপক্রম করতে যাচ্ছেন, তার আগেই চারটা ভাল কমলালেবু তাঁর হাতে গুঁজে দিতে খুব খুশী হয়ে চলে গেলেন।

জানুয়ারী মাস থেকে নতুন ক্লাস শুরু হল। কিন্তু পড়াশুনা আরম্ভ করেও প্রায় এক বছর শিলং-এ বাড়ী যেতে না পারায় কেবল দিন গুনতে লাগলাম, কবে বাড়ী যাবো।

এই সময়ে আমাদের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুনীতি দাশগুপ্তা অন্যত্র স্কুল ইন্‌স্‌পেকট্রেস হয়ে চলে গেলেন এবং মিস্ সেকার (সরকার) এসে সমস্ত স্কুলের ভার নিলেন। তিনি আমাদের ইংরেজী পড়াতে আরম্ভ করলেন, তাছাড়া স্পোর্টসের (খেলাধূলা) ব্যাপারে তাঁর ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। প্রায়ই তিনি খেলার মাঠে আমাদের সঙ্গে খেলতে নেমে পড়তেন। তাঁর পড়ানোর ধরন এবং সকলের সঙ্গে সরল সহজ ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যেই সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি অল্প কয়েকমাসই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। তাঁকে আমার খুবই ভাল লেগেছিল। শুনেছি তিনি অতিশয় সুন্দর দক্ষতায় বহুবছর ধরে স্কুল চালিয়েছিলেন।

তারপর এপ্রিল মাসের শুরুতে আরম্ভ হলো ১৯২৬ সনের ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। স্কুল কয়দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। বোর্ডিং-এর যে মেয়েদের বাড়ী কাছাকাছি ছিল তারা অনেকেই বাড়ী চলে গেল। আমরা যারা দূরের রয়ে গেলাম বোর্ডিং-এ। দিন পনেরো পরে আবার স্কুল খুললো। কিন্তু দিন সাতেকের মধ্যেই আবার দ্বিগুণভাবে গণ্ডগোল শুরু হলো। রাতে সাংঘাতিক চীৎকার 'আল্লা হো আকবর' শুনে আমাদের সাংঘাতিক হৃৎকম্প হত। রাজাবাজার ইত্যাদি মুসলমান পাড়া কাছে থাকায় জায়গাটা আর নিরাপদ নয় মনে করে স্কুল ও বোর্ডিং দুইই একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে মাসতুতো বোন স্নেহদির বাড়ী চলে গেলাম। ভগ্নীপতি প্রকৃতিকুমার ঘোষ, তাঁকে দাদাবাবু ডাকতাম, বাবাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেন যে স্কুল ও বোর্ডিং দুই-ই বন্ধ হয়ে গেছে, আমি তাঁদের কাছে ভালই আছি।

খবর পেয়ে জামাইদা নাগাপাহাড়ের কংডান থেকে দিদি ও মন্টুকে নিয়ে শিলং-এ রেখে, আমায় নিয়ে যাবার জন্য কলকাতা এলেন। তিনি দুদিন ভবানীপুরে তাঁর বোনের বাড়ী থেকে আমায় সঙ্গে করে শিলং রওয়ানা হলেন। সেই সময়ে ট্রেনে যাতায়াতও মোটেই নিরাপদ ছিল না। তিনি আই-এম-এস্-এর ডাক্তার ছিলেন বলে তাঁর পিস্তল ছিল। সঙ্গে পিস্তল নিয়ে এসেছিলেন এবং সর্বক্ষণ সেটি তাঁর জামার নীচে কোমরে বেল্ট দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। তবে সেটা আর ব্যবহারের দরকার হয়নি। আমরা মঙ্গলমতই নির্বিবাদে দুজনে শিলং পৌঁছলাম।

॥ ৪ ॥
শিলং-এর স্কুল

এমনিতে আমাদের বয়স বাড়লেও এবং ক্রমান্বয়ে ক্লাসের পর ক্লাসে উঠে গেলেও ছেলেমানুষের মত দুষ্টুমি করার অভ্যাস আরও বেশ কিছুদিন থেকেই গেল। তাই এবারে শিলং গিয়ে বহুদিন পর দু'বোনে একত্র হয়ে আবার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি আরম্ভ করলাম। শিলং-এর ওয়ার্ডস লেকের কাছেই আমাদের বাড়ি ছিল। মাঝে মাঝে দুপুরে আমরা দু'বোনে দিদির সাড়ে তিন বছরের ছেলে মন্টুকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যেতাম। কান্তাই (আমাদের খাসিয়া ঝি) সঙ্গে থাকতো। লেকে একটা নৌকোর ঘর ছিল। তাতে দুটো নৌকো বাঁধা থাকত। মাঝে মাঝে বিকেলবেলা ক্লাবের সাহেবরা দু-চারজন লেকে দাঁড় বেয়ে নৌকোতে ঘুরে বেড়াতো। আমরা লেকে ঐ নৌকোর ঘরে গিয়ে অনেক সময়ে জুতো খুলে জলে পা ডুবিয়ে বসতাম। একদিন লক্ষ্য করলাম, ছোট ছোট মাছ জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেই মাছ দেখা, অমনি দু'বোনে পরামর্শ শুরু হলো, মাছ ধরবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? ভাবামাত্র কাজ শুরু হয়ে গেল। তার পরদিনই সকালে দুটো কঞ্চিকাঠি যোগাড় করে তার ডগায় সুতো বেঁধে ছিপ তৈরী হল। এখন সমস্যা বঁড়শী পাই কোথা? হঠাৎ মাথায় এলো আলপিন বেশ করে বেঁকিয়ে সুতোয় বেঁধে যদি বঁড়শীর কাজ দেয়। অতিকষ্টে দুটো আলপিন বেঁকিয়ে বঁড়শী তৈরী করে সুতোয় বেঁধে ছিপ নিয়ে, কিছু পাঁউরুটিও নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেলাম। কান্তাইকে বললাম, লুকিয়ে ছিপ দুটো নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। মাকে বলে গেলাম, আমরা লেকের ধারে একটু ঘুরে আসি। রুটির টুকরো আলপিনে লাগিয়ে জলে ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে বোকা মাছগুলি খাবার লোভে এসে বঁড়শীতে গাঁথা পড়তে লাগল। ওগুলো অতি ছোট ছোট মাছ, পিন থেকে খুলে আবার জলে ফেলে দিতাম। বাড়ি এসে উৎসাহের চোটে মাছ ধরার গল্প করাতে বাবা বললেন, 'ও কি, তোমরা মেয়েছেলে মাছ ধরবে কি? তাছাড়া ওখানে ওরকম মাছ ধরা বারণ।'

কিন্তু মাছ ধরার লোভ গেল না। দু-তিন দিন পর আবার একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ছিপ নিয়ে লেকে গেছি। সঙ্গে মন্টুও গিয়েছে। ওকে বলেছি, 'দেখ, খবরদার দাদুকে মাছ ধরার কথা কিছু বলবি না।' বিকেলে বাড়ি ফেরার পর সবাই বসে খাবার খাচ্ছি,

গল্পসল্প হচ্ছে, হঠাৎ মন্টু বলে উঠলো, 'ইয়ে কি যেন বলেছিলে তোমরা? দাদুকে মাছ ধরার কথা বলতে বারণ করেছিলে!' আমি আর পুঁটু একজনের দিকে আরেকজন তাকাচ্ছি। বাবা শুনে বললেন, 'আবার মাছ ধরতে গিয়েছিলে?' মাকে বলে দিলেন, আর যেন ওরকম শুধু কান্তাই-এর সঙ্গে আমাদের যেতে দেওয়া না হয়।

দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে স্কুল খোলার সময় হয়ে এলো। কিন্তু কার সঙ্গে ফিরি এই নিয়ে হলো সমস্যা।

গ্রীষ্মের ছুটির পর পুঁটুরও আমার সঙ্গে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ও বোর্ডিং-এ যাবার ঠিক হল। সেই বছরে জানুয়ারী মাস থেকেই সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল এবং ছয় মাস ধরে তার জন্য স্কুল-ফি-ও দেওয়া হচ্ছিল। আগেই বাবা প্রিন্সিপ্যালকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে সে গ্রীষ্মের ছুটির পর গিয়ে ক্লাস করতে আরম্ভ করবে।

কোনো ভাল সঙ্গী আর পাওয়াই গেল না, যার সঙ্গে আমরা দু'বোন কলকাতায় যেতে পারি। বাবা বললেন, 'থাক্ আর কলকাতা গিয়ে দরকার নেই। একে তো এরকম হঠাৎ দাঙ্গা ইত্যাদি আরম্ভ হলে আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হয়, তারপর সব সময়ে যদি ভাল সঙ্গীও না পাওয়া যায়, তবে বড় হাঙ্গামা। তার চাইতে এখানেই মোখারের ওয়েলস্ মিশন হাইস্কুলে ভর্তি করে দিই—দু'বোনে হেঁটেই চলে যাবি।'

এই বলে আমাদের দুজনকে ওয়েলস্ মিশন হাই স্কুলে ভর্তি করে দেবার জন্য নিয়ে গেলেন। মিস্ হিল্ডা জোন্স্ বলে একজন ওয়েলস্ মিশনারী স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি তখুনি আমায় সেকেন্ড ক্লাসে ও পুঁটুকে থার্ড ক্লাসে ভর্তি করে নিলেন। পড়ার কোন অসুবিধা হলো না, তবে কলকাতার স্কুলের চাইতে একটু বেশী বিষয় পড়তো হতো—বটানি এবং বাইবেল পড়তো হতো আর ছবি পেইন্ট করা শিখতে হতো রংতুলি দিয়ে। এই স্কুলে গিয়ে ইংরেজীতে কথা বলার অভ্যেসও বেশ সড়গড় হয়ে গেল।

স্কুলটা প্রায় মাইলখানেক দূরে ছিল। আমরা হেঁটেই যাওয়া-আসা করতাম।

এই স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের সব টিচাররা খাসিয়া ছিলেন। তাঁরা সকলেই বেশ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। প্রত্যেক দিন সকালে স্কুল আরম্ভ হবার আগে ও বিকেলে স্কুল ছুটি হওয়ার সময়ে দু'বেলাই হলএ প্রার্থনা হতো। ক্লাস হিসেবে বেঞ্চি থাকতো বসবার জন্য। প্রথম পিয়ানো বাজিয়ে মিস্ জোন্স্ ইংরেজীতে গান আরম্ভ করলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে স্কুলের সব ক্লাসের মেয়েদের ও টিচারদের গান গাইতে হতো, তারপর মিস্ জোন্স্ নিজেই একবার ইংরেজীতে ও আরেকবার খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করতেন।

একদিন এক মজা হয়েছিল। একটি ছোট খাসিয়া মেয়ে, বছর সাতেক তার বয়স হবে, স্কুল আরম্ভ হবার সময় মিস্ জোন্স্ যখন উপাসনা করছেন, সে দূরে তার জায়গাটিতে বসে একটা কাঁচা কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে খেয়েছে। ওদিকে মিস্ জোন্স্ উপাসনা করতে করতে ঠিক কাঁচা কমলালেবুর উগ্র গন্ধ পেয়েছেন। 'আমেন্' বলে উপাসনা শেষ করামাত্র মেয়েটি যেখানে বসেছিল সোজা সেখানে গিয়ে চোখ

পাকিয়ে খুব বকুনি দিলেন লেবু খাওয়ার জন্য। আমরা তো পরে ক্লাসে এসে হেসেই গড়াগড়ি। উপাসনা করতে গিয়ে তাঁর চোখ পুরো বন্ধ ছিল কি ? না মিট্‌মিট্‌ করে দেখ্‌ছিলেন ? মেমসাহেব হয়ে তিনি যখন খাসিয়া ভাষায় 'আ উব্লাই ! কারখু ইয়াঙ্গি' অর্থাৎ 'হে ভগবান ! আমাদের সব দোষ মাফ করে আশীর্বাদ কর' ইত্যাদি বলে উপাসনা করতেন, সেই শুনে আরও হাসি পেতো।

তিনি পড়াতেন খুব ভাল। এক এক সময়ে তাঁর পড়ানোর ধরনে তাঁর ক্লাসের পর আমাদের মধ্যে হাসির রোল উঠতো। একবার আমাদের ইংরেজী বিষয় পড়বার সময় 'ফিজিক্যাল কারেজ' বলে একটা প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে বুলডগ্‌ কি রকম্‌ একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়তে চায় না, সেটা বোঝাবার জন্য তিনি হাত দিয়ে নিজের গলা এমনি চেপে ধরতেন যে নিজেই টকটকে সিঁদুরে লাল হয়ে যেতেন।

আমি সর্বদাই বাইবেলে প্রথম হতাম, তাইতো খাসিয়া মেয়েদের খুব বকতেন। তাদের বলতেন, 'অমিয়া হিন্দু মেয়ে হয়ে বাইবেলে প্রথম হয়ে যায়, এতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।' ক্লাসের প্রত্যেকটি মেয়ে কে কি ভাবে পড়াশুনা করছে, তার উপর তাঁর সব সময়েই খুব নজর ছিল।

অসম্ভব পরিষ্কারও ছিলেন। স্কুলে কোন কিছু নোংরা অগোছালো হতে বা কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে একেবারেই দিতেন না। যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি, একদিন আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ের দোয়াত থেকে হঠাৎ কালি পড়ে যায় মেঝেতে। ঘরের মেঝে কাঠের। প্রথমে তাকে দিয়ে সাবানজলে ধুয়ে মুছে তুলতে বললেন। সাবানজলে যখন ভাল করে উঠলো না, তখন বিকেলে ক্লাসের পর সিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে সেই দাগ তুলে তবে মেয়েটি ছাড়া পেল।

একেবারে নীচু ছোটদের ক্লাস থেকে উপরের ক্লাসের প্রত্যেকটি মেয়েকে চিনতেন এবং সবাইকে খুবই ভালবাসতেন। কেউ কোন দোষ করলে বকুনি যেমনি দিতেন, তেমনি সবার সঙ্গে সর্বক্ষণ হেসে গল্পও করতেন।

আমাদের ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষার পরদিনেই সবাইকে একটি বড় 'টি-পার্টি' দিলেন এবং বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে 'Succcss to Matric Class' উপরে লিখিয়ে প্রকাণ্ড একটা কেক্‌ তৈরী করিয়ে আনালেন।

আজ একষট্টি বছর পরেও তাঁর ঐ স্নেহ-ভালবাসা মনে করে তাঁর প্রতি একটা অগাধ ভক্তি সব সময়েই মনে জেগে ওঠে। জানি না, ছাত্রী-শিক্ষয়িত্রীর সেই সরল সম্পর্ক এখনকার দিনে কতখানি বিদ্যমান। অথচ তিনি ছিলেন মেমসাহেব, আর আমরা ছাত্রীরা ছিলাম বাঙালী ও খাসিয়া। তবুও বিদেশী বলে কোন তফাৎ ছিল না।

মিস্‌ জোন্‌স্‌-এর কথা লিখতে লিখতে মনে পড়লো আমাদের প্রাইভেট্‌ টিউটার দক্ষিণাবাবুর কথা।

আমার ও পুঁটুর জন্য একজন প্রাইভেট টিউটার ঠিক করা হয়। কারণ স্কুলের

পড়ায় আমাদের কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল—সেজন্যে। তিনি রোজ বিকেলে এসে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের পড়াশুনা দেখে যেতেন। তিনি পড়া বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন কথা কইতেন না, হাসতেনও না। রোজ এসে গম্ভীরভাবে আমাদের গড়গড় করে পড়া বলে দিয়ে চলে যেতেন।

এর মধ্যে শুনলাম যে শিলং-এ একটা এরোপ্লেন আসবে ও সেটা পোলো গ্রাউন্ডে নামবে। যেদিন আসবার কথা সেদিন ছিল শনিবার—স্কুল ছুটি। আমরা প্রায় সারাদিন পোলো গ্রাউন্ডে গিয়ে অপেক্ষা করে করে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। সেদিন আর এরোপ্লেন এলো না। তার দুদিন পর আমরা স্কুল থেকে ফিরে সবেমাত্র খাওয়াদাওয়া সেরেছি, হঠাৎ আকাশে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি একটা এরোপ্লেন উড়ে পোলো গ্রাউন্ডের দিকে চলে গেল। আমি আর পুঁটু তখুনি দৌড়তে দৌড়তে ওদিকে রওয়ানা হয়ে যেখানে এরোপ্লেন নেমেছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু লোকে লোকারণ্য, অসম্ভব ভীড় ; কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘন কালো মেঘ করে আসছে। দু'বোনে তাড়াতাড়ি বাড়ি রওয়ানা দিলাম। কিন্তু মাঝপথেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। এত বৃষ্টি যে চলতে পারি না। কোনক্রমে স্যানাটরিয়ামের সামনে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ দেখি স্যানাটরিয়ামের বারান্দা থেকে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। আমরা দুজনে গেলাম। আমরা ওরকম ভিজেছি দেখে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ঘরে আগুন জ্বলছিল তার পাশে নিয়ে বসালেন। তারপর বাড়ি কোথায়, কোথায় পড়ি, বাবার কি নাম সব জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। বাবার নাম শুনে ও বাড়িও খুবই কাছে জেনে বললেন, 'আমি এখানে আসার পরই তোমাদের বাবার কথা শুনেছি এবং এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যাবো ভাবছি।'

বৃষ্টি যখন প্রায় থেমে এলো, আমরা ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি রওয়ানা হলাম। রাস্তায় বের হয়ে পুঁটুকে বললাম, 'বাড়ি গিয়েই তো দেখবো দক্ষিণাবাবু ঠিক এসে বসে আছেন।' পুঁটু বললো, 'এই এত বৃষ্টি ঠেঙিয়ে কি আর আসবেন ?' বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র বাবা বলে উঠলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ? দক্ষিণাবাবু তখন থেকে এসে বসে আছেন, বৃষ্টিতে তাঁর কাপড়চোপড় সব ভিজে গিয়েছে। শীগগিরি তাঁকে হাত পা মুছবার জন্য পরিষ্কার তোয়ালে দাও এবং ট্রাঙ্ক থেকে বের করে তাঁকে আমার ধুতি, জামা ইত্যাদি দাও। ভিজে কাপড়ে থাকলে তাঁর অসুখ হবে।' আর এদিকে আমার ও পুঁটুর শাড়ি জামা যে জলে সপ্‌সপ্ করছে তার বেলায় বাবার কোন ভ্রূক্ষেপও নেই। আমরা দুজনে ফিস্‌ফিস্ করে গজরাতে থাকলাম।

১৯২৬ সনের জুলাই মাসে ওয়েল্‌স্ মিশন হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার কয়েকমাস পরেই মেজদির বিয়ে ঠিক হলো এবং নভেম্বর মাসে আমরা সকলে এক মাসের জন্য কলকাতা গেলাম। মেছুয়াবাজারে একটা বড় বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। বাড়িটা ছিল এটর্নী চারু বোসের। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় তাঁর ছেলে গোবরা বোস

মুসলমানদের দিকে বন্দুক ছুঁড়ে মারায় বেশ মুশকিলে পড়ে যাওয়ার দরুন তাঁরা ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। বাড়িটা ছিল মেছুয়াবাজার ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের কোণায়।

আমাদের যাওয়ার খবর পেয়েই দাদাবাবু (প্রকৃতিকুমার ঘোষ) তাঁর সাইড্‌কারসুদ্ধ মোটরবাইক নিয়ে এসে প্রায়ই আমাকে ও পুঁটুকে কলকাতার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আনতেন। সেবারেও স্নেহদি ধুবড়ী থাকায় মেজর্দিরও বিয়ে তাঁর দেখা হল না।

মেজদির বিয়েতেও যাবতীয় জিনিসপত্র সব একেবারে দিদির মতই হলো। বরযাত্রী সকলে কুমিল্লা থেকে এসেছিলেন তবে এই ভগ্নিপতি থাকতেন বর্মা দেশে। তিনি বেসিন শহরে ওকালতী করতেন।

বিয়ের পর কলকাতা থেকে ফিরে আসার পরই বার্ষিক পরীক্ষা। আবার একমাস পড়ায় কিছু ক্ষতি হওয়াতে মিস জোন্‌স্ বললেন, আসল বিষয়গুলি পরীক্ষা দিলেই হবে। বাইবেল, বটানি, হাইজিন এসব পরীক্ষা দেবার দরকার নেই।

প্রমোশন হয়ে গেল, তারপর ক্রীসমাসের ও শীতের ছুটির পর খুব তোড়জোড় করে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা দেওয়ার পরেই কয়েকমাসের মধ্যে টাইপিং বেশ ভাল শিখে ফেললাম। বাবার এক খাসিয়া বন্ধু টনরায়ের ছেলে কেলেন্‌, আমার চেয়ে সামান্য বড় বয়সে, প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতো। সে খুব ভাল টাইপিস্ট ছিল। একদিন মা কেলেন্‌কে বললেন, 'এমনি বসে বসে গল্প করে সময় নষ্ট না করে টুনুকে টাইপ করা শিখিয়ে দে।' মা ইংরেজী জানতেন না, সেজন্য কেলেনের সঙ্গে খাসিয়া ভাষাতেই কথা কইতেন। আমরা ইংরেজী ও খাসিয়া দুটোই বলতাম।

যেই বলা সেই কাজ। পরদিনই কেলেন্ তার নিজের টাইপরাইটারটা নিয়ে এসে হাজির। আমিও সমানে খট্‌খট্ টাইপ করা অভ্যেস করতে লাগলাম। মাসতিনেকের মধ্যে শুধু যে শিখে ফেললাম তাই-ই নয়, স্পিডও বেশ ভাল হয়ে গেল। আর সবচেয়ে ভাল হলো 'টাচ্ মেথড্'-এ শিখতে পারায়। টাচ্ মেথড্‌টা হলো একেবারে না দেখে আঙুল চালিয়ে যাওয়া।

টাইপ করতে পারতাম বলে আমি বরাবর, ওঁর লেখা যুদ্ধের খবর দিয়ে ১৯৪১/৪৩ সনে যে দুটি সাপ্তাহিক কাগজে পাঠাতেন—একটা বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের 'বেঙ্গল উইক্‌লী' ও আরেকটার নাম ছিল 'ক্যাপিট্যাল', সেগুলি টাইপ করে দিতাম। এমন কি ১৯৪২ সনে কলকাতা থেকে দিল্লী চলে আসার পরও ভাল টাইপিস্ট না পাওয়া পর্যন্ত আমাকেই সব লেখা টাইপ করে ডাকযোগে পাঠাতে হত।

॥ ৫ ॥

কলেজে পড়া—সিটি কলেজ, কলকাতা

ম্যাট্রিক তো পাস করে গেলাম ভালই। কলেজেও পড়তে যাবো বলে ঠিকই ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই বাবাকে বললাম, কলকাতার কলেজে সিটের জন্য লিখে

সব খোঁজখবর নেবার জন্য। বাবা বললেন, 'এত তাড়া কিসের ? আগে তো পরীক্ষার ফল বের হোক।' তারপর পরীক্ষার ফল জানার পর যখন বাবা বেথুন কলেজে ভর্তির জন্য চিঠি লিখলেন, তার উত্তরে তারা জানালো সব সিট্ ভর্তি হয়ে গ্যাছে। তারপর ডায়োসেসনেও চেষ্টা করা হলো, তারাও ঐ একই কথা জানালে। তারপর এদিক-ওদিক লেখার পর জানা গেল যে তখন সিটি কলেজে মেয়েদের ভর্তি করছে।

সিটি কলেজে সেই সময়ে খুব গণ্ডগোল চলছিল। সরস্বতী পূজোতে হিন্দু ছাত্রেরা ব্রাহ্ম হস্টেলে পূজো করতে আরম্ভ করায় কর্তৃপক্ষ বাধা দেন। তাতে বহু হিন্দু ছাত্র ধর্মঘট করে। সেই সময় কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে, মেয়েদের ভর্তি করা হবে এবং তাদের সব রকমে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, আর এও ঠিক হল যে কেউ হস্টেলে থাকতে চাইলে বিডন স্ট্রীটের ব্রাহ্ম হস্টেলে তাকে সিট দেওয়া হবে। বাবা বললেন, 'চল, আমি নিজে গিয়েই তোকে সিটি কলেজে ভর্তি করে দিয়ে আসি আর ঐ বিডন স্ট্রীটের ব্রাহ্ম হস্টেলে থাকার সব বন্দোবস্ত রাখবার জন্য চিঠি লিখে দিই।'

দিদি মেজদিকে বিশেষ করে মেজদিদিকে কলেজে পড়াবার খুবই ইচ্ছা ছিল মায়ের। কিন্তু তখনকার দিনে কলকাতায় নতুন জায়গায় একা একা পাঠাতে সেরকম সাহস করেননি।

দু'-দু'বার কলকাতা ঘুরে যাওয়াতে এবং আড়াই বছর ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের বোর্ডিং-এ আমাকে রেখে, মা ও বাবা দুজনেরই মনের জোর অনেক বেশী দেখা গেল। তখন আবার আমার কলকাতায় কলেজে পড়তে আসা বেশ সহজভাবেই নিলেন।

আবার দিনক্ষণ দেখে বাবা আমায় সঙ্গে নিয়ে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কলকাতা পৌঁছে এবারে আমরা ভবানীপুরে দিদির ননদ সুরমাদির বাড়ি উঠলাম। পরদিন সকালে তৈরী হয়ে আমরা দুজনে ট্যাক্সিতে আমার ট্রাঙ্ক, বিছানা ইত্যাদি সব নিয়ে, প্রথমে ৭৮ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে অজিতবাবুর বাড়ি গেলাম। এই বাড়িতে একসময়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু মোহিত সেন থাকতেন। সেখানে জিনিসপত্র রেখে কাছে বলেই হেঁটে সিটি কলেজে গেলাম।

সেই সময়ে হেরম্ব মৈত্র মহাশয় ছিলেন সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। বাবা আমায় ভর্তি করতে নিয়ে গিয়ে হেরম্ববাবুর সঙ্গে দেখা করে পরিচয় দিলেন, 'আমি সচ্চিৎ সরকারের শ্বশুর।' 'সচ্চিৎ সরকার' নাম শুনেই হেরম্ববাবু বিশেষ উৎসাহিত কয়ে বললেন, আরে ! আমাদের সচ্চিৎ তাহলে আপনারই মেয়েকে বিয়ে করেছে। সচ্চিতের বাবা মহেন্দ্রদা আমার নিজের বড় ভাইয়ের মত ছিলেন। আমরা বরাবর একসঙ্গে থেকে বড় হয়েছি।' দিদির শ্বশুরমশায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন এবং বড় ছেলে অজিত সরকার ও একমাত্র মেয়ে সুরমা দুজনেরই বিয়ে ব্রাহ্মমতে দেন। কেবল ছোট ছেলে হিন্দুমতে আমার দিদিকে বিয়ে করলেন। আগেই বলেছি যে, বিয়ের দিন হরতাল ছিল, তাই হেরম্ববাবু তাঁর প্রাইভেট ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে বরের বিয়ে করতে যাবার ব্যবস্থাদি করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু বিয়ে বলে তিনি যোগ দেবার জন্য আসেন নি।

হেরম্ববাবু ও বাবা দুজনে মিলেই নানারকম আলাপ-সালাপ করার পর আমাকে

তাঁর কলেজে ভর্তি করার সঙ্কল্প শুনে খুবই খুশী হলেন এবং তখুনি কলেজ অফিসে গিয়ে আমায় ভর্তি করে নেবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

কলেজ থেকে বের হতে যাবো এমন সময় নামলো মুষলধারে বৃষ্টি, দেখতে দেখতে রাস্তায় জল জমে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা গেল যে আর হেঁটে শীগগির রাস্তা দিয়ে চলা যাবে না। তখন একটা রিকশা ডেকে কোনক্রমে বাবা ও আমি অজিতবাবুর বাড়ি গেলাম। সেখানে বিকেল পর্যন্ত থেকে রাস্তার জল কমে গেলে একটা ট্যাক্সি ডেকে আমার জিনিসপত্র নিয়ে বিডন স্ট্রীটের হস্টেলে গেলাম। সেখানে সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে বাবা আমায় রেখে ভবানীপুরে ফিরে গেলেন।

হস্টেলে ঢুকেই পুরনো বন্ধু রাণুকে দেখতে পেলাম প্রথম। সে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছিল। ওকে দেখে খুবই আনন্দ হলো। দু'বছরের মধ্যে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, আমি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল ছেড়ে শিলং স্কুলে ভর্তি হওয়ার দরুন। দোতলায় উঠে স্টাডিরুমে গিয়ে পুরনো পরিচিত সব ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের মেয়ে সুরভিদি, প্রমীলাদি, পাখীদি, বেলা এদের দেখতে পেলাম। আবার সবাই মিলে একত্র হওয়ায় বেশ একটা হৈচৈ পড়ে গেল। হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুনীতিদি কোনটা বেডরুম, কোনটা ড্রেসিংরুম সব দেখিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে বিছানা, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি রাখিয়ে দিয়ে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন সন্ধ্যের খাওয়া খাবার জন্য।

হস্টেলে ফার্স্ট ইয়ারের আমরা পাঁচটি ছাত্রী ছিলাম। শুধু আমিই ছিলাম সিটি কলেজের আর বাকি চারজন বেথুন কলেজের। দোতলার একটা বড় ঘরে আমাদের পাঁচজনের পাশাপাশি খাট ছিল শোবার জন্য। প্রথম রাতেই বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলাম বলোহরি, হরিবোল বলে কারা যেন ভীষণ চেঁচিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আমি পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ রকম চেঁচাচ্ছে কারা ?' সে বললে, 'মড়া নিয়ে যাচ্ছে নিমতলা ঘাটে পোড়াতে।' এর আগে আর কোন মরা মানুষ নিয়ে যেতে দেখিনি, সেজন্য একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তারপর রাতদিনই ক'বার করে এই হরিধ্বনি শুনতে পেতাম। কলকাতার দক্ষিণ দিক থেকে নিমতলাঘাটে যাবার এই বিডন স্ট্রীটই প্রধান রাস্তা। গভীর রাতে এই হরিধ্বনি শুনলেই মেয়েরা, 'ওরে বাবা !' বলে মাথার ওপরে চাদর বা লেপ ঢাকা দিত।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পরদিন বাবা আমার বইপত্র সব কিনে এনে দিয়ে গেলেন এবং সময় দেখবার সুবিধার জন্য একটা 'রিস্টওয়াচ'ও কিনে দিয়ে শিলং ফিরে গেলেন।

সিটি কলেজ ও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল দুই-ই ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ যাওয়া-আসার ব্যবস্থা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করে নিলেন যে, প্রতিদিন সকালে দূরের মেয়েদের স্কুলের বাস কলেজে নিয়ে আসবে এবং বিকেলে পৌঁছে দেবে। বিডন স্ট্রীট থেকে সিটি কলেজ বেশ দূরে। সেজন্য ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের বাসের সঙ্গেই আমার কলেজে যাওয়ার ও আসার ব্যবস্থা হলো। বাস্ আমায় কলেজে

নিয়ে যাবার জন্য সকাল নটার সময় আসতো এবং বিকেলে ফিরে আসতে পাঁচটা বেজে যেতো।

প্রথম দিন যখন কলেজে গিয়ে আমাদের মেয়েদের কমনরুমে ঢুকেছি, দেখি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের কয়েকজন পুরনো সহপাঠিনী পূর্ণিমা বসাক, মালতী দাসগুপ্ত, সুনীতি দাস এরা সবাই রয়েছে। আমায় দেখেই চেঁচিয়ে বললে, 'অমিয়া ! কোথা থেকে এসে আবার উদয় হলে ? দু বছর ধরে কোথায় লুকিয়ে ছিলে ?' আমি আবার শিলং-এ থেকেই পড়ছিলাম সেসব খবর দেওয়ার পর মালতী বললে, 'আমরা তো ভাই মনে করলেম বোধ হয় বে-শাদি হয়ে গেছে।' তারপর সে সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে বললে, 'তুমি যে ভাই একেবারে মেমসাহেব বনে গেছ।' আমার শিলং-এর অভ্যেসমত পায়ে সূক্ষ্ম সিল্কের মোজা (গায়ের চামড়ার সঙ্গে রং মেলানো) ও হাই-হিলের জুতো ছিল এবং চুলও হাফ-বিনুনী করা রঙীন চওড়া সিল্কের ফিতের বো করে বাঁধা। সে আবার বললে, 'এসব পোশাকে তোমার ক্লাস করা সুবিধে হবে না। ঐ খুরো দেওয়া জুতো পরে সিঁড়ি ওঠানামা করবার সময় পিছলে পড়ে পা মচকিয়ে মরবে। আর তোমার ঐ চুলের ফিতে যদি কেউ টান দিয়ে খুলে দেয় তো বুঝবে মজা।'

মালতী বরাবর সবাইকে খুব হাসিয়ে কথা কইত। সে আবার বললে, 'ঐ লম্বা চুলের বিনুনী না বেঁধে আমার মত খোঁপা বাঁধলেই মানাবে ভাল, এখন আর স্কুলের মেয়েটি নও তুমি।'

কয়দিন ক্লাসে যাওয়া-আসা করার পর সত্যিই দেখলাম ঐ সিমেন্টের পিছল মেঝে ও সিঁড়ি দিয়ে চলাফেরা করা বেশ বিপজ্জনক। এ ছাড়া কানে এলো ছেলেদের মধ্যে আলোচনা—'খ্রীষ্টান নাকি রে ! জুতো-মোজা পায়ে দেয় কেন ?' হাই-হিলের জুতো ছেড়ে সকলের মত নাগরা জুতো পায়ে দেওয়া শুরু করতে হল।

আমি, মালতী ও থার্ডইয়ারের দুই-একজন মেয়ে ছিলাম হিন্দু, আর বাকি সবাই ছিল ব্রাহ্ম। আর শুধু আমি একা হস্টেলে থাকতাম, অন্যরা সকলে বাড়ি থেকে আসতো এবং সকলের বাড়িই কলেজের কাছাকাছি ছিল।

প্রথম প্রথম কলেজের ক্লাস ঠিকমত আরম্ভ হওয়ার আগে প্রায়ই চামেলীদি (জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী) মেয়েদের কমনরুমে এসে আমাদের সুবিধা-অসুবিধা সব তদারক করে যেতেন। একদিন এসে সব মেয়েদের ডেকে একত্র করে বললেন, 'হেরম্ববাবু আদেশ করেছেন যে ছাত্রীরা যেন গায়ে চাদর জড়িয়ে আসেন।' শুনেই আমরা সকলে মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। আমরা বললাম, ছাত্রীরা সকলেই বেশ শালীনভাবে পোশাক করে আসে, ঐ চাদর জড়িয়ে সঙ সাজবার কোন মানে হয় না। আমরা কেউ কেউ পার্শি মেয়েদের ফ্যাসানে শাড়ি পরতাম, আর কেউবা আঁচল ঘুরিয়ে এনে কাঁধে পিন দিয়ে আটকে রাখতো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো তখনকার আধুনিকারা যেভাবে সামনে কুঁচি দিয়ে পেছনদিকে আঁচল ঝুলিয়ে শাড়ি পরতো, সবাই সেইভাবে শাড়ি পরে আঁচলটা দিয়ে পিঠ ঢেকে রাখবে। তখনকার দিনে গায়ের ব্লাউজও অন্য

রকমের হত। এখনকার মত গা-খোলা জামা নয়।

সেই সময়ে ব্রাহ্মই হোক বা খৃস্টানই হোক সকলেই খুব রক্ষণশীল ছিলেন। হিন্দুর তো কথাই নেই। মায়েদের যুগে দেখেছি তাঁদেরও একটি করে পাতলা মিহি সাদা কাপড়ের চারদিকে লেস বসানো চাদর থাকতো, জায়গাবিশেষে গায়ে জড়াবার জন্য। ওঁর কাছে শুনেছি আমার শাশুড়ী ঠাকরুনেরও ঐরকম লেস-বসানো চাদর ছিল। আমি প্রথম যখন কলকাতায় এলাম, তখনও দেখেছি বহু হিন্দু-ভদ্রমহিলা বাড়ি থেকে বার হবার সময় চাদর জড়িয়ে নিতেন গায়ে। ক্রমশঃ সে চলন উঠে গেল।

সকালে কলেজে ক্লাস আরম্ভ হবার আগে প্রায়ই হেরম্ববাবু কলেজের হলঘরে উপাসনা করতেন এবং তারপর নানারকম নীতিকথা বা বড় বড় লেখক কি লিখেছেন সেসব পড়ে শোনাতেন। কারলাইল এবং এমার্সন এই দুজন তাঁর খুব প্রিয় ও শ্রদ্ধার লেখক ছিলেন। বরাবর তাঁদের লেখার উল্লেখ করে জায়গা জায়গা থেকে পড়ে শোনাতেন ও ব্যাখ্যা করতেন।

আমরা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের পুরনো সহপাঠিনীরা সকলে একত্র হওয়ায় বেশ একটা সুন্দর পরিবেষ্টনী সৃষ্টি হলো। যে যার বিষয় ক্লাস করে অবসর সময়ে কমনরুমে বসে সবাই মিলে খুব হাসি, খোসগল্প হতো। আমাদের মেয়েদের বসবার জন্য আলাদা কমনরুম ছিল। যখন যে-বিষয়ের ক্লাস হতো প্রফেসারেরা এসে ছাত্রীদের ডেকে সঙ্গে করে ক্লাসে নিয়ে যেতেন এবং পড়ানো হয়ে গেলে, আবার সঙ্গে করে কমনরুমের দোর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতেন।

ক্লাসের পড়া শুরু হল। লক্ষ্য করলাম এক-একজন প্রফেসারের পড়ানোর কায়দা এক-এক রকম। কেউ কেউ এমন সুন্দরভাবে পড়ে বুঝিয়ে দিতেন যে, বিষয়টা একেবারে মনে গেঁথে যেত ও চোখের সামনে তার একটি ছবি সৃষ্টি হতো। আবার কেউ কেউ আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু বুঝছি কি না বুঝছি কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের নিজের মতো গড় গড় করে তাঁর যা বক্তব্য তাই বলে যেতেন।

প্রফেসার পি. বি. ব্যানার্জি বলে আমাদের যিনি ইংরেজী কবিতা পড়াতেন, তাঁর পড়ানোর ভঙ্গী এত সুন্দর লাগতো যে, আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পড়ানো শুনতাম ও সপ্তাহে কবে তাঁর আবার ক্লাস আসবে সেই অপেক্ষায় থাকতাম। এখনও মনে পড়ে তিনি প্রথম যেদিন পড়ানো আরম্ভ করলেন, শুরু করলেন অয়ার্ডসওয়ার্থের 'আপন্ ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রীজ' এই সনেটটি দিয়ে। এত ভাল লাগলো যে, মনে হল সেই বিশাল ব্রীজ-এর সকালের দৃশ্য দেখছি। যে বছরে প্রথম বিলেত এলাম, এই সনেটটি পড়ার চল্লিশ বছর পর, লন্ডনে পৌঁছানো মাত্র ওঁকে বললাম, আমায় সব কিছুর আগে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রীজ দেখাতে নিয়ে চলো।

কীট্‌স্-এর 'ওড টু অটাম্' পড়াবার সময়েও তাঁর ব্যাখ্যার রং-তুলি দিয়ে যেভাবে একটা কাল্পনিক ছবি এঁকে দিলেন চোখের সামনে, সেই 'অটামে'র কুয়াশাচ্ছন্ন দিন, আপেল থেকে সাইডার তৈরী হওয়ার সমস্ত দৃশ্য, চাক্ষুষ দেখে মনে হলো—কোনই তো তফাৎ নেই এবং বিলেতের এই 'অটামে'র দৃশ্য দেখলে পরেই প্রফেসার ব্যানার্জির

সুন্দর গলার আওয়াজ ও উচ্চারণের ভঙ্গি কানে বাজে। তিনি অনেক কবিতাই পড়িয়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও কতকগুলি কবিতা যেন নিজের জীবনের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে। আমরা অক্সফোর্ডসায়ারের হুইট্‌লী গ্রামে কিছুদিন ছিলাম। বসন্তকালে কোকিল যখন ডাকা শুরু করলো, সেই ডাক কোন্‌দিক থেকে আসছে, কোকিল কোথায় আছে দেখবার জন্য আমিও গ্রামের জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে কবিতা পড়ানো শুনে কি রকম মানসচক্ষে কল্পনা করে কোকিল খুঁজেছিলাম বার বার মনে হয়েছে।

আরেকটা কবিতারও বেশ সত্যিকার উপলব্ধি হলো। সেটা হলো ম্যাথিউ আরনল্ডের 'স্কলার-জিপ্‌সি'। তিনি যখন জোরে জোরে কবিতাটি পড়ে যেতেন, তখন যেন মনে হতো অক্সফোর্ডের টাওয়ারগুলির ওপর আগস্ট মাসের মৃদু রোদ পড়ছে এবং ঘন শস্যের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে লাল বুনো পপি ফুল দেখা যাচ্ছে কিম্বা নীল কন্‌ডল্‌ভিউলাস্‌ ফুলের লতা জড়িয়ে চলেছে, একেবারে চোখের সামনে সব দেখছি। এখনও যখন সত্যিকার এ দৃশ্যগুলি চোখে দেখি, তখন মনে হয় যে, কতদিনের পুরানো মানসিক দৃশ্যই আবার চোখে যেন দেখছি।

আরেকজন প্রফেসার পড়াতেন আমাদের স্যার ওয়াল্‌টার স্কট্‌-এর 'লে অব দি লাস্ট মিনস্‌ট্রেল'। তিনি আবার পড়াতেন নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, হৈচৈ গণ্ডগোল করে। কোন কোন জায়গায় যেখানে যোদ্ধারা ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে সেইখানটা পড়াতে গিয়ে তিনি নিজেই প্ল্যাটফরমের ওপর চেয়ারে বসে দু হাতে কাল্পনিক ঘোড়ার বল্‌গা ধরে পা জোরে জোরে নাচিয়ে, ঘোড়ার পায়ের খুরের আওয়াজের শব্দ মুখে কপাকপ্‌, কপাকপ্‌ করে চেঁচিয়ে সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে তুলতেন। তবে তাঁর পড়ানোও বেশ মজার, হাসির হলেও কখনও ভুলে যাবার মত নয়। তিনি 'স্টারলিং কাস্‌ল' বিষয়েও যা পড়িয়েছিলেন—কি রকম হতো না হতো, হুবহু এক রকম দেখলাম যখন ১৯৭৮ সনে স্টারলিং গেলাম ওঁর 'ডক্টরেট' উপাধি গ্রহণের অনুষ্ঠানে। অবাক হয়ে গেলাম দেখে যে কিছুমাত্রও বদলায় নি।

যিনি বাইবেল-এর 'সারমন অব দি মাউন্ট' পড়াতেন, ক্লাসে এসে কেবল রিডিং পড়ে যেতেন। শিলং স্কুলে বাইবেল পড়ায় ওতে আর বিশেষ মনোযোগ দিতাম না।

বটানি, লজিক ও সিভিক্স এই তিনটা বিষয় নিয়েছিলাম পড়ার জন্য। এর মধ্যে বটানি বিষয়টা পড়তে খুবই ভাল লাগতো। তাছাড়া শিলং ওয়েলস্‌ মিশন হাইস্কুলে বটানি পড়ার দরুন বিষয়টা বেশ খানিকটা জানা ছিল ও সহজও মনে হত।

ছেলেবেলা থেকে গাছ, পাতা, ফুল এসবের কথা জানবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্যও ছিল। ছবি আঁকার ওপরও বরাবর ঝোঁক ছিল, বটানি পড়তে গিয়ে প্রচুর ছবি আঁকতে হতো, তাও খুবই ভাল লাগতো। বলতে গেলে বটানি বিষয়টা একটা নেশার মত করে পড়তাম এবং আর্টস ও সায়েন্স-এর ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পরীক্ষায় প্রথম হতাম। শ্রীযুক্ত হেমেন মুখার্জি মশায় আমাদের বটানি পড়াতেন। অসাধারণ তাঁর পড়াবার ভঙ্গি ছিল। একবার যা ক্লাসে পড়িয়ে দিতেন সেটা আর কখনও ভোলা যেত না। বটানির ল্যাবরেটরীর ক্লাস করতেও খুব ভাল লাগতো। সপ্তাহে একটি দিন মাত্র

আমাদের এই ক্লাসটি হত কিন্তু আবার কবে এই ক্লাস হবে সমানে দিন গুনতাম। মাইক্রোস্কোপ-এর নীচে পাতার উল্টোদিকে গাছের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য দুটো দুটো করে ছোট ফুটোমত চিহ্ন দেখে, কিম্বা সূর্যমুখী ফুলের পাঁপড়ির নীচে আবার আরেকটি পাঁপড়ি রয়েছে সেটা দেখার পর যেন ক্রমশই উৎসাহ আরও বেড়ে চললো। আরেকদিন যখন কুমড়োর ডগা খুব পাতলা করে ক্ষুর দিয়ে কেটে দেখানো হল যে, ঐ পাতলা কাটা টুকরো ঠিক মানুষের মাথার খুলির মত দেখায়, একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লাম।

বটানির প্রতি বিশেষ ঝোঁক ওঠে যখন ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়ি তখন থেকেই। আমাদের স্কুলের উল্টোদিকে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর প্রকাণ্ড বাড়ি ও বোস ইনস্টিটিউট দেখতে গিয়ে লজ্জাবতী লতা ছুঁলে পর সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে সব পাতা বুজে যায় এবং আবার আস্তে আস্তে খোলে দেখে প্রকৃতির অদ্ভুত রহস্যসীলার পরিচয় ভাল করে জানবো বলে তখুনি মন স্থির করে ফেলেছিলাম যে, এই বিষয় নিয়ে আমাকে পড়াশুনা করতেই হবে।

'সিভিক্স্' ও 'লজিক' এই দুটো বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না। অথচ সায়েন্স না পড়লে আর অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে বটানি নেবার উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে এই দুই বিষয় নিতে হল।

আমাদের 'সিভিক্স্' পড়াতেন শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছোট পুত্র শ্রীযুক্ত অশোক চ্যাটার্জি। হিরণবাবুর কথা বলতে হলে সবাই তাঁর ডাকনাম হাবুলবাবু বলেই উল্লেখ করতো। তিনি বেশ হাত নেড়ে নেড়ে হেসে হেসে পড়াতেন। শুনতে ভালই লাগতো তাঁর লেকচার। কিন্তু 'সিভিক্স্' ও 'লজিক' দুটো বিষয়ই পড়ার সময় মনে হত জোর বিস্বাদ, তেতো জ্বরের ওষুধ গেলানো হচ্ছে, পড়ানোর পরেই সব মুহূর্তের মধ্যে ভুলে যেতাম। একদিন 'সিভিক্স্' ক্লাসের পর হাবুলবাবু যখন আমাদের ভেড়ার পালকে খেদিয়ে নেওয়ার মত করে আমাদের কমনরুমের দরজা পর্যন্ত এসেছেন, তখন তাঁকে বললাম, 'আজ যে কি পড়ালেন এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না।' তিনি একগাল হেসে বললেন, 'এই রে ! মাটি করেছে, কাল আবার নতুন করে ওটাই পড়াতে হবে।'

অশোকবাবুর ক্লাসে আমরা পড়ানো শুনবো, না ভদ্রলোককে দেখবো ভেবেই পেতাম না। ভদ্রলোক দেখতে যেমনি সুপুরুষ ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর পোশাকের বাহার। গরমের দিনে গায়ে দিয়ে আসতেন ফিনফিনে মসৃণ ধবধবে সাদা রং-এর আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবি, কালো সুন্দর পাড়ের শান্তিপুরে ধুতি, আর অতি পাতলা সোনালি জরির পাড় ও চওড়া আঁচল দেওয়া উড়ানী গলায় জড়ানো, আর শীতকালে ধুতির সঙ্গে থাকতো গরদের পাঞ্জাবি ও খুব সূক্ষ্ম কারুকার্য করা অতিশয় দামী কাশ্মিরী পস্‌মিনা দোরোখা শাল। আবার কোন কোন দিন বিলিতি পোশাক 'সুট' পরে পুরো সাহেব সেজে আসতেন। ঐ বিলাসিতার রকমারি পোশাক দেখে তাঁর কথা কোন সময়ে উল্লেখ করতে হলেই আমরা 'জামাইবাবু' আখ্যা দিয়ে করতাম। অশোকবাবু

বছরখানেক পড়িয়ে ছেড়ে দেন, শুনলাম তিনি সস্ত্রীক বিলেতে গেছেন। তখন সিভিক্স্-এর ইকনমিক্স-এর অংশটা পড়াতে এলেন শ্রীযুক্ত অরুণ সেন মশায়। তিনিও বছরখানেকের মধ্যে বিলেতে যান এবং সেই সময়ে আমার বিশেষ বন্ধু রাণুকে বিয়ে করেছিলেন।

অন্যান্য প্রফেসাররা কেউ কেউ ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন এবং সকলেই একটা পাতলা চাদর হয় গায়ে জড়াতেন কিম্বা কাঁধে ফেলে আসতেন। আর যাঁরা ইংরেজী পড়াতেন, অধিকাংশই প্যান্টের সঙ্গে গলাবন্ধ লম্বা চীনেকোট গায়ে দিয়ে আসতেন। হেরম্ববাবুও এই পোশাকই পরতেন। লজিক পড়াতেন দুজন প্রফেসার মিলে। দুজনেই ধুতির ওপর শার্ট, কোট ও কাঁধে একটি ভাঁজ করা সিল্কের চাদর ব্যবহার করতেন। শুধু যে পণ্ডিতমশাই বাংলা পড়াতেন, তিনি একটা আধময়লা কোঁচকানো দড়ির মত পাকানো মান্ধাতা আমলের চাদর কাঁধের ওপর ফেলে রাখতেন। আমরা তাঁর এই দড়ি পাকানো চাদর দেখে হাসাহাসি করে বলাবলি করতাম যে, রোজ কলেজে আসবার সময় ঐ দড়ি পাকানো চাদর কলসীর ভেতর থেকে বের করে কাঁধে করে নিয়ে আসেন, আবার বিকেলে বাড়ি ফেরত গিয়ে কলসীতে পুরে রাখেন।

কলেজে ঢোকার প্রায় মাস চারেকের মধ্যেই পূজোর ছুটি এসে গেল। আমাদের হস্টেলে আমরা আসামের দিকের প্রায় পাঁচ-ছয়জন ছাত্রী ছিলাম। খবর নিয়ে জানা গেল যদি পাঁচজন একসঙ্গে হওয়া যায় স্টুডেন্ট কন্‌শেসন্ পাওয়া যায়। তাতে রেলে যাতায়াতের জন্য অর্ধেক দামে একটা 'পাস্' দেয় এবং ঐ সঙ্গে আরেকজন যে কেউ 'এস্কোর্ট' হিসেবে যেতে পারে। খোঁজখবর করে ফর্ম আনিয়ে, সকলের নামধাম সব লিখে ওই ফর্মটা হস্টেলের একটি ছোকরা-বেয়ারা শিবরামকে দিয়ে কয়লাঘাটা রেলওয়ে আপিসে পাঠিয়ে 'পাস্' আনিয়ে নেওয়া হলো। আমরা সকলেই পাণ্ডুঘাট স্টেশন পর্যন্ত একসঙ্গে যাবো। তারপর সকলেরই যার যার গন্তব্য স্থান—কেউবা গৌহাটি, কেউ শিবসাগর, কেউবা ডিব্রুগড়, আমি শিলং, সবারই যাবার ব্যবস্থা করতে হলো। শিয়ালদহ স্টেশনে সকলে একত্রে যাওয়ার পর গার্ড এসে আমাদের গাড়ি দেখিয়ে দিয়ে দরজায় প্রকাণ্ড ছাপার অক্ষরে লেখা 'রিজার্ভ ফর সিক্স স্টুডেন্টস্' একটা কার্ড ঝুলিয়ে দিয়ে গেল।

তখন ইন্টার ক্লাসের ভাড়া ছিল কলকাতা থেকে পাণ্ডুঘাট পর্যন্ত দশ টাকা। আমার কন্‌শেসন পাওয়ার দরুন আমাদের অর্ধেক মাশুলে দশ টাকায় যাওয়া ও আসার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াতে সকলেই খুব আনন্দ বোধ করলাম।

আমাদের একই ট্রেনে পুণ্যব্রত—আমাদের বিশেষ পরিচিত বাবার বন্ধুর ছেলে ও আরেকটি শিলংএর ছাত্র অন্য গাড়িতে উঠলো। ওরাও পড়তো আমার সঙ্গে তবে অন্য কলেজে। পাণ্ডুঘাট পর্যন্ত সবাই একত্র গিয়েই আমরা সকলে যার যার পথে আলাদা হয়ে গেলাম। আমি, পুণ্যব্রত ও অন্য ছেলেটি এই তিনজনে মোটর মেইল গাড়িতে চড়ে বসলাম। এই গাড়ি রাত দশটায় শিলং পৌঁছায়। মোটর স্টেশনের পেছনেই আমাদের বাড়ি। স্টেশনে পৌঁছে দেখি বাবা বেনোয়ারী মালিকে নিয়ে অপেক্ষা

করছেন। তিন চার মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছেই আবার যেন একটা স্বস্তির ভাব এল।

পূজোর কাপড় কিনে নিয়ে যাবার জন্য বাবা আমায় পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি মা ও আমাদের চার বোনের জন্য এক-একজনের এক-একরকম রংএর পাড়ের তসর শাড়ি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা পেয়ে সবাই খুবই খুশী।

দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে এলো। কালীপূজোর পরেই আমরা পাণ্ডুঘাট এসে আবার পূর্বসহচরীরা সকলে একত্র হয়ে রিজার্ভ করা গাড়িতে কলকাতা ফিরলাম।

তার কিছুদিন পরেই ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের খুব তোড়জোড় আরম্ভ হল। বাবাকে কংগ্রেস হবার সব খবর জানালাম ; পরে বাবা আমায় কলেজ ফি ও মাসিক খরচের সঙ্গে দশ টাকা আরও বেশী পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'টিকিট কিনে কংগ্রেস দেখতে যেও।'

পার্কসার্কাসে কংগ্রেস হবে, ভাবছি কি করে কংগ্রেস দেখতে যাবো ? হস্টেলের কেউ টিকিট কিনে যেতে প্রস্তুত না। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন হস্টেলে দুইজন ভদ্রমহিলা এসে হাজির। এঁদের একজন লতিকা বোস ও অন্যজন অরু সেন। তাঁরা এসে সব মেয়েদের ডেকে কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার হবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি প্রথমে বিশেষ আপত্তি জানাই। তারপর তাঁদের বার বার অনুরোধের জন্য রাজী হলাম। আমাদের সবার কাছ থেকে দুটি করে টাকা নিয়ে গেলেন কংগ্রেসের মেয়ে ভলান্টিয়ারের ইউনিফরম্—খদ্দরের শাড়ি কেনা হবে বলে। আর কথা হলো নিজের সাদা খদ্দরের ব্লাউজ তৈরী করে নেবো।

এদিকে শুরু করলেন সরলা দেবী ছাত্র-ছাত্রীদের সব একত্র করে পিয়ানো বাজিয়ে 'বন্দেমাতরম' গানের তালিম দেওয়াতে। আমরা ছেলেবেলা থেকে যে সুরে 'বন্দেমাতরম' গান গাইতাম সেই সুরে না গেয়ে ভিন্ন সুর। এতে প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হয়েছিল। ছেলেরা মেয়েরা সকলে কোরাসে গান অভ্যেস করতো, আর সঙ্গে সরলা দেবীর পুত্র দীপক একটা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে কনডাক্ট করবার চেষ্টা করতো।

দেখতে দেখতে কংগ্রেস আরম্ভের দিন এসে গেল। আমাদের সবাইকে গাঢ় সবুজ রংএর খদ্দরের শাড়ি দেওয়া হলো কংগ্রেস অধিবেশনে পরবার জন্য। দাম দিয়েছিলাম একখানা নতুন কাপড়েরই, তখনকার দিনে দু'টাকায় একখানা শাড়ি হয়ে যেতো, কিন্তু পেলাম একটি খদ্দরের ছেঁড়া ধুতি গাঢ় সবুজ রং-এ ছাপানো। যাই হোক, কংগ্রেসের কয়টা দিন ওটা পরেই কাটিয়ে দিলাম।

কংগ্রেসের জন্য যে প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছিল, সব পতাকা দিয়ে সাজানো, তাতে একটা হৈচৈ ব্যাপার শুরু হলো। তারপর তিনটে জিনিস দেখে মনে মনে একটু মুষড়ে পড়লাম। প্রথমটা হলো মতিলাল নেহরু হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। ফুল দিয়ে সাজানো আট ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তাঁকে বসিয়ে প্রশেসন্ করে যখন প্যাণ্ডেলে নিয়ে যাওয়া হল। দ্বিতীয়টা হলো নেতাজী সুভাষ বোস যখন জি-ও-সি অর্থাৎ বিলাতী সামরিক রীতি অনুযায়ী জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং (সংক্ষেপে জি-ও-সি)-

দের মত পদ নিয়ে তাদের অনুকরণে পোশাক করে ভলান্টিয়ারদের ওপর তদারক শুরু করলেন। তাঁর সেই খাকী পোশাক শুনেছিলাম ওল্ড কোর্ট হাউসের সাহেবী দোকান হার্মান কোম্পানীর দরজী তৈরী করেছিল। আর তৃতীয়টা হলো প্রতিদিন কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবার আরম্ভে সরলা দেবীর পুত্র দীপক ঠিক বিলিতি ব্যান্ড মাস্টারের মত পোশাক পরে হাতে একটি ব্যাটন নিয়ে উঁচু ডেইসের উপর থেকে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে কোরাসে 'বন্দেমাতরম্' গান গাওয়া কনডাক্ট করতে লাগলেন।

মনে মনে ভাবলাম এদিকে সবাই নিজেকে স্বদেশী বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তবে সবার বেলাতেই এসব বিদেশী অনুকরণ কেন? কিন্তু তখন বয়স কম, মাত্র ছয় মাস হলো কলকাতার কলেজে এসেছি; নিজের মতামত খোলাখুলি বলবার সাহস নেই। যে কয়টা দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হলো, সকাল নয়টার সময় কংগ্রেস প্যান্ডেলে নিয়ে যাবার জন্য বাস পাঠিয়ে দেওয়া হতো হস্টেলে এবং বিকেলে আবার পৌঁছে দিত।

আমাদের মেয়ে ভলান্টিয়ারদের ওপর ভার পড়লো যেসব মহিলারা কংগ্রেস দেখতে এসেছেন তাঁদের প্যান্ডেলের ভেতর নিয়ে ঠিক জায়গায় বসানো, কেউ জল খেতে চাইলে তাঁকে নিয়ে জল দেওয়া অর্থাৎ দেখাশোনা, সব কিছু করা।

প্রথম দিন কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হবার বেশ আগেই আমাদের গিয়ে পৌঁছতে হল। আমরা মাঠে সব এদিক ওদিক করছি, হঠাৎ দেখি লীলামাসী (লীলা নাগ; বিয়ে করে লীলা রায় হয়েছিলেন) শ্রীযুক্তা প্রীতি দাশকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দিকে আসছেন। আমায় দেখেই বললেন, 'আরে টুনু! তুই যে এখানে! দেশসেবা করতে নেমেছিস? ভাল! ভাল! তবে বলে দিচ্ছি, দেখিস খবরদার বিয়ে করিসনি কখনো।' আমি হেসে বললাম, 'আমি তো কলেজে পড়তে এসেছি।'

চারদিক লোকে লোকারণ্য। আমাদের সব যার যার জায়গা ঠিক করে সব কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল। মেয়েরা যেখানে বসেছিলেন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ অতিশয় শীর্ণ এক বৃদ্ধা মহিলা আমার হাত ধরে টেনে তাঁর পাশের খালি চেয়ারটাতে হেঁচকা মেরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'চিনতে পারছো?' আমি তাঁর দিকে তাকিয়েই চিনে ফেললাম এবং তখুনি তাঁকে প্রণাম করে বললাম, 'নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছি।' ইনি আমাদের শিলং মিডিল ইংলিশ স্কুলের যিনি হেডমিসট্রেস ছিলেন সেই মিস দাস। ইনিই আমি স্কুলে ভর্তি হবার আগেই স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় হঠাৎ টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে কবিতা বলতে বলেছিলেন (১ম অধ্যায়ে তাঁর কথা আছে)। তিনি ১৯২২-এর প্রথম কয়েক মাস পর শিলং-এর কাজ ছেড়ে কলকাতা চলে যান। আমার সঙ্গে ছয় বছর পর আবার দেখা। তিনি মা, বাবা, দিদি, মেজদি, পুঁটু সকলের খবর জনে জনে জিজ্ঞাসা করলেন। এত বছর পর হঠাৎ ঐ ভিড়ে সব অজানা লোকের মধ্যে তাঁকে দেখে খুবই আনন্দ হলো। কি কাজে আমার ডাক পড়াতে উঠে যেতে হলো। তাঁর কাছে আর কিছুক্ষণ বসবার সময় হলো না।

শীতকাল হলেও প্যান্ডেলের ভেতর অসম্ভব ভ্যাপ্সা গরম হয়ে উঠতো। দ্বিতীয়

দিনে দুপুরে একজন মহিলা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়লেন। হয়ত গরমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমরা দু-তিনজন ভলান্টিয়ার তাড়াতাড়ি জল নিয়ে তাঁর মুখে মাথায় ছিটিয়ে হাওয়া করছি, দেখি জহরলাল নেহ্‌রু তাড়াতাড়ি প্যান্ডেলে যেখানে অধিবেশন হচ্ছিল সেখানে থেকে উঠে এলেন আমাদের কাছে। ততক্ষণ ছেলে ভলান্টিয়ার চারজন একটা স্ট্রেচারও নিয়ে এসেছে। জহরলাল নেহ্‌রু নিজে ভদ্রমহিলাকে স্ট্রেচারে তুলতে সাহায্য করে ছেলেদের মেডিকেল টেন্টে নিয়ে যেতে বলে আমায় সঙ্গে যেতে বললেন। আর বলে দিলেন যে আমি ফিরে এসে ডাক্তার কি বললেন তাঁকে যেন জানাই। ভদ্রমহিলার জ্ঞান মেডিকেল টেন্টে নিয়ে যেতে যেতেই ফিরে এসেছে। তিনি একটু সুস্থ বোধ করলে আমি তাঁকে সেখানে ডাক্তারের জিম্মায় রেখে আবার প্যান্ডেলে ফেরত এলাম। জহরলাল আমায় প্যান্ডেলে ঢুকতে দেখেই আবার উঠে এসে ঐ ভদ্রমহিলার খবর জানতে চাইলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'How is she? Is she all right?'

আমি বললাম, 'Yes, the doctor said he would look after her'—এই শুনে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার গিয়ে অধিবেশনে যোগ দিলেন।

কংগ্রেসের এই দিনগুলির মধ্যে একদিন সকালে অধিবেশন বসবার একটু আগে মেয়েদের প্যান্ডেলের এক ধারের দোরে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ ঐ দোরটা দিয়ে কেবলই পুরুষমানুষরা ঘুরে যাবার রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মেয়েদের প্যান্ডেলের ভেতর দিয়ে চলে যেতে চাইত।

হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত দিয়ে থাবা মারলো। আমি হকচকিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি মহাত্মা গান্ধী। পরনে তাঁর হাঁটুর ওপরে পাঁচহাতি ধুতি, গায়ে একটি মোটা খদ্দরের চাদর ও পায়ে খড়ম, দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন খদ্দর-পরা, মাথায় ক্যাপ দেওয়া ভদ্রলোক। তখুনি বুঝলাম আমায় পথ ছেড়ে দেবার জন্য ইঙ্গিত করছেন। আমি খুব সমীহ করে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াতেই একটু হেসে আস্তে করে গন্তব্যস্থানের দিকে চলে গেলেন।

কংগ্রেসের সম্ভবতঃ তৃতীয় দিনে, ঠিক কবে মনে করতে পারছি না, সকালে যখন কংগ্রেস প্যান্ডেলে গিয়েছি, শুনলাম লিলুয়া থেকে ক'হাজার কুলী সব আসছে পায়ে হেঁটে এবং একটা হামলা হতে পারে। তারা যদি গণ্ডগোল বাধায়, তাদের বাধা দেবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বোস মশায় গুন্ডার দল ভাড়া করে আনতে গেলেন। একটা ভবিষ্যৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামার হৈরৈ মার-মার সব কি হবে কল্পনা করে খুবই ভয়ে ভয়ে আছি। আর সঙ্গিনীরা যখনি একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে সকলের মুখে একই কথা। কি উপায় হবে? দু-একজন বেশ সাহস দেখিয়ে ভরসা দিচ্ছে—কি আর হবে? আমাদের মারধোর করবার আগেই কোন একটা ব্যবস্থা করা হবে। ঘন্টা দুই-তিন পরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বোস মশায় গোটা দশ বারো ষন্ডামার্কা, রং কালো, বেঁটেমত, লম্বা লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, গেঞ্জি গায়ে, হাতে মোটা লম্বা বাঁশের লাঠিওয়ালা সব লোক নিয়ে এসে হাজির। মেয়েরা প্যান্ডেলে যেখানে বসেছিলেন তার পেছনে

অল্প দূর দূর সারি দিয়ে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সেদিনের কথা মনে হলে এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হয়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বোস মশায় খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি, মাথায় গান্ধীক্যাপ দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে গুন্ডাদের তদারক করছেন। তখন কে জানতো একদিন আমার স্বামী এঁরই সেক্রেটারীর কাজ করবেন এবং তাঁরই এক ছেলে আমাদের পরিবারের জামাই হবে।

যাই হোক, কুলীরা সব লিলুয়া থেকে এসে পৌঁছলে পর তাদের বসতে দেওয়া হলো। তারা চুপচাপ বসে কি শুনলো জানি না, বিকেল পাঁচটার সময় যে পথে এসেছিল সেই পথে আবার চলে গেল। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কংগ্রেস শেষ হবার পরের দিন শ্রীযুক্ত সুভাষ বোস মশায় সব মেয়ে ভলান্টিয়ারদের একত্র জড়ো করে একটা ছোট ভাষণ মত দিয়ে সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। আমরা একে একে সকলে তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি চলে যাবার পর শ্রীযুক্তা লতিকা বোস, যাঁর জিম্মায় আমরা ছিলাম, আমাদের সবাইকে খুব বকতে লাগলেন। কারণটা হলো সুভাষ বোস মশায় ইউনিফর্ম পরে আছেন, সুতরাং তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করাটা ভীষণ অন্যায় কাজ করা হয়েছে। আমাদের উচিত ছিল কপালে হাত ঠেকিয়ে পা জোড় করে দাঁড়িয়ে সৈনিক-এর মত স্যালুট করা। এতে আমরা হাসবো কি কাঁদবো কিছুই ঠাউরে উঠতে পারলাম না।

কংগ্রেসের পর তখনও বড়দিনের ছুটির কয়টা দিন বাকী আছে কলেজ খুলতে। হস্টেলে আমরা ফার্স্ট ইয়ারের পাঁচজন (আমি একা সিটি কলেজের, বাকী চারজন বেথুনের) মিলে ঠিক করলাম একবার গঙ্গার ওপারে বেলুড়মঠে বেড়াতে গেলে কেমন হয়? সুনীতিদিকে গিয়ে বললাম যে আমার নৌকো করে গঙ্গা পার হয়ে বেলুড় মঠ দেখতে যেতে চাই। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন কি? বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ভাড়া গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম। গঙ্গার আহিরীটোলা ঘাটে গিয়ে আমরা বললাম, আমরা ছই দেওয়া নৌকোতে পাল তুলে যাবো। দাম-দর করে একটা নৌকো ঠিক করে সবাই চড়ে বসলাম।

জলের ওপর দিয়ে নৌকো তর্‌তর্ করে চলেছে। ছপ্‌ছপ্ জলের শব্দ, মাঝিদের দাঁড় টানার ভঙ্গি দেখতে খুবই ভাল লাগছে। এক নতুন রকমের অভিজ্ঞতা। একটু পরে পরে আমরা কেবল নৌকো থেকে হাত বাড়িয়ে জল ছোঁবার চেষ্টা করছি। তা দেখে সুনীতিদি ওরকম ভাবে জলে হাত ডোবাতে বারণ করলেন। বললেন, 'তোমরা সবাই স্থির হয়ে বোসো।' লক্ষ্য করলাম তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। বোধহয় ঐ বিশাল গঙ্গার জল-এর ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়াটাকে কোন আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা মনে করছিলেন। আমরা সবাই থেকে থেকে কেবলই মাঝিদের বলছি, 'পাল টাঙাচ্ছো না কেন?' মাঝিরা বল্‌লো, 'ফেরার পথে পাল তুলে দেবো, দিদিমণিরা! এখন হাওয়া নেই।' বেলুড়ে নেমে আমরা মন্দির ও চারদিকের বাগান ইত্যাদি ঘুরে বেড়িয়ে দেখে ফিরে এসে আবার নৌকোতে চড়ে বসলাম। মাঝিদের

বললাম, 'এবারে পাল লাগাও।' মাঝিরা আমাদের কথায় একটা প্রকাণ্ড তালি দেওয়া নোংরা তেরপলের পাল হেঁইহেঁই করে টেনে তুলছে দেখে কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলাম। কোথায় ভেবেছিলাম দেখবো—

'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া—'

না ! এ কি নোংরা ভারী বিচ্ছিরি জিনিস ! একবার ট্রেনে করে সারা ব্রীজ পার হবার সময় নীচে পদ্মার জলে দেখেছিলাম অসংখ্য পালতোলা নৌকো। সেই দেখা অবধি বরাবর মনে ইচ্ছা হয়েছে পালতোলা নৌকোয় চড়ে জলেব ওপর দিয়ে যাবার। যাই হোক্, নৌকো এসে নিমতলা ঘাটে লাগলো। মাঝিদের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আমরা একটা জায়গা পার হয়ে চলেছি, দু-এক জায়গায় আগুন একেবারে জ্বলন্ত কয়লা হয়ে আছে দেখতে পেলাম। এটা কি ? এটা কি ? বলাতে একটি সঙ্গিনী বললে, 'মানুষ পুড়ছে।' মনে কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব হলো। আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে রাস্তায় এসে পড়ার পর যখন বিডন স্ট্রীটের কাছে এসে পৌঁছলাম, কোন গাড়ি না পাওয়াতে সুনীতিদি বললেন, 'চলো, হেঁটেই চলে যাই।'

যেতে যেতে দেখতে পেলাম রাস্তার দুধারের বাড়িগুলির দরজায় ও বারান্দায় মুখে রংটং মেখে সেজেগুজে অনেকগুলো মেয়ে বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে সুনীতিদিকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, 'এরা কে ? এভাবে বসে আছে কেন ?' সুনীতিদি আমাদের কিছু না বলে শুধু 'চলো, চলো—শীগ্‌গির চলো !' বলে গরুতাড়া করে নেবার মত আমাদের তাড়া দিতে দিতে হস্টেলে নিয়ে এলেন। আরও দু-একবার জিজ্ঞাসা করতেও কোনই উত্তর দিলেন না। তারপর কৌতূহলবশতঃ হস্টেলে ফিরে উপরের ক্লাসের আশাদি ও প্রমীলাদিকে বললাম যে, 'এরকম সব বসে আছে—ওরা কে ? ওরকম সব রং মেখে সেজে-গুজে রয়েছে কেন ?' প্রমীলাদি বললেন, 'দূর বোকা সব মেয়ে ! ওরা খারাপ মেয়েমানুষ।' আমার বিয়ের পর একদিন এই গল্প ওঁর কাছে করার পর উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা বোকা তো ছিলে তোমরা ? ওটা যে একটা বিখ্যাত পাড়া এবং কাদের, কে কি, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানতে না ?' আমরা সে সময়ে খুব সুন্দর, সরল, নির্মল জীবনের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছিলাম। জানবো কোথা থেকে এত খবর !

এই নৌকো চড়ে এসে বড়দের সবার কাছে গল্প করার পর সকলে শুনে আমাদের এই দুঃসাহসের জন্য খুব বকুনি দিলেন। কারণ আমরা কেউ সাঁতার কাটতে জানতাম না। হঠাৎ যদি নৌকো ডুবে যেতো তা হলে কি উপায় হতো ! আর যাতে কখনও এরকম নৌকো চড়তে না যাই, তাই বলে সতর্ক করে দেওয়া হলো।

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে আমাদের খেয়াল চাপলে সবাই মিলে দোতলা বাসের উপরের তলায় বসে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে কালীঘাট পর্যন্ত যেতাম ; সেখানে আমরা নামতাম না। আবার ঐ বাসে করেই ফিরে আসতাম।

কলেজ খুলে গেলে আর শীগ্‌গির কোথাও বের হওয়া যাবে না ; সেজন্য

আরেকদিন পরামর্শ হল, 'চলো, আউটট্রাম ঘাটে বেড়িয়ে আসা যাক্।' সকলে মিলে সুনীতিদিকে গিয়ে ধরলাম আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। বিকেলবেলা আউটট্রাম ঘাটে জেটির দোতলায় গিয়ে বসে জাহাজ, লঞ্চ ইত্যাদি দেখছি, দেখি বেয়ারারা ট্রেতে করে সাজিয়ে অন্য লোকেদের চা, আইসক্রীম ইত্যাদি দিচ্ছে। তাই দেখে আমাদেরও আইসক্রীম খাবার লোভ হল। একটা বেয়ারাকে ডেকে আমাদের পাঁচজনের জন্য আইস্‌ক্রীম আনতে বলা হল। সুনীতিদি বিধবা মানুষ, বাইরে কিছু খাবেন না।

সবাই মিলে মহানন্দে আইসক্রীম খাওয়ার পর বেয়ারাকে বিল আনতে বলা হল। তারপর বিল দেখে তো মাথায় বজ্রাঘাত ! সাধারণতঃ আমরা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়ে যে দামে আইসক্রীম খেতাম এখানে তার চারগুণ দাম। সর্বনাশ ! এত পয়সা কি সঙ্গে আছে ? সবাই যার যার ব্যাগ ঝেড়েঝুড়ে খুঁজেপেতে সব পয়সা জড়ো করে দেখা গেল হস্টেলে ফেরত যাওয়ার বাসভাড়া রেখে ঠিক আইসক্রীমের দামটা দিয়ে দেওয়া যাবে। এর চাইতে আর একটি পয়সাও অতিরিক্ত নেই। অথচ জানি বেয়ারা মশায় কিছু 'টিপস্' চাইবেই। নিজেরা বলাবলি করলাম, পয়সা যখন আর বেশী নেই, 'টিপস্' দেবো কোত্থেকে ! টেবিলে বিলের ওপর পয়সা রেখে আমাদের সবাইকে উঠে পড়তে দেখে বেয়ারাটা 'টিপস্'-এর জন্য আমতা আমতা করতে লাগলো। আমরা কোনক্রমে হুড়মুড়িয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম আর সুনীতিদি হাত নেড়ে, ক্ষীণ গলায় 'দোসরা রোজ হোগা, দোসরা রোজ হোগা' বলে পাশ কাটিয়ে এলেন। হস্টেলে এসে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো এত কম পয়সা হাতে নিয়ে বের হব না।

বড়দিনের ছুটির পর কলেজ খুলে গেল। সকলেই তখন পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ১৯২৯ সনে ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠবার পালা। পরীক্ষা মার্চ মাসে হবে, ঠিক গ্রীষ্মের ছুটির আগে। ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ একদিন আবার লতিকা বোস ও অরু সেনের সুনজরে পড়লাম। তাঁরা সুনীতিদিকে টেলিফোন করে জানালেন তাঁদের কয়েকজন মেয়ের দরকার, তাঁরা নিতে আসছেন। সেদিন হয় শনি বা রবিবার ছিল কিম্বা কোন ছুটির দিন ছিল কিনা ঠিক মনে পড়ছে না। একটু একটু গরম পড়ে যাওয়াতে নীচে একতলাতে খাবারঘরে পাখা চালিয়ে আমরা তিন-চারজন পড়াশুনা করছি। আর এও ভেবেছি যে খাবারঘরে থাকলে আমাদের নাগাল তাঁরা পাবেন না। টের পেলাম বেলা একটা নাগাদ তাঁরা দুজনে এসে সোজা উপরের তলায় উঠে গেলেন। তারপর তাঁরা সমস্ত হস্টেলের ঘরগুলি তচনচ করে খুঁজতে লাগলেন কে কোথায় আছে ? তাঁরা নীচের তলায় আসছেন টের পেয়ে আমরা চারজন খাবারঘর ছেড়ে দৌড়ে উঠোনের উল্টোদিকে রান্নাঘরের দরজার কোণায় গিয়ে লুকোতে না লুকোতেই দুই মহিলা উপস্থিত। আমাদের সকলকে একত্র করে খুব পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য। আমরা আগেই শুনেছিলাম সেদিন সাইমন কমিশনকে বাধা দেবার জন্য কালো ঝান্ডা উড়িয়ে রাস্তায় প্রসেশন বের হবে। বুঝলাম আমাদের ওতে নিয়ে যাবার ইচ্ছা। আমরা কেউ যেতে প্রস্তুত না ; সুনীতিদিও

আমাদের ওসব কালো ঝান্ডা উড়িয়ে প্রসেশনে যাওয়ার পক্ষে নয়। তখন তাঁরা কথাটা একটু অন্য রকমে বলে বসলেন। তাঁরা বললেন, আমরা মেয়েদের নিতে চাইছি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে মিটিং হবে তাতে যাতে দল ভারী হয় সেজন্য, প্রসেশন করে যাবার জন্য নয়। এই বলে সুনীতিদিকে খুব বেশী জোর করতে লাগলেন। সুনীতিদি বললেন, 'আচ্ছা, আমার মেয়েদের যদি রাস্তা দিয়ে প্রসেশন করে হেঁটে যেতে না হয় তবেই আমি ওদের যেতে দিতে পারি।' এ কথার পর আমাদের তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের ইউনিফরম্ পরে নিতে বলা হল। আর সুনীতিদিকে বললেন, আপনাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো পরে পার্কে নিয়ে যাবার জন্য।

তাঁরা একটা বাস নিয়ে এসেছিলেন—তাতে করে আমাদের দশ-বারোজন যারা সেদিন হস্টেলে ছিলাম তাদেরকে বিধান রায়ের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাদের একতলার একটা বড় ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হল, অন্যান্য হস্টেল থেকে মেয়েরা এসে পৌঁছানো পর্যন্ত। ঘরের কোণায় দেখলাম অনেক কালো ঝান্ডাওয়ালা বাঁশ জড়ো করে খাড়া করে রাখা হয়েছে। আমরা বুঝলাম বেগতিক, সুবিধের নয়। এঁরা আমাদের ঐ কালো ঝান্ডা হাতে তুলে দিয়ে প্রসেশন করে যাবার জন্য বলবেন। তখন হস্টেলের আমাদের উঁচু ক্লাসের মেয়েরা পরামর্শ আঁটতে লাগলেন কি করা যায়। তারপর হঠাৎ প্রমীলাদি ও নিধুদি দুজনে চট করে দোর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে রাস্তায় পৌঁছিয়ে কোনখান থেকে সুনীতিদিকে ফোন করে জানিয়েছে যে ব্যাপার অন্য রকম মনে হচ্ছে।

সুনীতিদি শোনামাত্র আমাদের দারওয়ানকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে এসে হাজির। সুনীতিদিকে দেখে কর্তৃপক্ষ হকচকিয়ে গেছেন। সুনীতিদি বললেন, 'আমি আমার মেয়েদের এখুনি ফেরৎ নিয়ে যেতে এসেছি।' তারপর দু'দলে বহু কথা-কাটাকাটির পর ঠিক হল তাঁরা ট্যাক্সি ঠিক করে দিচ্ছেন, সুনীতিদি সঙ্গে থাকবেন, আমরা সবাই ট্যাক্সি করে গিয়ে পার্কের মিটিং-এ দল ভারী করবার জন্য বসে থাকবো। তাই হলো। সুনীতিদির সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা হস্টেলে ফিরে এলাম। সকলে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কিছুতেই যাতে এনাদের পাল্লায় না পড়ি। কালো ঝান্ডা উড়িয়ে প্রসেশন করে যাবার জন্য অন্য হস্টেলের ছাত্রীরা যোগ দিয়েছিল ছাত্রদের সঙ্গে।

ক্রমশঃ কলেজে পড়ার দিনগুলি বেশ আনন্দেই চলতে লাগলো। আমাদের সিটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সব ব্যাপারেই বেশ একটা ভদ্র শালীনতার ভাব দেখা যেতো। ছাত্রেরা সকলেই খুব ভদ্রতা দেখিয়ে চলতো। আর যদিও বা কখনও কেউ সামান্য একটু দুষ্টুমি করবার চেষ্টা করেছে, তারা এমন জব্দ হয়েছে যে ভবিষ্যতের মত চরম শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে।

একবার দু'টি বোন (সহোদরা নয়) একই বাড়ি থেকে কলেজে পড়তে আসতো। বড়জন থার্ড ইয়ারে এবং ছোটজন আমার সঙ্গে ফার্স্ট ইয়ারে পড়তো। তারা হেঁটেই কলেজে আসা-যাওয়া করতো। কিছুদিন যাবৎ একটি ছাত্র রোজ বিকেলে তাদের পেছন পেছন যেতে আরম্ভ করলো। বেশ কয়েকটা দিন লক্ষ্য ক'রে, একদিন কলেজ থেকে ফিরবার পথে বোন দুটি যখন বাড়ির কাছাকাছি হয়েছে, হঠাৎ ছোট বোনটি

পেছন ফিরে পিছিয়ে ছেলেটির পেছন দিকে গিয়ে তার গায়ের পাঞ্জাবির কোণা চেপে ধরেছে। ছেলেটি এরকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি। একটু হক্‌চকিয়ে গেল। আর ততক্ষণে বড়বোন দৌড়ে বাড়ির ভেতর গিয়ে ভাইদের ডেকে আনলে। ভাইরা এসে ছেলেটিকে এমন মার দিলে যে তার বরাবরের মত শিক্ষা হয়ে গেল। ভবিষ্যতে আর কখনও ওরকম করবার চেষ্টা করেনি। সেই যুগে অনেক মেয়ের মধ্যেই খুব সাহস দেখা যেতো এবং দরকারমত শাস্তি দেবার ভার নিজের হাতে নিতেও কোন ত্রুটি হতো না। তবে খুব বেশী দরকারও হতো না।'

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি দিদি ও জামাইদা কংডান (নাগা পাহাড়) থেকে কলকাতা ফিরে এলেন। নাগা পাহাড়ের ঐ জঙ্গলে একা একা থাকা তাঁদের আর সুবিধা বোধ হল না। এবার ওঁরা ভবানীপুরে একটা বাড়ি নিলেন। আমি আবার প্রতি শনি-রবিবার ছুটির দিনে দিদির কাছে থেকে আসতাম।

এই সময়ে একদিন শুনলাম মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসেছেন। মির্জাপুর পার্কে 'বিলিতি বর্জন করো' বলে সকলের দেওয়া বিলিতি কাপড় পোড়াবেন। হস্টেলের কেউ কেউ সকলের কাছ থেকে বিলিতি কাপড় নিয়ে জড়ো করতে লাগলো। আমাকেও শাড়ি ব্লাউজ ইত্যাদি দিতে বললো। আমি বললাম, 'আমার তো সবই বিলিতি কাপড়। আর আমি যেখানে থাকি সেখানে দেশী কাপড় পাওয়াও যায় না এবং আমি এই গরমে ঐ মোটা খদ্দরের শাড়ি জামা পরতেও পারবো না। তোমরা যদি নেহাতই চাও আমার বাক্স থেকে একটা কিছু নিয়ে যেতে পার তোমাদের নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। আমি নিজে দেবো না। আমি নিজে দিলে সেটা আমার দিক থেকে প্রতিজ্ঞা করা হবে যে আমি আর বিলিতি কাপড় পরবো না, যা নাকি আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়।' তারা আমার সুটকেস খুলে একটা ভাল ব্লাউজ নিয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে সুনীতিদির সঙ্গে হস্টেলের সবাই বিলিতি কাপড়ের পোঁটলা বেঁধে বেয়ারা শিবরামের হাতে দিয়ে মির্জাপুর পার্কে গেল। একমাত্র আমি একা ও আমাদের যিনি মেট্রন ছিলেন তিনি হস্টেলে রইলাম। মেট্রনটি একটু দুঃখই বোধ করছিলেন যে আমার জন্য তাঁর যাওয়া হল না। আমি যাবো না শুনে সুনীতিদি মেট্রনকে যেতে বারণ করলেন। সবাই চলে যাওয়ার প্রায় আধ-ঘন্টাখানেক পরেই সব মেয়েরা একেবারে রীতিমত দৌড়তে দৌড়তে হস্টেলে এসে হাজির। একেবারে হাঁপাচ্ছে আর কেবলই বলছে—'ভাগ্যিস যাসনি তুই! কি শাস্তি, দুর্গতি আমাদের!'

সবাই একটু শান্ত হলে পর শুনলাম যে মহাত্মা গান্ধী বিলিতি কাপড় স্তূপীকৃত করিয়ে তাতে দেশলাই জ্বেলে আগুন দেওয়ামাত্র যেই কাপড় সব দাউদাউ করে জ্বলতে আরম্ভ করেছে, আর লাল পাগড়ী পুলিস দল বেঁধে লাঠি নিয়ে মার্ মার্ করে সব লোকেদের ডাইনে বাঁয়ে মারতে আরম্ভ করেছে, তারা মেয়েদের লাঠির ঘা মারেনি বটে, কিন্তু মার্‌মার্ করে লাঠি তাড়া করে আমহার্স্ট স্ট্রীট পর্যন্ত এসেছে। মেয়েরা ট্রামে বা বাসে উঠবারও সুযোগ পায়নি। সেই মির্জাপুর পার্ক থেকে হস্টেল পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে আসতে হয়েছে। পরদিন সকালে যখন নীচের তলায় গেছি সকালের

চা খেতে, দেখলাম বেয়ারা শিবরাম সাংঘাতিক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'শিবু, কি হয়েছে তোর ? অমন খোঁড়াচ্ছিস কেন ?' সে বললে, 'কি আর বলবো, টুনুদিদি ! কাল বেজায় পেটাই খেতে হয়েছে। প্রথমে ধাঁ করে জোরে একটা লাঠির বাড়ি পড়লো পিঠে আর কোমরে ; একেবারে কোমরটা ভেঙে দিলে পুলিসে, তারপর আর এক ঘা পড়লো পায়ে, তাতে মনে হলো ঠ্যাংটা বুঝি দু'টুকরো হয়ে গেল। কোনরকমে এসেছি, আজ তো আর নড়তেই পারছি না।'

এসব নানারকম হুজুগের পর ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠবার পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পরই গ্রীষ্মের ছুটি। আবার আমরা আসামের দিকের মেয়েরা একত্র হয়ে গাড়ি রিজার্ভের ব্যবস্থা করে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। জামাইদা দেখেশুনে আমাদের গাড়িতে তুলে দেবার জন্যে সঙ্গে গেলেন। আমরা সব মাল ওজন করাচ্ছি, কোন্ গাড়িতে আমাদের চড়তে হবে এসব ঠিক করা হচ্ছে, এর মধ্যে দেখি আমরা একই সঙ্গে পড়ি সিটি কলেজে, একটি অসমীয়া ছাত্রও আমাদের এই ট্রেনে উঠবার ব্যবস্থা করছে। আমি জামাইদাকে বললাম, ঐ ছেলেটি আমার সঙ্গে সিটি কলেজে পড়ে। জামাইদা গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে জানলেন সে শিবসাগর যাচ্ছে। হঠাৎ শুনি জামাইদা তাকে বলছেন, 'এনারা সব একা একা যাচ্ছেন, আপনি রাস্তায় একটু এঁদের দেখবেন।'

আমরা বরাবর একা একা চলাফেরা করছি। ভাবলাম ছেলেটিকে দেখাশোনা করবার জন্য না বললেও পারতেন। গাড়ি ছাড়লো, প্রায় ঘন্টা দুই পরে একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে ছাত্রটি এসে বললো, 'আপনারা সব ঠিক আছেন তো ?' আমি বললাম, 'আমরা খুব ভালভাবেই যাচ্ছি। এতবড় আটজনের কম্পার্টমেন্ট, আর আমরা শুধু পাঁচজন, তায় রিজার্ভ করা।' সে বললে, 'আমার গাড়িতে বেজায় ভীড়, একতিলও জায়গা নেই।'

পরদিন আমরা অন্য গাড়ি বদল করে আবার যখন স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডুঘাট স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম, সেখানে সে এসে বললে, 'এবারে আমি ট্রেনে শিবসাগরের দিকে যাবো, আপনি কি এই মোটরবাসে শিলং যাবেন ?'

তারপর আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলো। আমি বলে দিলাম আমাদের কোন বিশেষ ঠিকানা নেই। ওমা, শিলং পৌঁছানোর সপ্তাহ দুই পরে হঠাৎ তার কাছ থেকে এক চিঠি এসে হাজির ! ঠিকানা লেখা—'মিস্ অমিয়া ধর, শিলং।' শিলং-এ সবাই আমাদের চেনে, সুতরাং পোস্টম্যান ঠিকই ধরতে পেরেছে যে আমার চিঠি। চিঠিতে কেমন আছি, পড়াশুনা কেমন চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা। চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা। আমি তো ওটা ভ্রূক্ষেপও করলাম না।

চিঠিখানা পাওয়ার কয়দিন পর বাবা বললেন, 'ছেলেটা একটা চিঠি লিখলো, তুই উত্তর দিচ্ছিস না কেন ?' আমি বললাম, 'তুমি তো জান না বাবা, আমি উত্তর দেবো, তারপর সে আবার আরেকটা লিখবে, তারপর আমার চিঠিগুলি নিয়ে কলেজে ক্লাসের অন্য ছাত্রদের দেখাবে এবং এই নিয়ে ছাত্রমহলে এক ঘোরতর আলোচনার

বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।' বাবা বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তবে থাক্। যা ভাল মনে করিস তাই কর।'

মনে মনে একটু সন্দেহে ছিলাম যে কলেজ খুললে এগিয়ে এসে আবার না আলাপ জমাতে চায়। কিন্তু দেখলাম সে একটু ভীত অবস্থায়, আমাকে দেখলেই দূরে সরে যায়। তাই ভাবলাম চিঠির উত্তর দিলে আর উপায় ছিল না। কারণ ভদ্রতা দেখাতে গেলেও অনেক রকম উপদ্রবের সম্ভাবনা। এর চাইতে সাবধানতার জন্য একটু অভদ্রতাও শ্রেয়।

ঐবার গ্রীষ্মের ছুটির পর পুঁটুও আমার সঙ্গে হস্টেলে এলো এবং বেথুন কলেজে ভর্তি হলো। আমার বেলাতে কলেজে সিট্ পেতে হাঙ্গামা হওয়াতে বাবা পুঁটু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে লিখে তার জন্যে সিট্ রিজার্ভ করিয়ে রাখলেন। দু'বোনে হোস্টেলে যাওয়ার পর সুনীতিদি আমাদের একটা ছোট দু'সিটের ঘর দিলেন। এই ঘরখানা সাধারণতঃ এম-এ পড়ার ছাত্রীদের দেওয়া হতো। সে সময়ে সুরমাদি ছিলেন কেবল একজন এম-এ পড়ার ছাত্রী। তিনি সংস্কৃত নিয়ে এম-এ পড়ছিলেন। তবে বেশীর ভাগ সময়ই হস্টেলে থাকতেন না। সেজন্য সুনীতিদি ঘরখানা একেবারে খালি রাখতে চাইলেন না। সুরমাদি পরে এম-এ পরীক্ষা পাস করে বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বিয়ে করেছিলেন।

আমি আর পুঁটু ঘরখানাকে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতাম; সেজন্য সুনীতিদি খুশী থাকতেন। এবং মাঝে মাঝে এসে আমাদের ঘরখানাতে বসে খানিকক্ষণ গল্পসল্প করে যেতেন।

বরাবর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতাম বলে একদল মেয়ে, আমি বিলাসিতা করি, বলে বেড়াতো। আমাদের ঘরখানার এক দেয়ালে একটা কাঁচের দরজা দেওয়া আলমারী ছিল। তার উপরের তাকে দু'চারটি সুন্দর দেখে বই, মাঝেরটায় এটা ওটা দুই চারটা সুন্দর জিনিস, একটা ছোট পেতলের ফুলদানী ও দিদির কাছ থেকে নিয়ে সামুদ্রিক কড়ি ও ঝিনুক দিয়ে সাজিয়েছিলাম। তৃতীয় তাকে রাখতাম সব প্রসাধনের জিনিস—মাথার তেল, সাবানদানী, ক্রীম, পাউডার, চিরুনি, চুলের ফিতে, কাঁটা ইত্যাদি; তবে সবই বিলিতি ব্যবহার করতাম। শুধু চুলে কুন্তলীন তেল মাখতাম। একেবারে নীচের তাকে রাখতাম জুতো ইত্যাদি। সুন্দর দেখাতো আলমারীটা। জানি না ওরকম সাজানো দেখে সকলের ওই ধারণা হয়েছিল কিনা।

আগে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের বোর্ডিং-এ এসে দেখলাম মেয়েরা স্নানের পর তাদের কাপড় শুধু জলে ডুবিয়ে নিংড়ে নিত। কিন্তু আমার অভ্যাস ছিল প্রতিদিনই স্নানের পর সাবান দিয়ে কাচা কাপড় ব্যবহার করা। সেজন্য আমি যখন স্নানের পর সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে বসতাম, আমার সময় উতরে যেতো, কারণ মাত্র পনেরো মিনিট দেওয়া হতো এক-একজনকে স্নানের জন্য। আমি নির্বিকার হয়ে কাপড় কেচে যেতাম দেখে আমার পরে যার স্নানের পালা থাকতো, সে সময় বেশী হয়ে যাচ্ছে বলে রেগে স্নানের ঘরের দরজায় দমাদম কিলঘুষি মেরে চেঁচাতে থাকতো 'অমিয়া ধর, বের হবে

কিনা ? এইরে, মেয়ে সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে বসেছে ! আমার আর চান করা হবে না !' সবাই এমনিতে আমায় 'টুনু' বলেই ডাকতো কিন্তু আমার উপর বিরক্তি দেখাতে গেলেই 'অমিয়া ধর' সম্বোধন এসে যেতো।

আরেকটা ব্যাপারে বোর্ডিং-এর অনেকেই, বিশেষ করে আমার সঙ্গে যারা পড়তো তারা বলতো আমি বড্ড বিলাসিতা করি। কারণ আমি কুন্তলীন তেল চুলে ব্যবহার করতাম। মা শিশুকাল থেকে আমাদের চুলে কুন্তলীন মাখিয়ে দিতেন। ছুটির দিনে একদিন সহপাঠিনীরা মিলে এক জায়গায় বসে চুল আঁচড়িয়ে তেল মাখছি, তারা হঠাৎ বললে, 'দামী তেল মাখিস কিনা, তাই কৃপণতা করে তেল বাঁচিয়ে মেমদের মত চুল রুক্ষ করে রাখিস।' আমি বললাম, 'মোটেও না, আমি তোমাদের মত তেল-জবজবে চুলে থাকতে পারি না।' এই বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন মেয়ে বলে উঠলো, 'তবে দেখি তেলের শিশি ভেঙে দিলে বুক ফেটে মরিস কি না !' এই বলে আমার তেলের শিশি নিয়ে ধাঁই করে নর্দমার পাশের দেয়ালে আছাড় মেরে প্রায় ভরা একশিশি কুন্তলীন তেল ভেঙে দিল। আমি কালুদিকে তেল আনিয়ে দিতে বললাম। তিনি তারপর আমায় তেলের শিশি দিতে এসে সব ব্যাপার শুনে যে তেলের শিশি ভেঙে দিয়েছিল তাকে খুব বকলেন।

আমরা হস্টেলে ফেরার পরই পূর্ববঙ্গে ঘোরতর বন্যার খবর পেয়ে সকলে বন্যাগ্রস্ত লোকেদের সাহায্যের জন্য কি ভাবে চাঁদা তোলা যায় চিন্তা করতে লাগলো। ঠিক হলো রোজ বাজার থেকে যত দামের মাছ আসে, মাছ না খেয়ে সেই টাকাটা জমিয়ে রেখে পরে একসঙ্গে জড় করে চাঁদা হিসাবে দান করা হবে। শুধু ডাল ভাত আর একটা তরকারী রান্না হতো। কিন্তু আমি পড়লাম একেবারে উপোসে মরার মধ্যে। আমায় কলেজে নিয়ে যাবার জন্য ন'টার সময় বাস আসতো। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ স্নান খাওয়া সব করে তৈরী হতে হতো। অত সকালে রান্না সব হয়ে উঠতো না। কোনক্রমে ডাল ভাত রান্না হতো। বামুনদি তাড়াতাড়ি করে একটুকরো মাছ দিয়ে একটু আলাদা ঝোল আমায় রেঁধে দিত। কিন্তু বন্যার চাঁদা তোলার পয়সা বাঁচানোর জন্য মাছ আসা বন্ধ। আমায় দিনের পর দিন শুধু জলো ডাল আর ভাত খেয়ে অর্ধভুক্ত অবস্থায় কলেজে যেতে হতো। কলেজে টিফিন খাবারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া প্রায়ই দুপুরে ক্লাসের পর ক্লাস থাকতো। সঙ্গে কিছু নিয়ে গেলেও খাবার সময় হতো না। সেই বিকেল পাঁচটার পর এসে আবার যা হয় দুটি ডাল ভাত ও সামান্য তরকারী খেতে পেতাম।

প্রায় মাসখানেক এরকম খাওয়ার পর একদিন কলেজে যাওয়ার আগে খেতে গিয়ে দেখলাম সেদিন ডালও ঠিকমত সেদ্ধ হয় নি, তখন আমি ভয়ানক ক্ষেপে গেলাম। কলেজ-ফেরৎ এসে খাবার ঘরে গিয়ে দেখলাম অন্যান্য হস্টেলের মেয়েরা সবাই খাচ্ছে। আমি তাদের ওখানে গিয়ে রেগে বললাম, আমি আর তোমাদের কারোও কথা মানতে প্রস্তুত না। আর কতদিন এভাবে না খেয়ে থাকা যায়। কাল থেকে আমার জন্যে মাছ আনানোর ব্যবস্থা করতে হবে। চাঁদা দিতে হলে যার যার

পকেট থেকে দেবো। আমার কথা শোনামাত্র দু'চারজন যারা মিলে এইভাবে চাঁদা তোলার প্রস্তাব করেছিল তারা ছাড়া আর সকলেই বলে উঠলো, 'কাল থেকে আমরাও মাছ খাব। ডাল ভাত খেয়ে খেয়ে হয়রান হয়ে যাচ্ছি।'

কাণ্ড দেখে আমার হাসি পেলো। কারোরই আগে কিছু বলবার সাহস হচ্ছিল না!

যাঁরা এই চাঁদা বাবদ মাছের পয়সা জড়ো করছিলেন, তাঁরা তখন দেখলেন আর ওভাবে চাঁদা তোলা সম্ভব হবে না। সেজন্য ঠিক করলেন যা যোগাড় হয়েছে তাই গিয়ে আচার্য পি. সি. রায়কে দিয়ে আসবেন। কারণ আচার্য পি. সি. রায় এই সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন। একদিন কয়েকজন মিলে সুনীতিদিকে সঙ্গে নিয়ে সায়েন্স কলেজে আচার্য পি. সি. রায়কে এই চাঁদা দিয়ে আসতে গেলেন।

ওখান থেকে ফিরে এসে পি. সি. রায় কি বললেন সব জানালেন ও বললেন—হঠাৎ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠতে সুনীতিদি বলেছেন, 'আমার শরীর খুব ভাল।' আচার্য পি. সি. রায় খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন ; তিনি সুনীতিদির মুখের উপর বলে উঠলেন, 'জানি জানি, দেখছি তো ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মত !' সুনীতিদি ছিলেন অতিশয় রোগা এবং তাঁকে দেখতেও বেশ রুগ্ই দেখাতো।

এর কয়দিন পরে রাণু একদিন কলেজ থেকে এসে বললো, আজ সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে আমাদের কলেজে যাবি ? (রাণু বেথুন কলেজে থার্ড ইয়ারে বি-এসসি পড়ছিল) তাদের ম্যাথম্যাটিকসের প্রফেসার বলেছেন সন্ধ্যের পর বেশ অন্ধকার হলে পর টেলিস্কোপে শনিগ্রহের বলয় (রিং) দেখাবেন। আমি বললাম, 'তোদের প্রফেসার কি ভাববেন ? আমি কে, কি বৃত্তান্ত !' রাণু বোঝালো, 'ভয় নেই, অন্ধকারে তোকে কেউ চিনবে না, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়বি।' তাই হলো। প্রফেসারটি সকলকে অন্ধকারে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে একের পর এককে দেখাতে লাগলেন। আমিও ঐ মেয়েদের মধ্যে ঢুকে দিব্যি দেখে এলাম। উনি কিছুই টের পেলেন না।

ইতিমধ্যে আবার আরেকটা সুযোগ হলো বিলিতি থিয়েটার কোম্পানীর অভিনয় দেখার। কোনও বিলিতি কোম্পানী কলকাতার গ্লোব থিয়েটারে সেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট' নাটক দেখাবার জন্য এসেছিল। কিন্তু এত দাম দিয়ে আমাদের ছাত্রীদের টিকিট কেনা সম্ভব না। হঠাৎ শোনা গেল, থিয়েটার কোম্পানী একটা দিন ঠিক করেছে যে টিকিটের পয়সা ছাত্রছাত্রীর জন্য অর্ধেক করে দিয়ে তারা হ্যামলেট নাটক দেখাবে। আমরাও মনের আনন্দে অর্ধেক মূল্যে 'ড্রেস সারকেলে' বসে থিয়েটার দেখে এলাম। থিয়েটার দেখে যেমন আনন্দ বোধ করলাম, তেমনি খুব হাসির খোরাক হল অভিনয় করতে করতে হঠাৎ বৃদ্ধ পেলোনিয়াসের মাথার পরচুলা খুলে পড়ে টাকমাথা বেরিয়ে পড়া দেখে। পেলোনিয়াস এক হাতে হাসি চেপে অন্য হাতে পরচুলা তুলে নিয়ে স্টেজ থেকে একেবারে দে ছুট !

রাজনৈতিক আন্দোলন, সভা ইত্যাদি সব দেখতে আরম্ভ করেছিলাম যখন ব্রাহ্ম

গার্লস স্কুলে পড়ি তখন থেকেই অল্পবিস্তর। ১৯২৫ সালে জুন মাসের শেষে শিলং-এ গ্রীষ্মের ছুটি ফুরোবার দুদিন আগে সি-আর-দাস-এর মৃত্যুর খবর শুনলাম।

কলকাতার বোর্ডিং-এ ফেরার পর আমাদের রামমোহন রায় হলে শোকসভাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর যেন সব চাপা পড়ে গিয়ে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া বের হওয়ার মত সুরু হল জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের আলোড়ন ১৯২৮ সন থেকে। এই সময়ে হস্টেলে মেয়েদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য সুরু হয়। সকলেই এই রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয় খবরের কাগজে কি বের হচ্ছে না হচ্ছে জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতো। প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ আসার সঙ্গে সঙ্গে বড় স্টাডিরুমে ফোর্থ ইয়ারের কোনো ছাত্রী বিশেষ খবর জোরে জোরে পড়তেন আর আমরা সকলে তাঁকে ঘিরে বসে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব শুনতাম।

১৯২৯ সনে গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে দেখলাম স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছেই হেদুয়ার ওপারে 'হিন্দু হস্টেল' বলে মেয়েদের একটা নতুন হস্টেল হয়েছে এবং আমাদের হস্টেল থেকে যাঁরা এই জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া মনস্থ করলেন তাঁরা সেখানে চলে গেলেন। কারণ আমাদের হস্টেলের কর্তৃপক্ষ সবসময় এ-সব আন্দোলনে মেয়েরা যোগ দেয় পছন্দ করতেন না।

যতীন দাস লাহোর জেলে অনশন শুরু করলেন। ৬৪ দিন অনশনে থাকার পর ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর মারা গেলেন। সেই সময় থেকেই আন্দোলনের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে উঠলো। মৃতদেহ এসে হাওড়া স্টেশনে ১৬ই সেপ্টেম্বর পৌঁছাল এবং সেখান থেকে মিছিল করে কালীঘাটে কেওড়াতলা শ্মশানে দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। শুনেছি এতে যা ভীড় হয়েছিল, সি আর দাসের শ্মশানযাত্রায়ও এত ভীড় হয় নি। ওয়াই-এম-সি-এর ওপর থেকে এই মিছিল দেখবার জন্য হস্টেল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জানতাম যে এই ভীড়ে কিছুই দেখা যাবে না, সেজন্য আমি না যাওয়াতে সঙ্গিনীরা আমার ওপর বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেছিল।

এর কিছুদিন পরেই উদয়শঙ্কর দেশে ফিরে এসে এম্পায়ার থিয়েটারে শ্রীমতী সিম্‌কিকে নিয়ে তাঁর নতুন ধরণের নাচ দেখাতে সুরু করলেন। আমরা নাচের ব্যাখ্যা প্রত্যেকদিন কাগজে পড়ছি, দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা খুবই। কিন্তু হস্টেলের কেউ কেউ অত পয়সা দিয়ে টিকিট কিনতে প্রস্তুত না। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন দেখা গেল বিজ্ঞাপনে লেখা— 'কনশেসন প্রাইস ফর স্টুডেন্টস'। আমরা তক্ষুনি সুনীতিদিকে টিকিট আনিয়ে দেবার জন্য বললাম। খুব ভাল লাগলো এই নাচ দেখে। তখন কলকাতায় এই নাচ সম্বন্ধে চারদিকে খুবই আলোচনা চলছিল।

পূজোর ছুটি হয়ে গেল। আবার ট্রাঙ্ক-বিছানা গুছিয়ে নিয়ে দলবলে সব রওয়ানা হলাম। এবার পুঁটুও সঙ্গে। আমরা ফেরী স্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে যখন পান্ডুঘাটে পৌঁছব-পৌঁছব, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পুঁটুকে বললাম, 'স্টীমার ঘাটে লাগলে তুই কুলী ডেকে মালগুলি তুলিয়ে নিয়ে আয়, আমি দৌড়ে গিয়ে মোটরবাসের টিকিট কিনে জায়গা দখল করি।' কারণ দেরি করে পৌঁছলে আর গাড়ির ধারের

ভাল সিটগুলো পাওয়া যায় না। পুঁটু কুলীর মাথায় মাল চাপিয়ে দিয়ে তো এলো, দুজনে জিনিসপত্তর সব গোছগাছ করে বাসে চড়ে বসতে যাচ্ছি, এর মধ্যে স্টীমারের টিকিট কালেক্টার (বৃদ্ধ গোছের এক বাঙালী ভদ্রলোক) এসে আমায় বললেন, 'দেখ তো মা, এটা কি তোমাদের বিছানা ?' তাকিয়ে দেখি কুলীর মাথায় আমাদের বিছানার হোল্ডঅল। তক্ষুণি বুঝলাম পুঁটুর কান্ড। ট্রাঙ্ক সুটকেস এগুলো তুলিয়েছে, কিন্তু বিছানা ফেলে এসেছে। ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিলাম আর কুলীকেও তার মজুরী দিয়ে দিলাম।

গাড়ি ঠিক সময়ে রওয়ানা হয়ে গৌহাটি শিলং-এর আধাআধি রাস্তায় গিয়ে নংপো স্টেশনে থামলো। এখানে গেট বন্ধ করে দুদিকের যাতায়াতের গাড়িগুলিকে প্রায় আধঘন্টার ওপর আটকিয়ে রাখা হয়। নংপোতে চা ইত্যাদি খাওয়ার জন্য অনেক ছোট ছোট স্টল ছাড়া বড় একটা 'টি-হাউস' ছিল। আমরা সেখানেই অল্পকিছু খেয়ে বিশ্রাম করতাম গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত। টি-হাউসের যে মুসলমান মালিক ছিল বাবাকে সে খুবই খাতির করতো। আমাদের দেখতে পেয়েই সে দৌড়ে তার একটি চাকরগোছের লোককে নিয়ে গিয়ে তার টি-হাউসের আশেপাশের কলাবাগান থেকে প্রকাণ্ড এক কাঁদি কলা নিয়ে এসে হাজির। কাঁচামত সবুজ কলা দেখে আমরা দু'বোনে নিতে রাজী না। ঘোরতর আপত্তি জানালাম। সে কিছুতেই শুনলো না। জোর করে বাসের ড্রাইভার-এর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বুঝিয়ে বলে দিল তাকে, শিলং পৌছে যেন আমাদের মালপত্রের সঙ্গে এই কলার কাঁদি দিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ি পৌছে মাকে বললাম, 'দেখ ত কি জ্বালাতন ! কাঁচা কাঁচা এই প্রকাণ্ড একটা কলার কাঁদি চাপিয়ে দিয়েছে।'

মা তো কলা দেখে মহাখুসী। বললেন, 'ওমা ! বলে কিগো ! কি চমৎকার 'ডিঙ্গামানিক' কলা। দু-দিনে পেকে উঠবে।' এই ডিঙ্গামানিক কলা একরকমের কলা, আমি শুধু নংপোর কাছাকাছি জায়গায় হয় বলে শুনেছি। অতিশয় মিষ্টি, সুস্বাদু এবং বড় বড় সাইজের প্রায় দেড়ফুট আন্দাজ লম্বা।

মা তাড়াতাড়ি কলার কাঁদিটা একটা ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দিয়ে জড়িয়ে ভাঁড়ারঘরের এক কোণায় ঝুলিয়ে রাখলেন। তিন-চারদিনের মধ্যে কলা পেকে হলদে রঙের হয়ে একটা সুন্দর গন্ধ ছড়াতে লাগলো। আমরা দু'বোন যখন খুব আনন্দে কলা খাচ্ছি তখন মা খুব হাসতে লাগলেন। আমরা কলা কাঁচা বলে ওগুলোকে ফেলিয়ে দেবার মতলবে ছিলাম বলে।

ছুটিতে বাড়ি পৌছে সবাই মিলে খুবই হৈ-চৈ। এবারে দিদি মেজদি কেউই নেই। আমরা দুজন গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজে এসে পড়ায় তিনমাস মা-বাবার একা একা কাটাতে হয়েছে। একা একা থাকতে যে তাঁদের খারাপ লাগে, কষ্ট বোধ করতেন, তাঁরা মুখে কিছু বলতেন না। একদিন হঠাৎ মা কথায় কথায় বলে ফেললেন—'তোদের কলকাতা পাঠিয়ে রাতে আমি ঘুমোতে পারি না রে ! ঘড়িটা খাটের পাশের টেবিলে রাখি আর ঘন্টাখানেক পর পর দেশলাই জ্বেলে দেখি ক'টা বেজেছে। দিনটা

কোনরকমে কেটে যায় কিন্তু রাত্তির আর কাটতে চায় না।'

মার কথা শুনে মনে খুবই একটা কষ্ট বোধ করলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে পূজো এসে গেল। অষ্টমীর দিন সন্ধ্যা-আরতি দেখতে গেছি, দেখলাম ঠাকুরের সন্ধ্যাবেলায় ভোগ দেবার জন্য, বিপিনবাবু নামে একজন ভদ্রলোক, থাকতেন আমাদের পাড়াতেই কিন্তু বাড়িটা একটু দূরে, তাঁর স্ত্রী ভারী সুন্দর লাল-লাল রং করা নারকেল দিয়ে লিচু তৈরী করে বারকোশ ভর্তি করে নিয়ে এলেন। সেই নারকেলের লিচু দেখে আমরা সকলেই খুব খুশী। আরতির পর মা ভদ্রমহিলাকে তাঁর ঐ সুন্দর লিচু করার জন্য প্রশংসা করে বললেন, 'আমার টুনু-পুঁটুকে এরকম লিচু করা শিখিয়ে দেবেন কি?'

উনি তো শুনে মহাখুসী। বললেন, 'নিশ্চয়ই, খুব আনন্দের সঙ্গে শিখাইমু। আইজকালকার মাইয়ারা যারা লেখাপড়া করে তারা এই সমস্ত কাজ করতে চায় না।' একটা দিন তখুনি ঠিক করে আমাদের তাঁর বাড়ি দুপুরের পর যেতে বলে দিলেন।

আমি ও পুঁটু কান্তাইকে নিয়ে ভদ্রমহিলার বাড়ি গেলাম। ভদ্রমহিলা নারকেল কুরিয়ে রেখেছিলেন। তারপর কি করে কি করতে হবে সেটা দেখাতে প্রায় সাতদিন লেগে গেল। দেখলাম খুবই ধৈর্য ধরে ধীরে ধীরে অতিশয় নিপুণ হাতে তৈরী করতে হয়। ঐ লিচু করা শিখে নিয়ে কয়দিন পর আমি আর পুঁটু নিজে নিজে চেষ্টা করলাম। আমাদের-গুলোও ভালই হল দেখতে এবং খেতে। ভদ্রমহিলাও আমাদের নিজে করা লিচু দেখে খুব খুশী হলেন। মার কাছে খোয়া ক্ষীর দিয়ে গোলাপজাম করা শিখেছিলাম। এবারে আবার নারকেল দিয়ে লিচু তৈরী করতে শিখে আরও আনন্দ হল।

ছুটি প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তখন সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করা হল আমরা যখন কলকাতা ফিরে আসব, মা-বাবাও আমাদের সঙ্গে কলকাতা চলে আসবেন এবং শীতকালটা কলকাতায় কাটিয়ে গরমের আগে শিলং ফিরে যাবেন। সেইভাবে পূজোর ছুটির পর আমরা সবাই একসঙ্গে কলকাতায় এলাম।

কলকাতায় দিদিরা তখন ভবানীপুরের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে বাড়ি ছিল তাতে থাকতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রকাণ্ড হলঘর এবং তার সঙ্গে তিনটি ফ্ল্যাটযুক্ত বড় তেতলা বাড়ি। একতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন বিখ্যাত গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস। আমরা তাঁকে জর্জ নামে জানতাম। দোতলার ফ্ল্যাটে দিদি ও জামাইদা ছেলে মন্টুকে নিয়ে এবং তেতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন দেবব্রতরই জ্যাঠামশাই, যাঁর মেয়ের নাম ছিল বীণা বিশ্বাস। এক সময়ে এই বীণা বিশ্বাস ও নলিনীরঞ্জন সরকারকে নিয়ে ঘোরতর একটা আলোচনা চলছিল কলকাতায়। বীণা আর আমি একসময়ে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে এক ক্লাসে পড়তাম এবং সেও বোর্ডিং-এই থাকতো। দেবব্রত বিশ্বাসের বোন মাধুরী বিশ্বাসও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে আমার উপরের ক্লাসে পড়তো ও বোর্ডিং-এ থাকতো। সে-ও দেবব্রতর মত অতি সুন্দর গান গাইত। দিদিদের সঙ্গে ঐ ফ্ল্যাটে মা-বাবাও রইলেন সাড়ে পাঁচ মাস।

বাবা প্রায়ই বিকেলে ভবানীপুর থেকে বিডন স্ট্রীটে হস্টেলে আমাকে আর পুঁটুকে

দেখতে আসতেন এবং যেদিনই আসতেন কখনও কোন ফল বা কখনও কোন রকমের মিষ্টি নিয়ে আসতেন। যা-ই আনতেন হস্টেলের সহপাঠিনীদেরও খেতে দিতামই, আবার অনেক সময় এত বেশী পরিমাণে নিয়ে আসতেন যে হস্টেলের সব মেয়েরা মিলে খেতাম। যদি কোন কারণে বাবা দু-একদিন আসতে পারেন নি অমনি হস্টেলের কেউ কেউ বলে ফেলতো, 'বাবা যেন কিছুদিন আসেন নি, ফল আর খেতে পাচ্ছি না।'

আই-এ পরীক্ষার জন্য এবারে তোড়জোড় সুরু হলো। প্রসেসাররা আমাদের যা যা পড়িয়ে দেবার ছিল সে সব পড়িয়ে কি রকম প্রশ্ন সব আসতে পারে বললেন। কেউ কেউ তার তালিম দিতে লাগলেন। ডিসেম্বর মাসে টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। ইংরাজী, বটানি, বাংলা তিনটে বিষয়ে খুবই ভাল নম্বর পেলাম, বটানিতে সায়েন্স ও আর্টস ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথমই হলাম কিন্তু ঐ সিভিক্‌স্ ও লজিক কান ঘেঁষে গেল। টেস্টের পর তিনমাস আর কলেজ যেতে হয়নি। ফাইনাল পরীক্ষার জন্য হস্টেল থেকে আমরা পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে আরম্ভ করলাম।

এর মধ্যে শুনলাম, বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে রচনা লেখার একটা প্রশ্ন থাকতে পারে। বাংলা থিয়েটার স্টেজে কিরকম ভাবে হয়, কিভাবে স্টেজ তৈরী হয় ইত্যাদির কোনই ধারণা নেই। তাই দিদিকে বললাম, একদিন যদি থিয়েটারে যাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর এক সন্ধ্যায় জামাইদার সঙ্গে আমি ও দিদি থিয়েটার দেখতে গেলাম। এই নাটকে শিশির ভাদুড়ী নাদির শাহ্ হয়ে অভিনয় করলেন এবং কঙ্কাবতীও একটা পার্টে 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ' গানটি গাইলেন। তাঁর সেই অপূর্ব গান করার ভঙ্গি ও সুমধুর গলার স্বরে যেন সমস্ত থিয়েটার হলের দ্রষ্টা ও শ্রোতারা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু দেখতে খুব মজা লেগেছিল এবং হাসিও পেয়েছিল শিশির ভাদুড়ীর পায়ে দুই রং-এর দুই রকমের জুতো দেখে। তাঁর খেয়ালই হয়নি যে তিনি বিভিন্ন রকমের জুতো পরে স্টেজে এসে অভিনয় করছেন।

আরেকদিন এই কঙ্কাবতীর গান শুনে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ি। পরীক্ষার সময় বেশী রাত পর্যন্ত কেউ যদি পড়তে চাইত তবে তার নিজের মোমবাতি কিনে সেটা জ্বালিয়ে পড়তে হতো। রাত দশটার পর ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে পড়ার নিয়ম ছিল না। মার্চ মাস পড়েছে, বেশ গরম ভাব, বি-এ পরীক্ষার ছাত্রী শিবুদি তাঁদের শোবার ঘরের পাশেই একটি ছোট ছাদ ছিল তাতে একটা মাদুর বিছিয়ে মোমবাতি জ্বেলে পড়ছে। আমি আমার ঘরে বসে পড়বার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু গরম বোধ করায় ছাদে শিবুদির মাদুরের এক পাশে গিয়ে বসে পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পড়া আর হল না। ঘুম বলে ভূতটি এসে চেপে ধরায় ওখানেই মাদুরের কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন রাত প্রায় বারোটা হবে। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে কানে এলো কে অতি মিষ্টি গলায় গাইছে,—

'তুমি কেমন করে গান কর হে শুনি, আমি অবাক হয়ে শুনি।'

আমি আস্তে আস্তে করে উঠে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি দেখে শিবুদি জিজ্ঞেস

করলে, 'কি দেখছিস ?' আমি বললাম, 'এত সুন্দর গানের আওয়াজ কোত্থেকে আসছে ?'

শিবুদি বললে, 'ঐ দূরের ফ্ল্যাটে কঙ্কাবতী গাইছে।'

আমাদের হস্টেলের পূর্বদিকে একটা বাড়ির তিনতলায় শিশির ভাদুড়ীর ফ্ল্যাট ছিল। সেখানে তিনি কঙ্কাবতীকে নিয়ে থাকতেন। আমি উঠে ছাদের আলসের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম খাটে বসে কঙ্কাবতী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন, আর একটু দূরে শিশির ভাদুড়ী চেয়ারে বসে গান শুনছেন। ঐ বাড়ীরই পাশের দোতলায় আরেকটা ফ্ল্যাটে তাঁর বোন চন্দ্রাবতীকে (যার সঙ্গে আমি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে-এ বছর দুই পড়েছিলাম) একদিন দেখতে পেলাম, কয়েকজন লোকের মধ্যে বসে।

রাতে দাঁড়িয়ে তেতলার ছাদ থেকে গান শুনেছি সে খবর জানি না কি করে সকালবেলায় সুনীতিদির কানে পৌঁছেছে। তিনি থাকতেন দোতলার একটা ঘরে। সকালে যেই নীচের তলায় নেমেছি চা খেতে, তিনি আমায় ধরে খুব বকুনি দিলেন—কেন আমি শ্রীমতী কঙ্কাবতীর গান শুনবার জন্য ছাদে গিয়েছি। আজও তাঁর জানাটার রহস্য আমার কাছে হেঁয়ালির মত। এর কথা আমি আর শিবুদি ছাড়া কেউ জানতো না। আর শিবুদি ওভাবে নালিশ করার মানুষই ছিলেন না। দোতলা থেকেও তেতলার উপরে আসার দরজা বন্ধ থাকতো। সুনীতিদির পক্ষে উপরে এসে দেখা সম্ভবই ছিল না।

যাহোক, সবাই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। এক রবিবার বিকেলে প্রমীলাদি তাঁর জ্যাঠামশাইকে দেখতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে ঠোঙায় করে একটা তোতাফুলি মিষ্টি খেতে দিলেন। আমি খুব খুশী হয়ে সেটা আমাদের ঘরে রেখে পুঁটুকে গিয়ে দোতলার স্টাডি থেকে ডেকে এনে দুজনে ভাগাভাগি করে খেলাম। প্রমীলাদি তাই দেখে বললেন, 'আহা রে! বোনটাকে না দিয়ে খেতে ইচ্ছে হলো না!'

এর পর থেকে যখনি বাড়ি যেতেন আমাদের দু'বোনের জন্য দুটো তোতাফুলি নিয়ে আসতেন।

এর কিছুদিন পরে শুনলাম প্রমীলাদির বিয়ে ঠিক হয়েছে সরোজনলিনী দত্তের ভাই মিস্টার বি-দে মহাশয়ের সঙ্গে। এবং কয়েকদিনের মধ্যে বিয়ে হয়েও গেল। প্রমীলাদি দেখতে ছিলেন ফর্সা ও অপূর্ব সুন্দরী। তাঁকে সাধারণ লালপাড় মোটা বঙ্গলক্ষ্মী মিলের শাড়ি ও সাধারণ মোটা ব্লাউজ পরে কি সুন্দরই না দেখাতো। তাঁর রূপ যেন চারদিকে ফেটে ছড়িয়ে পড়তো।

লর্ড টেনিসন তাঁর 'বেগার মেইড্' কবিতায় যেভাবে 'বেগার মেইড'-এর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন ঠিক সেই রকম। আর বিয়েও হয়েছিল কফেটুয়া রাজা যেভাবে বিয়ে করেছিলেন সেইভাবে বেশ বড়লোকের বাড়িতে। শ্বশুর ও স্বামী দুজনেই আই সি এস্। বিয়ের পর প্রমীলাদি একদিন হস্টেলে আমাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কিন্তু মনে হলো বড়লোকের বাড়ি গিয়ে সর্বাঙ্গে দামী চুনী, মুক্তোর গয়না, পরণে সূক্ষ্ম রঙীন সিল্কের সাড়ি, ঠোঁটে লাল রং, চুল কায়দা করে বাঁধা এই সমস্ত আভরণ ও

সাজসজ্জা আমাদের সেই সুন্দরী প্রমীলাদিকে এক কৃত্রিম মানুষ করে ফেলেছে। তাঁকে দেখে ছ্যাঁৎ করে বুকে একটা বেদনা বোধ করলাম।

প্রমীলাদি চলে যাবার পর আমি বললাম, 'আমাদের নিরাভরণা প্রমীলাদিই তো ভাল ছিল!' এই বলতেই বেলা বললে, 'চুপ! চুপ! বলিসনে।' আর একটি মেয়ে—সে গৌহাটির, পুঁটুর সঙ্গে বেথুন কলেজে পড়তো—সে একেবারে কেঁদে ফেলে বললে, 'আমাদের প্রমীলাদির এ কি দুর্দশা হলো!'

এই মেয়েটির আবার নানারকম অনুভূতি ছিল। আমরা যখন আই-এ পরীক্ষা দিচ্ছি বেথুন কলেজে সিট পড়েছে। দুটি অতিশয় সুন্দরী বোনকে আমাদের গার্ড করা হয়েছে। প্রথমদিন পরীক্ষা দিয়ে এসে সে বললে, 'এরকম সুন্দরী মেয়েদের গার্ড করা ভীষণ অন্যায়। আমরা তাদের দেখবো, না পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর লিখবো!'

জানি না শেষ পর্যন্ত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়ে প্রমীলাদি কতখানি খুসী হয়েছিলেন, কতখানি শান্তি পেয়েছিলেন। যদিও সাময়িক দুঃস্থ অবস্থা থেকে কিছুদিনের জন্য অন্যরকম জীবনের আস্বাদ পেয়েছিলেন, কিন্তু শুনেছি মানসিক বিকারে তাঁর অকালে মৃত্যু হয়েছিল। তবে হয়ত, তাঁর ছেলে যে আজ একজন ঐতিহাসিক হয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন, তা দেখলে তাঁর মনের অবস্থা ফিরে যেত।

আমাদের পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো। পড়াশুনা করে যেতে লাগলাম। হস্টেলে আমাদের সঙ্গে দুটি অসমীয়া মেয়ে ছিল। তাদের একজন কেবলই আমাকে বলতো, 'টুনু! আহ, মুজে ইংরাজী পড়াই দেও।' কিন্তু আমি কখনও অন্য কারো সঙ্গে আলোচনা করে পড়তে পারতাম না। আমি দেখলাম সে ইংরেজী কিছুই বোঝে না, খালি জিজ্ঞেস করতো কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে হলে কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত মুখস্থ করবে। আমার নিজের মুস্কিল হতো ঐ 'সিভিকস্' ও 'লজিক' পড়ার সময়। বই খুলে বসার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে আসতো, হঠাৎ জেগে দেখতাম রাত দশটা বেজে গেছে। সবাই বুদ্ধি দিত চা খেলে রাত জাগা যাবে এবং অনেকে রাত ন'টার পর নিজেরা চা করে খেত। আমার চা খাওয়ার কোন অভ্যেস ছিল না, এ ছাড়া দেখতাম অসময়ে চা খেলে শরীর খারাপ বোধ হয়।

ইতিমধ্যে এলো আবার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাংঘাতিক চাঞ্চল্য। খবর এলো ১৯শে এপ্রিল ১৯৩০ সনে যে বিপ্লববাদীরা 'চিটাগাঙ্গ আর্মারী রেডে' (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) আক্রমণ করে একজন ব্রিটিশ সার্জেন্টকে মেরে ফেলেছে। পরে অনেকে ধরা পড়ে যায়। আরও অনেকে সৈন্যদের গুলিতে মারাও পড়ে। এই দলে বেথুন কলেজের ছাত্রী প্রীতি ওহ্‌দেদার, কল্পনা দত্ত এঁরা ছিলেন। প্রীতি মারা যান। কেউ বা বলে তিনি গুলিতে মারা যান, আবার শোনা যায় যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। কল্পনা দত্তকে ধরে ফেলে। প্রীতি ওহ্‌দেদার-এর সঙ্গে আমার ১৯২৮ সনের কংগ্রেসের সময় খুবই পরিচয় হয়েছিল। কল্পনাকেও মাঝে মাঝে আমাদের হস্টেলে আসতে যেতে দেখেছি। এঁদের বাইরে থেকে দেখে একটুও বোঝা যেত না যে এঁরা এসব দলভুক্ত হয়ে নানারকম ষড়যন্ত্র করছেন।

পরীক্ষা এসে গেল। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পরীক্ষা আরম্ভ হলো। সিট পড়লো বেথুন কলেজে। ইংরেজী, বাংলা মোটামুটি বেশ ভালই হল, বটানিরও অধিকাংশ প্রশ্নই বেশ ভাল জানা। সুতরাং ঘন্টা শেষ হবার আগেই সব প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেললাম। সিভিকস্-এর পরীক্ষা কোনরকমে লিখে দিয়ে এলাম। কিন্তু হল শেষদিনে লজিক পরীক্ষা নিয়ে মুস্কিল। সকালে ছিল 'ডিডাকটিভ লজিক' সেটাও কোনক্রমে সেরে নিলাম। কিন্তু বিকালে 'ইন্ডাকটিভ লজিকে'র প্রশ্নের কাগজ পেয়ে একেবারে চোখে অন্ধকার দেখলাম। প্রশ্ন ছিলও বেশ শক্ত। তবু আস্তে করে মাথা ঠান্ডা করবার চেষ্টা করে উত্তর লিখতে আরম্ভ করলাম। তাবপর এদিক-ওদিক থেকে ফোঁস ফোঁস কান্নার শব্দ। দেখলাম অনেকেই বসে কেবল চোখের জল মুছছে। তারপর কয়েকজন একে একে কাগজে যেটুকু লেখা হয়েছে তাই টেবিলের উপর রেখে দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে একের পর এক বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। এমনি করে চার পাঁচ জনকে বেরিয়ে যেতে দেখে আমিও যে সামান্য প্রশ্নের উত্তর লিখেছিলাম সেই পর্যন্ত লিখে আর কিছু চিন্তা না করে আমার কাগজটাও গার্ডকে দিয়ে হস্টেলে সোজা চলে গেলাম। হস্টেলে গিয়ে রাণুকে বললাম, 'আমিও শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর লিখেছি আর আরেকটা প্রশ্নের অর্ধেক লিখে কাগজ দিয়ে এসেছি।'

রাণু বলল, 'এটা কি করলি ! পরীক্ষার সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোর বসে অন্য প্রশ্নের উত্তর লিখবার চেষ্টা করা উচিত ছিল।'

বিকেলে বাবা হস্টেলে দেখা করতে এলেন, তাঁকে বললাম। শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'যাক, কি আর করা যাবে ! অন্যান্য প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করলে হয়ত পাশ হয়ে যেতে কোনরকমে। এখন ত পরীক্ষায় ফেল হয়েছ বলে সবাই মনে করবে। কে খবর করতে আসবে যে তুমি পরীক্ষার প্রশ্ন পুরো উত্তর না লিখেই উঠে গিয়েছ !'

বাড়ি ফিরে গিয়ে মা-দিদিদের কি বলেছিলেন জানি না। তবে আমার সঙ্গে সকলের যখন দেখা হল কেউ আর কোন আলোচনাই করেন নি। শুধু মা একদিন হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুবই শক্ত প্রশ্ন ছিল কি ?'

এর দিন চার পাঁচ পরেই মা, বাবা ও আমি শিলং রওয়ানা হয়ে গেলাম। পুঁটু বেথুন কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা রইল। তারপর অন্যান্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে একত্র হয়ে বাড়ি এলো।

বাবা বললেন, 'তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতেই হবে। ফেল করেছ বলে বদনাম নিয়ে থাকতে দেবো না।' তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে পড়বার ব্যবস্থার জন্য প্রিন্সিপ্যালকে লিখে দিলেন। সিটি কলেজ হস্টেল থেকে দূরে ছিল বলে যাতায়াতে বড় সময় নষ্ট হতো। স্কটিশচার্চ কলেজ ছিল কাছেই, মাত্র চার-পাঁচ মিনিটের রাস্তা, হেদুয়া পার হয়ে। হস্টেল-এর একেবারে কাছে। এতে ঘোরাফেরার সময় নষ্ট না হয়ে পড়াশুনার বেশী সময় পেতাম।

॥ ৬ ॥
স্কটিশচার্চ কলেজে পড়া

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলকাতা ফেরার দিন ঠিক করে সঙ্গিনীরা সকলে আবার পান্ডুঘাটে একত্র হবার জন্য লেখালেখি হলো।

আমরা দু'বোন শিলং থেকে যাবো। বাবা সকালে আমাদের জন্য বাসের টিকিট করতে গেছেন, গাড়ি দুপুর নাগাদ রওয়ানা হবে। শ্রীযুক্ত বিজয় ভট্টাচার্য, ঐ মোটর কোম্পানীর মালিক, আপিসে ছিলেন। বাবা তাঁকে বললেন, 'মেয়ে দুটির জন্য টিকিট কিনতে এসেছি।' সেই শুনেই তিনি বললেন, 'টিকিট আর কিনছেন কেন ? দাদা (তাঁর বড় ভাই অতুল ভট্টাচার্য) আজ কলকাতা যাচ্ছেন, টুনু-পুঁটুকে তাঁর গাড়িতে করে পান্ডুঘাট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন। প্রাইভেট মোটরগাড়ি, ওতে তো মাল বিশেষ দেওয়া যাবে না। মেয়েদের মালপত্র নিয়ে আসুন ; বাসে পান্ডুঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বাসে যেতে হলে আমাদের দুপুরে রওয়ানা হতে হতো কিন্তু প্রাইভেট গাড়ি বলে আমরা চারটার পর বিকেলে রওয়ানা হয়ে ঘন্টা-তিনেকের মধ্যেই পান্ডুঘাটে পৌঁছে গেলাম।

গ্রীষ্মের ছুটির পর পাহাড় থেকে নামবার পথে, বিশেষ করে 'নংপো' বাস স্টপ থেকে গরমের কষ্ট বোধ করতে থাকতাম। পান্ডুঘাটে পৌঁছে আমাদের মালপত্র বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে সঙ্গিনীরা মিলে সকলে একত্র হয়ে স্টীমারে উঠতে যাবো, অতুলবাবু এসে সব ঠিক আছে কিনা তদারক করে গেলেন।

কলকাতা এসে পৌঁছানোর পর স্কটিশচার্চ কলেজে-এ গেলাম। আমরা হস্টেলে যে পাঁচজন একসঙ্গে ছিলাম সকলকেই ফিরে আসতে হলো আমারই মত আবার পড়তে। সকলেরই কোন না কোন বিষয়ে খারাপ হয়েছিল। পরীক্ষার নম্বর খোঁজ করে জানলাম ইংরাজী, বাংলা, বটানিতে ভাল পাশ করেছি, সিভিকস্, ডিডাকটিভ লজিকেও পাশনম্বর পেয়েছি, কিন্তু ইনডাকটিভ পরীক্ষায় মাত্র দেড়খানা প্রশ্নের উত্তর লিখেছিলাম, সুতরাং ওটাতে লেখা ছিল 'আন্-অ্যাটেম্পটেড—নিল।' মনে মনে ভাবলাম অন্যদের দেখাদেখি উঠে না গিয়ে যদি বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর একটু চেষ্টা করে লিখে ফেলতাম নিশ্চয়ই উতরে যেতাম। নিজের এই অপকর্মের জন্য মনে মনে অনুতাপ করলেও চুপ মেরে রইলাম।

স্কটিশচার্চ কলেজে ডক্টর আরকুহার্ট তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। অতিশয় সজ্জন লোক ছিলেন। প্রতি বছর যেসব মেয়েরা নতুন কলেজে এসে ভর্তি হতো, ডক্টর ও মিসেস্ আরকুহার্ট তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার জন্য একটা টি-পার্টি দিতেন। একদিন আমরা সেই বছরের নতুন মেয়েরা সকলে তাঁদের ওখানে চা খেতে গেলাম।

স্কটিশচার্চ কলেজে প্রতিদিন ক্লাস আরম্ভ হবার আগে বাইবেল পড়া, উপাসনা

ইত্যাদি হতো। আমার স্কুল থেকে এরকম উপাসনায় যোগ দেওয়ার অভ্যেস থাকায় রোজ হলএ যেতাম। এতে সবাই জিজ্ঞেস করতো আমাকে, 'তুমি কি খৃষ্টান ?'

স্কটিশচার্চ কলেজেও মেয়েদের জন্যে আলাদা কমনরুম ছিল। তবে এখানে প্রফেসাররা মেয়েদের ক্লাসে ডেকে নিয়ে যেতেন না। মেয়েরা নিজেরাই দল বেঁধে ক্লাসে যেতো। প্রথম দিনই কমনরুমে ঢুকে দেখলাম রমা বোস (ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকেই এঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল), পরে যিনি রমা চৌধুরী বলে বিশেষ পরিচিত হন, মিনি ব্যানার্জী যিনি একসময়ে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন, সকলে বি-এ পড়ছেন। এই কলেজে আমাদের শিলং-এর অনেক খাসিয়া মেয়েও পড়তো। এবং সকলেই আমার পূর্ব-পরিচিত ছিল। সেজন্য আবার নতুন কোন জায়গায় গিয়েছি মনে হলো না। খাসিয়া মেয়েরা দু'চারজন আমার শিলং স্কুলের সহপাঠিনী ছিল। মাঝে মাঝে তারা নিজেরা যখন খাসিয়া ভাষায় কথা কইত, আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পুরো খাসিয়া ভাষায় সবাই মিলে গল্প করতাম। তাই দেখে বাঙালী মেয়েরা একটু আশ্চর্য হয়ে যেতো। আর কেউ কেউ ঠাট্টা করে আমাকে 'এই খাসিয়ানী' বলে সম্বোধন করতো।

স্কটিশচার্চ কলেজে প্রফেসারদের সঙ্গে সিটি কলেজের প্রফেসারদের মত এতটা ঘনিষ্ঠতা হয় নি। ক্লাসে গিয়ে যে যার পড়ানো শুনে আসতাম মাত্র। কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় তেমন হয় নি। হয়ত সংখ্যায় ছাত্রীর দলও বেশী ছিল বলে।

ইংরাজী পড়াতেন সুশীল মুখার্জি। তিনি রোজ শ্রীরামপুর থেকে পড়াতে আসতেন শুনেছি। তিনি খুব সুন্দর করে পড়াতেন। আর দু'চারজন যাঁরা পড়াতেন তাঁদের কথা স্পষ্ট মনে নেই। লজিকের প্রফেসারের নামও একেবারে মন থেকে বিলুপ্ত। সিভিকস্ পড়াতেন ডক্টর কেলাস্, ইনি সাহেব ছিলেন ও প্রফেসার নটেশন, ইনি ছিলেন মাদ্রাজী। ইনি শীতকালে খুব দামী বিলিতি 'টুইডে'র স্যুট পরতেন। তাঁর ঐ পোশাক দেখে আমরা হাসাহাসি করতাম ও বলতাম নটেশন সাহেব কম্বল কাটিয়ে স্যুট তৈরী করিয়েছেন। আর এখন নিজের স্বামী যদি ঐ কায়দা-দোরস্ত টুইড-কোট গায়ে না দেন তো মন ওঠে না। বাংলা পড়াতেন মন্মথ বোস।—তাঁর কথা বলতে হলে সকলে 'মোনা বোস' বলে উল্লেখ করতো। তিনি এমনিতে ক্লাস নিতে আসতেন সারা সপ্তাহ জুড়ে চাপকান পরে, কিন্তু শনিবারে যেদিন ক্লাস থাকতো, পরে আসতেন ফিন্‌ফিনে কুঁচি দেওয়া ধুতি, বিলিতি কায়দায় সমস্ত বুকের ওপর 'কলপ' দিয়ে শক্ত করা ড্রেস শার্ট ও উপরে গায়ে একটা কালো কোট। পায়ে 'পেটেন্ট' চামড়ার ইভনিং পাম্পসু। তারপর যখন চোখ মুখ ভঙ্গি করে হাত পা নেড়ে মুখ থেকে থুতু উড়িয়ে পড়াতেন তখন আমাদের হাসি চাপা দুরূহ হয়ে দাঁড়াতো। এত বেশী থুতু উড়িয়ে কথা কইতেন বলে আমরা তাঁর নামকরণ করেছিলাম 'থুতু প্রস্রবণ'। আবার একটা কানাঘুষো শুনতাম যে, তিনি নাকি স্টার থিয়েটারে নাচ শেখাতেন।

জুলাই মাসে গ্রীষ্মের ছুটির পর ক্লাস আরম্ভ হল। তখনও সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আন্দোলন চলছে, কলেজে পড়া বারণ। তাই একদল ছাত্র অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস

করায় বাধা দিতে আরম্ভ করলো। প্রথম প্রথম তারা স্কটিশচার্চ কলেজের গেটের সামনে বসে সকলকে কলেজে ঢুকতে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। কিন্তু সব সময় ঠিক পেরে উঠতো না, কারণ একটু ফাঁকতালে যাবার রাস্তা পেলেই অন্য ছাত্ররা বা আমরা ছাত্রীরা ঢুকে পড়তাম। ঐ মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রী নিয়েই ক্লাস হোত। কিন্তু যারা পিকেটিং করতো তারা দেখলো শুধু দাঁড়িয়ে বা বসে ঠিকমত গেট আটকাতে পারছে না। তখন তারা নতুন কৌশল করে শুয়ে পড়তে আরম্ভ করলো, যাতে তাদের মাড়িয়ে কেউ কলেজে ঢুকতে না পারে। ছাত্র-ছাত্রী যারা ক্লাস করবার জন্য কলেজে ঢুকতে চেষ্টা করতো তাদের সাহায্য করবার জন্য কোনো কোনো ছাত্র যারা কোনক্রমে আগে ঢুকে গিয়েছে হাত বাড়িয়ে পথ করে দেবার চেষ্টা করতো। অনেকদিন ডক্টর আরকুহার্ট স্বয়ং নিজে এসে দাঁড়িয়ে 'কাম এলং মাইডিয়ার' বলে হাত বাড়িয়ে দিতেন।

একদিন আমার এক সহপাঠিনী কলেজে ঢুকতে চাইছে, কিন্তু শুয়ে পড়া ছেলেদের মাড়িয়ে ঢোকা সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে একটি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র পিকেটিং শুরু হবার আগেই ঢুকে পড়েছিল, সে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত বাড়িয়ে সহপাঠিনীকে বললো, 'আমার হাতের ওপর পা দিয়ে চলে আসুন।' সহপাঠিনীটি তাই করলে। আমরা শুনে তার ওপর বেশ বিরক্ত হলাম যে এভাবে ঢোকাটা বিশেষ অশোভন ও অনুচিত হয়েছে।

যারা জোর পিকেটিং করেছিল তাদের অনেকের নাম কেটে দেওয়া হয় কলেজ থেকে। আমাদের ক্লাসের একটি ছাত্র ছিল তাদের মধ্যে একজন। একদিন ডক্টর কেলাস আমাদের সিভিকস্ ক্লাস পড়াতে আরম্ভ করবার আগে রেজিস্ট্রি খাতায় যারা উপস্থিত নম্বর ধরে ডেকে দাগ কেটে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটি নম্বর ধরে ডেকেছেন এবং 'ইয়েস্ স্যার' শোনামাত্র একটু হকচকিয়ে পেছনের বেঞ্চির দিকে তাকিয়েই বললেন, 'তোমাকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তুমি কেন আবার ক্লাসে ঢুকেছ? এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।' এই বলার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রটির হাতে একটি ছোট ব্যাটন মত লাঠি ছিল, সেটা সে মাথার ওপর ঘুরিয়ে 'চললাম ভাই' বলে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে খাসিয়া মেয়েরা ও একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাই হুড়হুড় করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়লো। ডক্টর কেলাস্ আবার সকলের নম্বর ধরে ডেকে আমরা যারা রইলাম তাদের পড়ালেন। আমাদের হস্টেলে আরেকটি ছাত্রী স্কটিশচার্চে আমার বছরেই ছিল, সে-ও ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছিল। হস্টেলে ফিরে এসে শুনলাম সে আমার নামে অন্যান্যদের কাছে বলেছে যে, আমার কোন সহানুভূতি নেই। বেথুন কলেজের অন্যান্য মেয়েরা আমাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করলো যে আমার বিশেষ অন্যায় হয়েছে। আমি বললাম, 'আমি মনে করি, যারা ছেলেটির প্রতি পক্ষপাত দেখাবার জন্য অমন করে ক্লাস থেকে বেরিয়েছে তারাই অন্যায় করেছে। কারণ তাকে যখন কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, এরপর আর তার কলেজে ঢোকার কোন অধিকার নেই। এবং সে দোষ করেছে বলেই কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে কলেজ থেকে তার নাম কেটে দিতে।'

এর একদিন পর একটু সকাল সকাল গিয়ে কলেজে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সেদিন উঠলো হাঙ্গামা চরমে। ছাত্রের দল যারা পিকেটিং করছিল, হঠাৎ তারা হুড়মুড় করে কলেজে ঢুকে এসে আমাদের কমনরুমের দরজার বাইরে শুয়ে পড়লো। আমরা সবাই কলেজ-সুদ্ধ মেয়েরা ঘরে বন্দী। কেউ ক্লাসে যেতে পারি না। হস্টেলে কিম্বা বাড়ি যাবারও কারো উপায় নেই। মেয়েরা সকালে এসে পড়েছে, কারোরই খাওয়া হয় নি। হস্টেলে সুনীতিদি খবর পেয়ে আমাদের বিধু-ঝিকে নিয়ে হস্টেলের মেয়ে ছাড়াও অন্যান্য ছাত্রীদের জন্যও দুপুরের খাবার গুছিয়ে নিয়ে এলেন। এসে খুব ধমকে ছেলেদের বললেন, 'পথ ছাড় বলছি, আমার বাছাদের কি উপোস রেখে মারতে চাইছো !' সঙ্গে সঙ্গে বিধু-ঝিও ভাত, ডাল ইত্যাদিতে ভরা বাসনপত্র কাঁধে নিয়ে হাতে পরিবেশন করার জন্য হাতা যেটা নিয়ে এসেছিল সেটা তুলে রণচণ্ডী মূর্তিতে খুব চেঁচামেচি করে বকাবকি করতে আরম্ভ করলো। তাই শুনে তারা আস্তে করে পথ ছেড়ে দিল খাবার নিয়ে ঢোকবার জন্য। আমরা সবাই খাওয়া-দাওয়া করে বসে রইলাম। পরে বিকেল পাঁচটা নাগাদ তারা উঠে চলে যেতে আমরা যে যার হস্টেলে বা বাড়ি ফিরলাম। তারপর ঠিক করলাম যে, এই গণ্ডগোল না মেটা পর্যন্ত আর কলেজে যাবো না।

তবে যারা পিকেটিং করতো তারা এক মজা করতো। জুলাই মাসের ঐ গরম রোদ্দুরে যখন তাদের খুব অসহ্য বোধ হত, পালা করে হেদোর জলে ঝুপ করে একটা ডুব দিয়ে এসে চাঙাড়ি ভর্তি খাবার কিনে এনে খেতো।

কিছুদিন পর আস্তে আস্তে সব হুজুগ ও উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ হয়ে গেল ও কলেজ খুলে নিয়মমত ক্লাস-এ পড়া আরম্ভ হলো।

এর মধ্যে বন্ধু রাণুর বিয়ে এসে গেল। সিটি কলেজের ইকনমিক্সের প্রফেসার শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সেনের সঙ্গে বিয়ে হল এবং বিয়ের পরই শ্রীযুক্ত সেন বিলেত গেলেন গবেষণা করবার জন্য।

কলেজের ক্লাস যথারীতি চলতে লাগলো, কিন্তু ছাত্রছাত্রী-মহলে স্বদেশী আন্দোলনে ও বিপ্লববাদীরা নানাজনকে গুলি করে মারায় চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। পুলিশ বিশেষভাবে হস্টেলগুলিতে খানাতল্লাসী শুরু করলো। মেয়েদের একটি হস্টেল ছিল বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে (এর ও আমাদের একই ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষ) এবং আর একটি ছিল হিন্দু হস্টেল বিডন স্ট্রীটে। এ দুটোর ওপরই পুলিশের নজর ছিল বেশী। শুনতাম প্রায়ই পুলিশ সে-সব হস্টেলে শেষ রাত্তিরে হানা দিয়েছে। আমাদের হস্টেলে পুলিশ একদিনও আসে নি এবং আমাদের মধ্যে কেউ এই বিশেষ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল না। প্রথমদিকে যে কয়জন ছিল, হিন্দু হস্টেল খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেখানে চলে যায়। এই সময়ে হিন্দু হস্টেলের কোন কোন ছাত্রী দুজন, তিনজন মিলে কাঁধে ক'রে খদ্দরের থান নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিক্রী করা শুরু করলো।

মেয়েদের পড়াশুনা না করে এসব স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে চেঁচামেচি করা সুনীতিদি মোটে পছন্দ করতেন না।

এরপর আবার পূজোর ছুটি এসে গেল। এবারে পূজোর সময় মেজদিও বর্মা দেশ-এর বেসিন থেকে শিলং এলেন তাঁর দেড় বছরের মেয়ে রুবিকে নিয়ে। মা ও বাবা এবং মেজদি এ বছরের শীতকালটা শিলং-এই কাটালেন।

আমরা দু'বোনে শিলং থেকে ছুটির পর ফিরে এলাম হস্টেলে। পড়াশুনা সব ঠিকমত চলছে, এর মধ্যে আবার বিপ্লববাদীর আন্দোলন শুরু হলো। ১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে বিপ্লববাদীর দল সাহেবদের উপর গুলি চালিয়ে মারা আরম্ভ করলো। হস্টেলে মেয়েদের মধ্যে সাংঘাতিক উত্তেজনা। আমাদের টেস্ট পরীক্ষা সুরু হয়েছে। একদিন সকালবেলায় পরীক্ষার হলে যাবার আগে এক সহপাঠিনী (সে বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের হস্টেলে থাকতো) আমায় বললে, তোর বইটা একটু দে, একটু চোখ বুলিয়ে নিই। কাল মামা-বাড়ি গিয়েছিলাম, কিছুই পড়তে পারিনি। পরীক্ষার পর হল থেকে ফেরার পর আরেক সহপাঠিনী আমার কানে কানে বললো, 'আসল মামাবাড়িই গিয়েছিল! গতকাল পুলিসে ধরে নিয়ে জেলখানায় পুরে রেখেছিল। আজ সকালে ছাড়া পেয়ে সোজা পরীক্ষা দিতে এসেছে।' পরে শুনেছিলাম সে বিপ্লবী দলের একজন।

কাগজে খবর বের হলো ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সনে তিনজন বিপ্লবাবাদী রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে কর্ণেল সিম্পসনকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। তাদের দুজন পটাসিয়াম সায়নেড খেয়ে আত্মহত্যা করে, কিন্তু দীনেশ গুপ্ত নামে একজন বেঁচে গেছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দীনেশ গুপ্ত নাম কাগজে পড়ে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। দীনেশ গুপ্ত নামটা কেমন যেন চেনা-চেনা। তারপর মনে পড়লো ইনি আমাদের সুপ্রভার সম্পর্কিত ভাই 'দীনেশদা' নয় তো? সুপ্রভা ও আমি একসঙ্গে একই ক্লাসে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়তাম ও বোর্ডিং-এ থাকতাম। এই সুপ্রভা সেই যার সঙ্গে পরে বিভূতিবাবুর খুবই অন্তরঙ্গতা ও আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। এই ছাত্রটি প্রায়ই শনি-রবিবারে বোর্ডিং-এ সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে আসতো। দেখতে বেশ সুশ্রী, খুবই নিরীহ গোছের ছিল। তার পক্ষে এই হিংস্র কাজে যাওয়া কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল।

টেস্ট পরীক্ষার পর ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি, এর মধ্যে কেউ কেউ, হস্টেল থেকে যাঁরা বি-এ পাশ করেছিলেন, তাঁরা ১৯৩১ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার ইউনিভার্সিটিতে কন্‌ভোকেশন গেলেন। ফিরে এলে পর তাঁদের মধ্যে সাংঘাতিক উত্তেজনা। শুনলাম স্যর স্ট্যানলি স্যাকসন, যিনি বাংলা দেশের গর্ভনর এবং কলকাতার ইউনিভার্সিটির চ্যান্‌সেলারও ছিলেন, যেই বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছেন, বীণা দাশ—তিনিও একজন বি-এ পাশ করা ছাত্রী—উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কনভোকেশন গাউনের ভেতর থেকে রিভলবার বার করে গুলি ছুঁড়েছেন, কিন্তু তখনি ভাইস্‌চ্যানসেলার সুহরাবর্দী সাহেব তাঁকে ধরে ফেললেন। শুনেছি তার পরেরদিনই ভাইস্‌চ্যানসেলার সুহরাবর্দী সাহেব 'নাইটহুড' পদ পেয়েছিলেন। বীণা দাশের বিচার হয়ে বেশ কিছুদিন তাঁকে জেলে আটক থাকতে হয়েছিল। বীণা দাশ ও তার দিদি

কল্যাণী দাশ দুজনের সঙ্গে ১৯২৮ সনের কংগ্রেসের সময় আমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয় ভলান্টিয়ার হিসাবে। কল্যাণী দাশকেও অনেকদিন স্বদেশী আন্দোলনের জন্য জেলে থাকতে হয়েছিল। পরে কল্যাণীদি দিল্লীতেও বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন, তাঁর স্বামী ডাক্তার ভট্টাচার্য যখন তাঁর কাজে দিল্লী বদলী হয়ে এসেছিলেন। সে সময় দিল্লীতে কল্যাণীদির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো।

পরীক্ষা এপ্রিল মাসে হয়ে যাওয়ার পর আবার শিলং চলে গেলাম। বাড়ি গিয়ে দেখলাম মেজদির কোলে আরেকটি সুন্দর টুকটুকে ছোট শিশু। বহুবছর পর মেজদির বড় মেয়ে বছর দুয়েকের ও এই চার মাসের শিশুকে পেয়ে আমাদের বেজায় আনন্দ।

জুন মাসের শেষে আমাদের পরীক্ষার ফল বের হলো। এ বছরের পরীক্ষাতেও অন্যান্য বিষয়ে খুব ভাল লিখে লজিক ও সিভিকস্ কোনরকমে সেরেছিলাম। পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর জানলাম অন্যান্য বিষয়গুলিতে খুবই ভাল পাশ করেছি, কিন্তু ঐ দুই বিষয়ে একেবারে কান ঘেঁষে উতরে গেছি। দু-দুটো বিষয়ের নম্বর কম খুবই গুরুতর কথা। এতে কোনরকম পজিশনই হলো না। পরীক্ষায় পাশ হয়েছি এইমাত্র।

আমার বিয়ের পর উনি সব শুনে এবং আমার কিসে উৎসাহ ইত্যাদি দেখে বরাবরই বলে আসছেন—'তোমার আর্টস না পড়ে সায়েন্স পড়া উচিত ছিল, তাহলে খুবই নাম করে বেরিয়ে আসতে।'

আমাদের পরীক্ষার ফল জানার পর বাবা আমাদের বি-এ ক্লাসের সিট-এর জন্য স্কটিশচার্চ কলেজে লিখবার জন্য কাগজ নিয়ে বসেছেন দেখে আমি বললাম, 'বাবা, এখন শুধু পুঁটুর সিটের জন্যই লেখ। আমি এ-বছরে আর কলকাতা যেতে চাইছি না।' বাবা কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললাম, 'আপাততঃ সিলেবাস্ আনিয়ে বাড়িতেই পড়াশুনা করি এবং প্রাইভেটেই পরীক্ষা দেবো। তোমাদের একা একা রেখে গিয়ে মনটা খুবই অস্থির থাকে, তা ছাড়া হস্টেলের ঐ সকলে মিলে গণ্ডগোলে ও কলকাতার ইঁট-পাটকেলের মধ্যে আমার আর থাকতে ভাল লাগছে না।'

বাবা বললেন, 'আচ্ছা, তোর ইচ্ছামতই সব হবে। পুঁটুর জন্য স্কটিশচার্চ কলেজে লিখে দিই।'

পুঁটু কলেজ খুলবার সময়েই কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেল। বলে দিলাম সে যেন গিয়ে আমার পাঠ্যপুস্তকগুলির নামধাম সব জানায়। এবারে আর যে-সব বিষয় পড়বার কোন উৎসাহ নেই তার ধারে-কাছে যাবো না। ঠিক করলাম ইংরেজী, বাংলা ছাড়া বটানি তো নেবোই এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত বাংলা পড়বো।

পুঁটু সব বইএর নাম জানানোর পর বইপত্র কিছু যোগাড় করে নাড়াচাড়া আরম্ভ করলাম। তবে পড়াশোনা বিশেষ করতে পারিনি। কারণ প্রায়ই মার সঙ্গে সংসারের কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে হতো। আমাদের পুরোনো চাকর অসুস্থ হয়ে দেশে চলে যাওয়ার পরে আর সুবিধেমত লোক পাওয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো। তা ছাড়া সেই সময়ে আমার মেজদিদি দুই শিশুকন্যা নিয়ে শিলংএ। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য শিশুদের দেখাশোনা করার ভারও আমার উপর পড়লো। মেজদি ছোট মেয়েটিকে

স্নান করিয়ে তার বোতলে দুধ ভর্তি করে আমার জিম্মায় করে দিতেন, আমি তাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতাম। সেই সময় মেজদি বড় মেয়েটিকে নিয়ে স্নান করানো, খাওয়ানো এসব কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমনি করে দিন কেটে যেতে লাগলো এবং দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল।

এর মধ্যে মণিদা বেসিন থেকে বাবাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি পূজোর সময় মেজদি ও মেয়ে দুটিকে নিয়ে যাবেন বলে শীগ্‌গীরই আসবেন বলে ঠিক করেছেন। সেই খবর পাওয়ার পর বাবা জামাইদা ও দিদিকেও লিখে পাঠালেন, মন্টুকে নিয়ে ওঁরাও যেন পূজোর সময় শিলং আসেন। তিনি এও লিখলেন, 'উষা বেসিন চলে যাবার আগে আমার বিশেষ ইচ্ছা সকলে মিলে আমরা একত্র হই। ঐ দূর দেশ থেকে উষার পক্ষে আবার কবে আসা সম্ভব হবে কে জানে।'

পূজোর দিনতিনেক আগে দিদিরা তিনজন এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে হস্টেল থেকে পুঁটুও এল। আর এলেন কেষ্টদা, ইনি জামাইদার মাসতুতো ভাই। বহুকাল ধরে তাঁর শিলং দেখবার ইচ্ছে রয়েছে জেনে বাবা তাঁকেও দিদিদের সঙ্গে আসবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন। বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এত লোক—ঘরে ঘরে অতিরিক্ত খাট পড়লো। খাট ফেলে শোবার জায়গা হলো না কেবল আমার। পুঁটু ছোট মেয়ে, সে দিব্যি রোজ রাতে মায়ের লেপের ভিতর গিয়ে ঢুকতো। আমায় মেঝেতে বিছানা করে শুতে হতো এবং ভোরে সেটা গুটিয়ে নিয়ে তুলে রাখতাম। রাত্তিরে সব কাজকর্ম সেরে এসে নিজের বিছানা পাতছি দেখে বাবা পুঁটুকে দিলেন খুব বকুনি। বললেন, 'রোজ দেখি তুই দিব্যি আগে আগে গিয়ে শুয়ে পড়িস আর টুনু নিজে এসে বিছানা পেতে তবে শোয়। টুনু তোর দিদি হয়, তুই পারিস না ওর বিছানাটা করে রাখতে ?' বকুনি খেয়ে পুঁটুর হুঁস হল যে ওরকম ভাবে আগে আগে শুয়ে পড়াটা অন্যায় কাজ হয়েছে।

কয়দিন পরে মণিদাও বেসিন থেকে এসে পৌঁছলেন। এতলোকের রান্নাবান্না, খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতে মার মাথা তুলবার সময় নেই। মা-র সঙ্গে সঙ্গে আমিও সব সময় রান্নাঘরে ব্যস্ত। সবাই এদিক-ওদিক বেড়াতে যাচ্ছে।

এর মধ্যে সবাই মিলে একদিন চেরাপুঞ্জি বেড়াতে যাওয়া ঠিক হলো। আমি আর পুঁটু আগে কখনো চেরাপুঞ্জি দেখি নি, তাই আমরাও যাবো বলে ঠিক করলাম। একটা বড় ট্যাক্সি ভাড়া করা হল। খাবারদাবার নিয়ে যাওয়া হবে। আগের দিন আমি 'স্টিম পুডিং' ইক্‌মিক্ কুকারে তৈরী করলাম। দিদি ও মেজদি দুজনে মিলে 'সিঙ্গাড়া', 'স্যান্ডউইচ্' ইত্যাদি তৈরী করলেন আর যেদিন যাবো সেদিন শেষরাত্তিরে উঠে মা সকলের জন্য খিচুড়ি, আলুর দম, বেগুনভাজা রেঁধে দিলেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে সকাল দেখে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। অসম্ভব কুয়াশায় চারদিক অন্ধকার, আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা আর সমানে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কি করা হবে না হবে বলাবলি হচ্ছে। ট্যাক্সিও এসে পৌঁছে গেছে। বাবা বললেন, 'এদেশে তো কিছুই ঠিক নেই, হয়তো ঘন্টাখানেক পরে সব কুয়াশা মেঘ কেটে দিন ভাল হয়ে যাবে ; এর অপেক্ষায়

না থেকে সকলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরী হয়ে রওয়ানা হয়ে পড়ো, পরে কি রকম দিন হবে কিছুই বলা যায় না।'

· সকাল নয়টার সময় জামাইদা, মণিদা, কেষ্টদা, দিদি, পুঁটু, মন্টু ও আমি খাবার-দাবার নিয়ে ট্যাক্সিতে রওয়ানা হলাম। আমাদের সকলের পথপ্রদর্শক হয়ে দাদাও (বীরেন, খুড়তুতো ভাই) গেল। দাদাকে বরাবর সীলেট থেকে চেরাপুঞ্জি হয়েই শিলং আসতে হতো। সেজন্য তার ঐ দিকটা খুব ভাল জানা ছিল।

যত আমরা যাচ্ছি তত চারিদিক ঘন কুয়াশায় অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো। তারপর নামলো সাংঘাতিক জোরে মুষলধারে বৃষ্টি। ট্যাক্সি ড্রাইভার কোনক্রমে গাড়ি নিয়ে একটা পথের ধারের গাছতলাতে দাঁড় করিয়ে রাখলো। আধ ঘন্টাখানেক থেমে বৃষ্টির ধারা একটু কমে এলে আবার রওয়ানা হয়ে কোনক্রমে চেরাপুঞ্জি গিয়ে পৌঁছলাম। সমানে বৃষ্টি পড়ছে। সকলে গাড়ি থেকে ছাতা মাথায় দিয়ে সব খাসিয়া বস্তি—ছোট ছোট, নীচু নীচু খড়ের চালের ঘর এবং সব খুপরি ঘরগুলিতেই এককোণায় ঠান্ডার মধ্যে আগুন জ্বলছে দেখলাম। এ খুপরি, ও খুপরি ঘুরে ঘুরে বেশ পরিস্কার দেখে একটা পরিবারের সঙ্গে কথা কয়ে দাদা ঠিক করলেন যে, ওখানে আমাদের খাবারদাবার নিয়ে কিছুক্ষণ বসে খাওয়াদাওয়া সারা হবে। তাই হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর ক্রমে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে দিন পরিস্কার হয়ে গেল।

তখন সকলে মিলে চারদিক বেড়াতে বেড়াতে চেরাপুঞ্জি থেকে সীলেট যাবার রাস্তায় ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত যে উৎরাই ধরে পাহাড় নামতে হয় সেটা দিয়ে নীচে নেমে যেতে লাগলাম। প্রায় আধাআধি পাহাড় নামার পর দাদা বললেন, 'আর নামা উচিত হবে না, চলো সবাই ফিরে।' নামবার সময় তো তরতর করে নেমে গিয়েছিলাম, কিন্তু চড়াই-এর সময় পাহাড় বেয়ে উপরে উঠবার বেলায় হলো শাস্তি। এই সাংঘাতিক চড়াই—সকলে ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছি আর এক পা, দু পা করে উঠছি। জামাইদা, মণিদার সঙ্গে ছাতা ছিল, তাঁরা ছাতায় ভর করে উঠছেন, দিদি ও পুঁটুর হাতেও ছিল লম্বা বাঁটওয়ালা মেয়েদের ছাতা, সুতরাং তাদেরও ওঠার কোন অসুবিধা নেই। দাদা ও কেষ্টদা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে দুটো লাঠি করে নিলেন। তাঁরাও ওতে ভর করে উঠছেন। কিন্তু আমি পড়লাম ভীষণ মুস্কিলে। আমার হাতে ছিল মেয়েদের বেঁটে ছাতা, ওতে মাটি নাগাল পাওয়া যায় না, সেজন্য ভরও দেওয়া অসুবিধে। পাহাড়ে উঠতে গিয়ে দেখি কোন কিছুতে ভর না করে ওঠা ভয়ঙ্কর কষ্টকর। কোনক্রমে উঠছি আর ভাবছি কি করা যায়। হঠাৎ মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি এলো। কেষ্টদা ছিলেন নেহাৎ নিরীহ মানুষ। লক্ষ্য করলাম তিনি আমার আগে আগে গাছের ডালের লাঠি ভর করে বেশ দিব্যি উঠছেন। আমি তাড়াতাড়ি কয়েক পা কোনক্রমে উঠে গিয়ে কেষ্টদাকে ধরে ফেললাম এবং তাঁর পাশ দিয়ে পাহাড় উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার বেঁটে ছাতাটা কেষ্টদার পায়ের কাছে ফেলে খ্যাচাং করে টেনে তার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ উঠে গেলাম। পেছন থেকে কেষ্টদা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন—'এই টুনু! এ কি করলে? আমার লাঠিটা নিয়ে নিলে কেন বাপু! বলছি শিগ্‌গীর ফেরত

দাও।' কে কার কথা শোনে। আমি সেই গাছের ডালের লাঠিতে ভর করে মনের আনন্দে ওপরে উঠে গেলাম। আবার সবাই মিলে উপরে উঠে গিয়ে গাছতলায় বসে বাকী খাবারদাবার ও ফ্লাস্কের চা ইত্যাদি খেয়ে শিলং রওয়ানা হলাম।

মাঝপথে আবার বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়ে গেল। বাড়ি পৌঁছে লাগলো আরেক কুরুক্ষেত্র। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে মেজদি চোখ পাকিয়ে আমায় সাংঘাতিক বকতে লাগলেন। বললেন, 'কি বদ্ অভ্যেস করে দিয়েছিস মেয়েটার রোজ ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়িয়ে ! আমি সারাদিন ধরে ওকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নাকাল হয়ে গেলাম। ওটা ঘুমায় না, এদিক রুবুকে চান করানো, খাওয়ানো আছে, তারপর বাড়িতে এত লোকের রান্নাবান্নার জন্য মাকে সাহায্য করা দরকার।'

সারাদিন স্ফূর্তি করে ঘুরে বাড়ি এসে মেজদির বকুনিতে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

সকলের শিলং থেকে ফেরার দিন ঘনিয়ে এলো। প্রথমে মেজদি মণিদার সঙ্গে মেয়েদের নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে কুমিল্লা চলে গেলেন। কেষ্টদা কামাখ্যার মন্দির দর্শন করে কলকাতা ফিরবেন মনস্থ করে দুদিন পর গৌহাটি গেলেন। জামাইদা, দিদি, পুঁটু কালীপূজোর পরে কলকাতা রওয়ানা হলেন। কলকাতা রওয়ানা হবার আগে জামাইদা বাবাকে অনেক করে বললেন, 'আপনারা এখানে না থেকে শীতকালটা কলকাতা এসে কাটিয়ে যান। আমাদের কাছেই থেকে আসবেন। আমাকেও বার বার বলে গেলেন যেন মা-বাবাকে নিয়ে কলকাতা চলে যাই, এবং এও বললেন যে আমারও প্রাইভেটে পড়ার জন্য কলকাতা গিয়ে প্রফেসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব ব্যবস্থা করা যাবে।'

ওঁরা সকলে চলে যেতে আমি ও মা কলকাতা যাবার জন্য গোছগাছ আরম্ভ করলাম। মাসখানেক পরেই মা, বাবা ও আমি শিলং থেকে কলকাতা রওয়ানা হয়ে পড়লাম।

শিলং থেকে বেরিয়েই রাস্তার দুধারে যে দৃশ্য দেখলাম, জীবনে তা ভুলবার নয়। মাইলের পর মাইল কমলালেবুর বাগান। গাছগুলিতে কমলালেবু পেকে এক সোনালী রং-এর পাহাড় বলে মনে হচ্ছে আর আমাদের গাড়ি যেন তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। আমরা যথারীতি কলকাতা গিয়ে পৌঁছলাম এবং দিদির বাড়িতেই উঠলাম। দিদিরা তখন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্র রায় রোডের একটা বড় বাড়ির দোতলায় একটা বড় ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন।

শিলং থেকে কলকাতা এলাম শুধু শীতকাল কাটাতেই নয়, ভাবলাম নিজের পড়াশুনার একটা সুবন্দোবস্ত করা যাবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধি করেন আর। কলকাতা আসার মাস-দুয়েকের মধ্যেই আমার ছাত্রীজীবনের পর্ব, যে জীবন উন্মুক্ত হাওয়ার মত ছিল, ছেড়ে দিয়ে প্রবেশ করতে হল দায়িত্বপূর্ণ বিবাহিত জীবনে। তবে সেই জীবনও সুখের জীবনই হয়ে চলেছে।

আজ আমার নাতি-নাতনীদের কাছে ছাত্রীজীবনের গল্প শেষ করে দীর্ঘ সাতান্ন বছরের বিবাহিত জীবনের আনন্দ, দুঃখ-সুখের গল্প বলা শুরু করবো। দীর্ঘদিনের জীবনপ্রদীপের উজ্জ্বল দীপশিখা আজ নিববার মত হয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও মনে হয় এ তো এই সেদিনের কথা। মাত্র সেদিন এসব ঘটনা ঘটেছিল। নিজেকেও এখনও অশীতি বছরের বৃদ্ধা বলে মনে করি না। এখনও আমি যেন স্কুলের দুষ্টু মেয়েটিই আছি। আমার স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা যাঁরা তাঁদের অঢেল স্নেহমমতা দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন, অনেকেই বোধহয় আর ইহজগতে নেই এবং যাঁরাও বা আছেন তাঁদের উদ্দেশে আমার ভক্তিভরা প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পর্ব শেষ করছি।

আমার ভাই ছিল না কিন্তু যাঁরা আমার ছাত্রীজীবনে এসে নিজের ভাই-এর মত ব্যবহার করতেন, পড়াশুনা ইত্যাদি সব রকমে সাহায্য করতেন—শোভনদা, কেষ্টদা, খোকাদা, দাদা (বীরেন), পুণ্যব্রত—তাঁরা আমার বিয়ের পরেও নানাভাবে খোঁজখবর রাখা সব করে গেছেন। আর এঁরা প্রায় সকলেই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহের কথা কখনই ভুলতে পারবো না। তাঁদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করলাম।

তৃতীয় অধ্যায়
বিবাহ ও কলকাতায় দশ বছর

১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসের শেষে আমি, মা ও বাবা কবে আবার শিলং ফিরবো এসব জল্পনা-কল্পনা করে ঠিক করা হল যে, হয় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কিম্বা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রওয়ানা হয়ে যাবো, গরম বেশী পড়বার আগেই।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে বাবা খুব পঞ্জিকা নাড়াচাড়া সুরু করেছেন কবে রওয়ানা হওয়া যায় তার দিনক্ষণ দেখতে। হঠাৎ পুঁটু একদিন দুপুরে হস্টেলের বেয়ারা শিবরামের কাঁধে তার বিছানা-বাক্স চাপিয়ে এসে উপস্থিত। বললে তার জ্বর হয়েছে ও সারা গায়ে জলবসন্ত বেরিয়েছে। তক্ষুনি আমি ও মা যে ঘরে থাকতাম তা থেকে আমার বিছানা জিনিষপত্র বের করে নিয়ে পুঁটুর বিছানা ইত্যাদি দিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল এবং পুঁটুর সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য মা-ও সেই ঘরেই রয়ে গেলেন।

আমাদের বাড়ীতে বরাবরই ছোঁয়াচে রোগে আলাদা থাকবার সব নিয়ম খুব বেশী মানা হতো। আমাকে ও দিদির ছেলে মন্টুকে ঐ ঘরের ধারেকাছে যেতে দেওয়া হতো না। অগত্যা আমাকে খাবার ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিতে হল।

॥ ১ ॥

বিয়ের প্রস্তাব ও উদ্যোগ

দিদির ননদ সুরমাদি ঐ বাড়ীরই ঠিক নীচের একতলায় একটা ফ্ল্যাটে তখন থাকতেন। একদিন হঠাৎ সুরমাদি এসে দিদি, জামাইদা, মা ও বাবাকে যেন কি বললেন। আমার কানে এলো বাবা সুরমাদিকে বলছেন, বেশ ত, তুমি কথাবার্তা চালাতে থাকো। সুরমাদি রোজই সন্ধ্যেবেলা এসে ওঁদের সঙ্গে কতক্ষণ খুব আলোচনা করে যেতে লাগলেন। দিন চার-পাঁচ পরে দিদি একদিন আমায় নিয়ে সিঙ্গাড়া তৈরী করতে বসলেন। বললেন, আজ বিকেলে বাবাদের বহুকালের চেনা এক ভদ্রলোক, আমাদের শিলং-এর আশা-পুতুলের পিসেমশায় আসবেন ; একটু চায়ের বন্দোবস্ত রাখছি, বলে দোকান থেকে কয়েক রকমের মিষ্টিও আনিয়ে নিলেন।

বিকেল চারটার পর তাঁরা এলেন—অবশ্য আমার ভাবী শ্বশুরমশায়, ভাবী দেবর ডাক্তার ক্ষীরোদ চৌধুরী ও ভাবী ছোট নন্দাই নৃপেন্দ্র রায়। তাঁরা বসবার ঘরে সকলে বাবার সঙ্গে গল্পসল্প করতে লাগলেন। দিদি বললেন, 'চট্ করে কাপড়টা ছেড়ে একটা পরিস্কার কাপড় পরে নিয়ে চুলটা একটু আঁচড়ে নে। আমি সব চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছি, তুইও সাহায্য করতে চল্ বসবার ঘরে।'

দিদির কথামত শাড়ীখানা বদলে একটা ধোপার ধোয়া ইস্ত্রী করা কাপড় পরে চুলটা একটু আঁচড়ে নিয়ে চায়ের ট্রে নিয়ে গেলাম। বাবা শ্বশুরমশায়কে প্রণাম করতে বললেন। বাবা ও তিনি চা-এর সঙ্গে খাবার খেতে খেতে গল্প করতে লাগলেন। আর আমার সঙ্গে নানারকম কথা বলতে শুরু করলেন ভাবী দেবর ক্ষীরোদচন্দ্র ও ভাবী নন্দাই নৃপেন্দ্র। আমি কি আর জানি, যে এঁরা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে এসেছেন। আমি ত নিঃসঙ্কোচে দিব্যি গল্প করে গেলাম।

ওঁরা চা খেয়ে চলে যাওয়ার পর নীচ থেকে সুরমাদি এসে আবার ফুসফুস গুজ্‌গুজ্। আমার একটু সন্দেহ হল, এরা কেন আমার সামনে কিছু আলোচনা করছে না, এরকম ত কোনদিন হয় না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা জামাইদা বললেন, 'টুনু! আমরা তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। এখন ফাল্গুনের শেষ, কিন্তু এখনি ত আর দু-চারদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সেজন্য ঠিক হয়েছে চৈত্র মাস শেষ করেই বৈশাখের প্রথমে বিয়ে হবে।'

ভাল করেই জানতাম যে, বাবা ভাল পরিবার ও সুপাত্র না হলে কখনই বিয়ে দেবেন না। তার পরদিন সকালে বাবাও বললেন, 'জানিসই ত আমার অবস্থা, আমি

যদি হঠাৎ মরে যাই, তোকে দেখাশুনা করবার আর কেউ থাকবে না, তোর ভাইও নেই। এখন বড় হয়েছিস্, তোর বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই। তোর বিয়ে আমরা দেবো বলে কথা দিয়ে ফেলেছি। তারপর পুঁটুর বিয়ে পরে দেখা যাবে।'

বাবা ও জামাইদা দুজনের কথার ওপরে বিয়ে না করে পড়বো বলে জেদ্ করবার সাহস আর হলো না।

তারপর সাতদিনের মধ্যে একেবারে পাকাপাকি বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর গল্পটা শুনলাম। দিদিরা যে ফ্ল্যাটে থাকতেন সেই ফ্ল্যাটের পূর্বদিকে একটি বাড়ী ছিল। তাতে আমার ছোট ননদ-এর ভাসুর থাকতেন। তাঁদের সেটা নিজেদের বাড়ী ছিল। ভদ্রলোক হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। ছোট ননদ কিশোরগঞ্জ থেকে কলকাতা বেড়াতে এসেছেন। কিছুদিন বাপের বাড়ীতে ভাইদের কাছে থেকে ভাসুরের বাড়ী এসেছেন ; এর মধ্যে সুরমাদি (দিদির ননদ) একদিন ওদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছেন। ছোটননদ তাঁকে বললেন, 'আমার মেজদার জন্যে একটি মেয়ে দেখে দিন না।'

তিনি বললেন 'কোথায় আর খুঁজতে যাবো, যদি আপনাদের পছন্দ হয় তবে ওপরতলার ছোটবৌদির ঐ বোনের সঙ্গে কথা পাড়তে পারি।'

ছোটননদ বললেন, 'কে বলুন ত ? একটি মেয়েকে দেখতে পাই, সব সময় দৌড়াদৌড়ি করে সারাদিন ধরে কাজকর্ম করে। সেটি কি ?'

সুরমাদি বললেন—হ্যাঁ।

উনি বললেন, 'বেশ ত ! আপনি তাহলে বিয়ের কথাবার্তা চালাতে থাকুন।'

যেই বলা সেই কাজ। সুরমাদি সব খবরাখবর আনার পর মা-বাবারা আবিষ্কার করলেন যে, কোন এক সময় শ্বশুরমশায় ও শাশুড়ীঠাকরুন শিলং-এ ছিলেন এবং শাশুড়ীঠাকরুন ব্রাহ্মসমাজে গান গাইতেন। তারিণী নন্দী, দক্ষিণা নন্দী মশায়রা তাঁর সম্বন্ধী ছিলেন। দক্ষিণা নন্দীর বাড়ীতে আমাদের বরাবর খুব যাওয়া-আসা ছিল এবং তাঁর সব ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমাদের খুবই ভাব ছিল। এতসব জানাশোনার মধ্যে হয়ে যাওয়াতে আমাদের বাড়ীর সবাই খুবই খুসী। এদিকে মামাশ্বশুর দক্ষিণা নন্দীর বড়ছেলে মান্টু (প্রেমনীহার) তখন কলকাতায় পড়তো। মা তাকে আসবার জন্য ডেকে পাঠালেন এবং সে এলে পর সব খবর দিলেন। তাই শুনে সে বল্‌লে, 'টুনুর বিয়ে এখানে ঠিক করে খুব ভাল করেছেন, আপত্তির কোনই কারণ নেই।'

মান্টু ও আমি প্রায় সমবয়সী ছিলাম। আমরা ও মান্টু এবং তার বোনেরা সারাক্ষণ একসঙ্গে খেলতাম ও ছুটির দিনেএ-ওর বাড়ী গিয়ে থাকতাম।

এদিকে আবার শ্বশুরমশায়ও মান্টুকে খবর দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। মান্টু তাঁদের ওখানে গিয়ে সব শুনে বল্‌লো, 'আমি আর কি বলবো, আমার বাল্যসাথী, ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে কত খেলা করেছি, একেবারে আমার নিজের বোনের মত।'

মান্টুর সুপারিশে দুপক্ষের লোকই খুব আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

বাবার দুটো প্রতিজ্ঞা ছিল যে মেয়েদের কখনো পণ দিয়ে বিয়ে দেবো না, এবং

জামাই-এর বাড়ী থেকে নিজেরা সেধে মেয়ে নেবে। হলোও তাই। বিয়ে ঠিক হলে পরে ভদ্রতা করে শ্বশুরমশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার দাবী-দাওয়া আছে কি ?

তিনি বললেন, 'না ! না ! আমরা কিছুই চাই না। আপনারা যা ইচ্ছা মেয়েকে দেবেন।'

তাই শুনে বাবা বললেন, 'আমার যথাসাধ্য আমি মেয়েকে দেবো, তাছাড়া মেয়ের নামে কিছু টাকাও রাখা আছে এবং আমার মৃত্যুর পর মেয়েরাই আমার শিলং-এর বাড়ী ও যা কিছু সম্পত্তি সব পাবে।'

বাবা পঞ্জিকা দেখে বললেন, ৮ই বৈশাখ (২১ শে এপ্রিল) প্রথম বিয়ের দিন আছে এবং কথাবার্তা বলে সেই দিনটিই বিয়ের জন্য ঠিক করে ফেললেন।

পুঁটুর জলবসন্তের জন্য ২১ দিন আলাদা ঘরে রাখার মেয়াদ যেদিন শেষ করে ঘরদোর সব গন্ধকের ধোঁয়া দিয়ে বিছানাপত্র সব রোদে দিয়ে সংক্রামকতা দূর করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি যেন কেমন জ্বর-জ্বর বোধ করতে লাগলাম। তারপর লক্ষ্য করলাম হাতে গলায়, গালে ছোট ছোট ফোস্কা মত কি বেরিয়েছে। মাকে, দিদিকে দেখালাম। সকলেই সন্দেহ করলেন আমাকেও জলবসন্ত ধরেছে। জামাইদা ডাক্তার, তিনি বাড়ী ছিলেন না। অল্প পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখে তিনিও সিদ্ধান্ত করলেন জলবসন্তই বটে। পুঁটু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং আবার হস্টেলে ফিরে গেল। মা আমাকে নিয়ে আবার ঘরে বন্ধ হলেন।

ক্রমে আমার জ্বর বাড়তে লাগলো আর দুদিনের মধ্যে সাংঘাতিক ভাবে সর্বাঙ্গ জলবসন্তে ছেয়ে গেল। মা প্রাণপণে আমার সেবা করছেন। বিয়ের কথাবার্তা যখন চলছে, শুনলেন যে তাঁদের ভাবী জামাতা শুধু 'মর্ডান রিভিয়ু' কাগজের ও 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদকই নন, তিনি ইংরাজী ও বাংলায়ও নানারকম প্রবন্ধ লেখেন। কিছুদিন আগেই 'প্রবাসী'তে মুসলমান চিত্রকলা সম্বন্ধে ওঁর একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। পুণ্যব্রত (বাবার এক বন্ধুর ছেলে) প্রায়ই তার কলেজ-এর পর আসতো। মা তাকে বলে এক কপি 'প্রবাসী'—যাতে ঐ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল কিনে আনিয়ে পড়লেন। প্রবন্ধটা পড়ছেন আর বলছেন, 'কি অসাধারণ লেখার ক্ষমতা, কি সুন্দর ভাষা, কি সুন্দর যুক্তিসঙ্গত ভাবে লেখা।'

মা ত ঐ একটা প্রবন্ধ পড়েই ওঁর লেখার শক্তি দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। বললেন, 'ভবিষ্যতে মনে হয় বড় লেখক হবে।'

আমায় বার বার কেবলই বলতে লাগলেন, 'পড়ে দেখ।'

কিন্তু আমি এত অসুস্থ যে আমার তখন পড়ার অবস্থাই নয় ; মা-র আর সে খেয়ালই নেই।

তবে বিয়ের পর এই প্রবন্ধটার যে একটা বিশেষ ইতিহাস ছিল সেটা ওঁর মুখে শুনলাম। এই ব্যাপারটা অনেকেই জানেন না। আমি ব্যাপারটা সব ভাল করে লিখছি। কলকাতার 'সেন ব্রাদার্স' তাঁদের প্রকাশিত একটা ইতিহাসের বই-এ মহম্মদ স্বর্গে

উঠছেন এই ছবি একটা ফরাসী বই থেকে ছাপিয়েছিলেন। বইখানার লেখক ও নাম— E Blochet : Lcs Enlumineurs des manuscripts Orientau de la Bibliotheque nationale (1926)।

ওঁর সঙ্গে সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ঘটনার কিছুদিন আগে তাঁরা ওঁকে বইখানা দেখান। মুসলমানদের আপত্তি হলো ছবি আঁকা মাত্রই তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ, মহম্মদের ছবির তো কথাই নেই। অথচ সেই ছবিটা মুসলমানদেরই আঁকা। ওতে মহম্মদের (মুখহীন) স্বর্গে ওঠার ছবি ছিল। তার প্রতিলিপি সেন ব্রাদার্সের ঐ বই-এ প্রকাশ করার জন্য এক মুসলমান যুবক পাঞ্জাব থেকে কলকাতা এসে দুই সেন ভাইদের দোকানে ঢুকে হত্যা করে ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দুটি কেরানীকেও, যারা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, মেরে ফেলে। পরে লোকটা ধরা পড়ে। যখন এই হত্যাকারীর এই বীভৎস কান্ডের জন্য বিচার চল্‌ছিল, তখন উনি এ-বিষয়ে সত্য কথা সাধারণকে জানানো কর্তব্য মনে করলেন। তাতে তিনি দেখালেন যে, যদিও মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোরানেই চিত্রকলা নিষিদ্ধ, তবু কোরানে চিত্র সম্বন্ধে কোন নিষেধ নেই। নিষেধ পরে দেখা গেল 'হাদিথে', যাকে প্রচলিত ভাষায় 'হদিশ' বলা হয়। উনি কোরান ও হাদিথ থেকে অনেক বচন উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য প্রমাণও করলেন, ও মুসলমান ধর্মে ছবি আঁকা কেন নিষিদ্ধ তাও দেখালেন। এও দেখালেন যে আসল কারণ পৌত্তলিকতার বিরোধিতা নয়, সম্পূর্ণ অন্য।

উনি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন শুনে তাঁর বাবা একটু চিন্তিত হয়ে ওঁকে এ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হতে মানা করলেন। উনি অবশ্য তবুও লিখলেন এবং 'প্রবাসী'তে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। তখন আমার শ্বশুরমশায় প্রবন্ধটা পড়ে বললেন, 'এতে ত আপত্তিজনক কিছু নেই, যদিও মুসলমানদের গোঁড়ামির জন্য কিছুই বলা যায় না।'

তবে ফল উল্টো হয়েছিল। প্রবন্ধখানা একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

খুবই মনোযোগ দিয়ে উৎসাহের সঙ্গে মা প্রবন্ধখানা পড়লেন। তার দু'তিন দিন পরে মা-র গায়েও দু'চারটি জলবসন্ত দেখা দিল। তবে তাঁর বেশী না হওয়াতে আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে কোন বাধা হয়নি।

আমি ও মা দুজনেই ঘরে বন্ধ। দিদি একা হাতে সব কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। বিয়ের আর মাত্র একমাস বাকী। বাবা কখনও জামাইদাকে নিয়ে, কখনও পুণ্যব্রতকে নিয়ে, কিম্বা কখনও খোকাদাকে নিয়ে জিনিসপত্রের অর্ডার দিতে যেতেন।

বাবার ও মার দুজনেরই ইচ্ছা আমার পছন্দ অনুযায়ী সব জিনিসপত্র হবে। সেজন্য বাবা কাপড়ের দোকানে গিয়ে নানারকম শাড়ী সুতীর, সিল্কের, বেনারসী শাড়ী ইত্যাদি সব বাড়ী নিয়ে আসতে বলে এলেন। তারা মুটের মাথায় বোঝাই করে নিয়ে এসে হাজির। আমি ও মা যে ঘরে বন্দী সেই ঘরের সামনের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে রকমারি কাপড় সাজালে পর মা ও আমি দূর থেকে সব পছন্দ করলাম। গয়নাগাঁটিও নানারকম নমুনার স্যাকরা এনে দেখালো এবং আমরা কোন্‌টা কি ভাবে হবে ঠিক

করতেই বাবা তৈরী করবার জন্য অর্ডার দিয়ে দিলেন। বাবা নিজে গিয়ে রুপোর বাসন ও আসবাবপত্র সব পছন্দ করে ঠিক সময়ে যাতে তৈরী পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করলেন। কাঁসার বাসন তৈজসপত্রাদি বেছে বেছে কিনে আনলেন। দিদি এদিকে তাঁর মেটিয়াবুরুজের দরজীকে ডেকে বাড়ীর বারান্দায় কয়েকদিন বসিয়ে আমার জামা ইত্যাদি সামনে বসে সেলাই করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। সব কাজকর্ম খুবই সুন্দরভাবে দ্রুত চলতে লাগলো। এদিকে আমি ও মা আস্তে আস্তে সুস্থ হলাম।

আমাদের ২১ দিন হওয়ার পর চারদিক সব ধোওয়া কোটা করে এপ্রিলের ১০/১২ তারিখ নাগাদ আমরা ঘর থেকে বের হলাম। শুনলাম আশীর্বাদ হবে ১৫ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ। সেদিন সকালের দিকে মা, দিদি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সকলকে খাবারদাবার দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবার জন্যে। মা বললেন, 'টুনু ! তুই চান করে এই নতুন কাপড়খানা পরে থাক্। আর চুলটাও আঁচড়ে একটা খোঁপা বেঁধে নে।'

বিয়ের নামে মেয়েকে সাজিয়ে বের করার বিশেষ আপত্তি ছিল আমার মায়ের এবং তিনি এও জানতেন যে, আমরা নিজেরাও ওসব মোটে পছন্দ করি নে। সুতরাং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যতখানি সাদাসিধে থাকা যায় সেইভাবেই অন্য কারোর সামনে বের হবো।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য ও বিলিতি সামান্য প্রসাধনের জিনিস ব্যবহার করি বলে শুধু বোর্ডিং, হস্টেলেই নয়, পরে কারো কারো কাছেও কিছুদিনের জন্য আমি বিলাসিতা করি বলে বদনাম অর্জন করেছিলাম।

বিয়ের জন্য প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে একটা বড় বাড়ী নেওয়া হল এবং আমার আশীর্বাদের পরদিন সকালে জিনিসপত্র গোছ করে নিয়ে সবাই মিলে যাওয়া হল। শিলং থেকে দাদা (খুড়তুতো ভাই) এলো, পুণ্যব্রত কলেজ থেকে কয়দিনের ছুটি নিল এবং আরও চেনাশোনা দুচারজন ছেলে-ছোকরার দলকে কয়দিন বাড়ীতে থাকতে বলা হল। ছাদের প্রকাণ্ড একটা ঘরে তাদের শোবার, থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

নীচের অন্যান্য ঘরে আমরা রইলাম। পুঁটুও হস্টেল থেকে এসে গেল এবং বাবাকে একদিন খুব জোর গলায় বল্‌ছে শুন্‌তে পেলাম, 'বাবা ! টুনুর বিয়েতে বেশী করে চাকর ঠিক কর। মনে আছে, মেজদির বিয়ের সময় রাজ্যি জুড়ে লোকের সন্ধ্যে থেকে বিছানা পাত্‌তে পাত্‌তে আমার আর টুনুর প্রাণ শেষ হয়েছিল। এবারে আর তা করতে রাজী না।'

রোজ সন্ধ্যেবেলা চাকররা বিছানা করে, মশারী টাঙিয়ে দিয়ে গেলে পর, রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি, পুঁটু, দাদা, পুণ্যব্রত সবাই মিলে আমাদের শোবারঘরের মাঝখানে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বসে অনেক রাত পর্যন্ত নানারকম খোস্‌গল্প করতাম। ঐ বাড়ীটায় মশা ছিল বড্ড বেশী। আমি মশার কামড় কখনই সহ্য করতে পারি না। গল্প করতে করতে তুড়ুক করে মশারীর ভিতর গিয়ে ঢুকে পড়তাম। এতে পুণ্যব্রত বলতো, 'টুনু। তোমার বিয়ে, আর তুমি কিনা আমাদের মশার কামড় খাইয়ে দিব্যি নিজে মশারীর ভেতর রোজ ঢুকে পড়ো।'

একে একে সব দানসামগ্রীর জিনিস এসে পৌঁছতে লাগলো। একখানা বড় দেখে ঘর ঠিক করে যেমন জিনিস আসছে, দিদি ছেলেদের নিয়ে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এর মধ্যে দিদি একদিন রাণুদের বাড়ী গিয়ে বলে এলেন, 'রাণু! তুই সকাল সকাল বিয়ের দিন এসে পড়িস্। তুই টুনুকে বিয়ের কনে সাজিয়ে দিবি। আমি জানি টুনুর আর কারো সাজানো পছন্দ হবে না।'

বাড়ীর সকলের খুব দুঃখ মেজদি বিয়েতে আসতে পারলেন না বলে। আমার বিয়ে ঠিক হবার মাত্র মাসখানেক আগে দুই শিশুকন্যা নিয়ে বেসিন-এ (বার্মা) ফিরে গিয়েছেন। আবার তখুনি ঐ দূর দেশ থেকে আসা অসুবিধা বলে আর তাঁর আসা হলো না।

দেখতে দেখতে দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো। এদিকে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাকালে কালবৈশাখীর ঝড় উঠে সব তোলপাড় করে দিত। দিদি আর মা কেবলই বলাবলি করতেন যে বিয়ের দিন যদি ওরকম ঝড় ওঠে ত সব ব্যবস্থা, আনন্দ, পরিশ্রম একেবারে নষ্ট হবে। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের বিয়ের দিন ঝড়ের কোন লক্ষণই না হয়ে, সুন্দর পরিস্কার ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারদিক ছেয়ে গিয়েছিল।

বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় দিদি আমার জন্য যে বড় বড় দুটো ট্রাঙ্ক কেনা হয়েছিল তাতে আমায় দেখিয়ে বুঝিয়ে কোথায় কোন্ কাপড় রাখছেন, সব গুছিয়ে তুলতে লাগলেন। একটা ট্রাঙ্কে যত ভাল শাড়ী ইত্যাদি, অন্যটায় আটপৌরে কাপড়। বাবা এত কাপড়-জামা দিয়েছিলেন যে আমার বহুদিন প্রায় বছর তিন-চার কোন কাপড় কিনবার দরকারই হয়নি। যে ঘরে সব জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে, তার পাশের ঘরে বাবা বসে বিশ্রাম করছেন ইজিচেয়ারে বসে, আর গুড়গুড়ি খাচ্ছেন, বহুকালের চেনা এক ভদ্রলোক বিয়ের খবর জেনে দেখা করতে এসে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন। হঠাৎ কানে এলো ভদ্রলোক জোরে জোরে বলছেন, 'রায়সাহেব! এটা করছেন কি? মেয়েকে এইভাবে মানুষ করে, এখন মাত্র আশী টাকা মাইনের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন?' উনি অবশ্য আশী টাকা নয়, প্রবাসী আপিসে একশো টাকা মাইনে পেতেন।

শুনলাম বাবা ভদ্রলোককে বলছেন, 'আমি টাকার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না, ছেলে দেখে দিচ্ছি। যদি আমার মেয়ের কপালে থাকে তাহলে টাকা হবে, যদি না থাকে তাহলে টাকা ছাড়াই থাকবে। মেয়েকে আমি এমন শিক্ষা দিয়েছি যদি তার রাজপ্রাসাদে থাকতে হয়, সেখানে যেমন মানিয়ে চলতে পারবে, তেমনি আবার খড়ের চালার কুঁড়েঘরে থাকতে হলেও তার কোন অসুবিধা হবে না।'

বাবা সেটা ঠিক কথাই বলেছিলেন। মা আমাদের বিলিতি কায়দায় থাকার সব রীতিনীতি যেমন শিখিয়েছিলেন, তেমনি মাটি দিয়ে ঘর নিকিয়ে, গর্ত করে মাটির উনুন গড়ে কাঠের জ্বালে রান্না ইত্যাদি সবই শিখিয়েছিলেন।

॥ ২ ॥
শ্বশুর-বংশ

আমার বিয়ে হয় ইংরেজী ১৯৩২ সনের ২১শে এপ্রিল, বাংলা ১৩৩৯ সনের ৮ই বৈশাখ। আমার স্বামী ১৯১০ সন থেকে কলকাতাতেই বড় হয়েছিলেন, মাঝে মাঝে শুধু দেশে যেতেন এবং ১৯২৭ সনের নভেম্বর মাসের পর আর একবারও পূর্ববঙ্গে যাননি। তবু তিনি পূর্ব-পুরুষের কথা বা তাঁর আদি বাসস্থানের কথা কখনও ভোলেন নি।

তাঁদের বংশ পূর্ব ময়মনসিংহের বনেদী কায়স্থ বংশ, গ্রামের নাম বনগ্রাম—বনগ্রামের চৌধুরী বললে সবাই চিনতো। আমার স্বামীকে নিয়ে তাঁরা ছয়-পুরুষে 'চৌধুরী'। তার আগে 'রায়' ছিলেন, তারও আগে কুলোপাধি 'নন্দী' ব্যবহার করতেন। চৌদ্দ-পনেরো পুরুষ তাঁরা ঐ একই গ্রামে বাস করে এসেছিলেন। তাঁদের বাড়ির নাম ছিল 'নতুনবাড়ি।' সেটাও মুর্শিদকুলি খাঁর নবাবীর সময়ে তৈরী হয়েছিল। আমার স্বামীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী (যাঁর নামের ওপর আমরা আমাদের মেজছেলের নামকরণ করেছি) তাঁর ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে এই বাড়ি তৈরী করিয়ে চলে আসেন, আগেকার বাড়ির নাম 'পুরান বাড়ি' রয়ে গেল। তাঁরা সেই সময় থেকেই বেশ সমৃদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আমার শ্বশুরমশায়ের বাল্যকাল তাঁর পিতৃস্থানীয়দের অপব্যয়ের জন্য অত্যন্ত অর্থহীন অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। তাঁর বাবা সকলের ছোট ভাই ছিলেন, কোন কাজকর্ম ত করতেনই না, তার ওপর অত্যন্ত সৌখীন ছিলেন, সারাদিন জলচৌকির ওপর বসে সময় কাটাতেন। আবার নাকি কবিতাও লিখতেন। তাছাড়া শুনেছি উঠোনে জুঁইয়ের ঝাড়ের একটি ডালও বাঁকা হলে মালীকে ডেকে ঠিক করে দিতে বলতেন।

আরেকটা গল্প আমার স্বামীর মুখে শোনা এবং সেটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁর একটি প্রকাণ্ড পিতলের পূজোর ঘন্টা হাতলের উপর সুন্দর গরুড়ের মুখ গড়া, আমার কাছে এখনও আছে—তার পিছনের ইতিহাস জানতে পেরেছিলাম। তাঁর খাওয়াদাওয়ার উপরও যথেষ্ট রকমারি রুচি ছিল। সুন্দর সুগন্ধ সরু আতপচালের যে ভাত খেতেন, সেই চালের ভাত তাঁর প্রথা অনুযায়ী আমার স্বামীর ঠাকুরমাকে রেঁধে দিতে হতো। বেলা বারোটা নাগাদ স্নান করে তিনি পূজোয় বসতেন। আর রান্নাঘরে সব ঠিক করে নিয়ে ঠাকুরমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হতো। তিনি পূজো করতে করতে প্রথমবার যেই ঘন্টা বাজাতেন সেটার আওয়াজ শোনামাত্র হাঁড়িতে ভাতের জন্য উনুনে জল চড়াতে হতো, দ্বিতীয়বার ঘন্টা বাজলে তখুনি হাঁড়িতে চাল ছাড়তে হতো, আর তৃতীয় ঘন্টা বাজা মাত্র ভাতের হাঁড়ি নাবিয়ে ফ্যান ঝরাতে হতো। কোনক্রমে ভাত যদি একটু নরম হয়ে যেতো তাহলেই রেগেমেগে সব ছড়িয়ে ফেলে দিতেন।

তিনি অর্থাভাবে ছেলের, অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশায়ের লেখাপড়ার জন্য কিছুই করতেন না। একদিন, শ্বশুরমশায়ের মা বাড়ির পেছন দিকে (কিসের জন্য জানি না) মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ এক হাঁড়ি-ভরা বাদশাহী আমলের পুরোনো সোনার মোহর

পান। সেগুলো বিক্রী করে তিনি ছেলেকে এনট্রান্স পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। এই মোহরের উদ্‌বৃত্ত চার-পাঁচটা আমি আমার ভাসুরের কাছে দেখেছিলাম কৃষ্ণার (ভাসুরের মেয়ে) বিয়ের সময়।

আর সঙ্গতি না থাকায় শ্বশুরমশায় মোক্তারী পাস করে কিশোরগঞ্জ শহরে মোক্তারী করতে চলে যান। তারপর থেকে তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কিশোরগঞ্জেই থাকতেন। পূজো-পার্বণে বিয়ে ইত্যাদিতে গ্রামে যেতেন। তখন তাঁর সব শরিকেরই অবস্থা ভাল হয়ে গিয়েছিল। বারো মাসে তেরো পার্বণের ধুমধাম ছিল খুব। নিজেদের রথ ছিল, থিয়েটারের 'সীন' ইত্যাদি সব সরঞ্জাম ছিল, যাত্রার দল ডেকে যাত্রা দেখা ও গ্রামের লোককে দেখানো ও শোনানো হতো। মুসলমান বাজনদার এসে বাজনা বাজাতো এবং সেই তারা বেহালা বাজিয়ে গান গাইত। দুর্গাপূজোর সময় শুধু পাঁঠাবলি নয়, মোষ পর্যন্ত বলি দেওয়া হতো।

আমার শ্বশুরমশায়ের নাম ছিল—উপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং শাশুড়ীঠাকরুণের নাম ছিল সুশীলাসুন্দরী। যদিও বিবাহিতা বাঙালী মেয়েরা কখনো কুলোপাধি ব্যবহার করতো না, ব্রাহ্মণঘরের মেয়েরা 'দেবী' বলে ও কায়স্থ মেয়েরা 'দাসী' বলে স্বাক্ষর করতো, তবে তাদের বংশের চৌধুরীর মত উপাধি থাকলে স্ত্রীলিঙ্গে 'চৌধুরাণী' বলে লিখতো। সেই অনুযায়ী আমিও আমার নাম 'অমিয়া চৌধুরাণী' বলে লিখি।

আমার শাশুড়ীঠাকরুণও বনেদী পরিবারের মেয়ে ছিলেন, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার বিখ্যাত কালীকচ্ছ গ্রামের। সেই গ্রামের নন্দীরাও বিখ্যাত ছিলেন।

আমার শাশুড়ীঠাকরুণের শিশুকালেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয় দক্ষিণ সাহোবাজপুরে, সেখানে তিনি কাজ করতেন। তারপর তাঁরা অতি দুরবস্থায় পড়েন। আমার শাশুড়ীরা দুটি বোন ছিলেন। একদিন যখন তিনি ছয়-সাত বছরের, তখন তাঁর দিদির গলা জড়িয়ে বাইরের বাড়িতে বসে কিছু না ভেবেই একটা গান গাইছিলেন—

'আমার কপাল, গো, তারা,
ভাল নয় মা, কোনোকালে
শিশুকালে পিতা মলো,
মাগো, রাজ্য নিল পরে,
আমি শিশু অল্পমতি,
ভাসালে সায়রের জলে।'

তখন তাঁদের কুলপুরোহিত এসে পড়েছিলেন, পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি গানটা শুনে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মেয়ে দুটিকে মায়ের কাছে নিয়ে যান।

এইভাবে বড় হওয়ার জন্যে আমার শাশুড়ীঠাকরুণ অত্যন্ত 'হাই-স্ট্রাঙ্গ' ছিলেন ও সারাজীবন হিস্টিরিয়াতে ভোগেন।

প্রথম বিবাহিত জীবনে শ্বশুরমশায় ও শাশুড়ীঠাকরুণ তাঁদের উপরের দুটি শিশুপুত্র নিয়ে কিছুদিন শিলংয়ে ছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজে শাশুড়ীঠাকরুণ বরাবর উপাসনার

সময় ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন। আমার এক মামাশ্বশুর দক্ষিণা নন্দীও আবহমানকাল শিলং-এ থাকতেন এবং আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে খুবই একাত্মতা ছিল।

আমার মা একদিকে যেমন শাশুড়ীঠাকরুণের একেবারে উল্টো ছিলেন, কখনো মাকে রাগ করতে বা মেজাজ দেখাতে দেখিনি কিন্তু শুনেছি তাঁরা দুজনেই স্বভাবে, নৈতিক আদর্শে, শিক্ষা প্রভৃতিতে ঠিক একই রকমের ছিলেন। স্বামীর কাছে শুনেছি, আমার মা যে-সব বই পড়তেন ও যে-সব মাসিক পত্রিকা রাখতেন, আমার শাশুড়ীঠাকরুণেরও তাই ছিল। আমার মায়ের যেমন 'ব্রহ্মসঙ্গীত', 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' 'দৈনিক' ইত্যাদি ছিল, 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা রাখতেন, শাশুড়ীঠাকরুণেরও সবই ছিল।

আমি অবশ্য তাঁকে দেখিনি। আমার বিয়ের আট বছর আগে, ১৯২৪ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার শ্বশুরমশায়কে দেখবার সৌভাগ্য মাত্র অল্প সময়ের জন্য হয়েছিল। আমার বিয়ের ঠিক দু বছর পরে ১৯৩৪ সনের বৈশাখ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার স্বামীরা আটটি ভাই বোন—ছয় ভাই ও দুই বোন ছিলেন। বড় চারুচন্দ্র চৌধুরী, বিয়ে করেছিলেন ঢাকায় ছায়া রায়কে, তাঁদের একটি কন্যা ; দ্বিতীয় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বিয়ে হয় শ্রীহট্টনিবাসী ও শিলংপ্রবাসী অমিয়ার সঙ্গে, এঁদের তিন পুত্র ; তৃতীয় ভাই ডাক্তার ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন নীলিমা সরকার, কলকাতার এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স-এর সুবোধ সরকারের কন্যা, ১৯৫২ সনে তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ডাক্তার অমলা রামচরণকে, তিনি ত্রিনিডাড নিবাসী, এবং ক্যানাডা প্রবাসী, তাঁদের এক পুত্র ; চতুর্থ বোন, প্রিয়বালার বিয়ে হয় নেত্রকোণার পূর্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে, তিনি জমিদার ছিলেন, তাঁদের দুই পুত্র ও এক কন্যা ; পঞ্চম ভাই হিরণ্ময় চৌধুরী, বিয়ে করেছিলেন কলকাতা নিবাসী ও কটকপ্রবাসী দেববালাকে, তাঁদের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ; ষষ্ঠ বোন সরোজবালা, তাঁর বিয়ে হয়েছিল ময়মনসিংহের তালাজাঙ্গার জমিদার রায় পরিবারের নৃপেন্দ্রনাথের সঙ্গে—চার কন্যা ও দুই পুত্র, বড় পুত্র ও মেজ মেয়ের অকালে মৃত্যু হয় ; ন'ভাই মন্মথ চৌধুরীর বিয়ে হয় কলকাতার পদ্মালয়ার সঙ্গে, এঁদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। সবচেয়ে ছোট ভাই বিনোদচন্দ্র চৌধুরী অবিবাহিত ছিলেন।

আমার ভাসুর ছিলেন কলকাতার হাইকোর্টের একজন এড্‌ভোকেট ; আমার স্বামী প্রথম বয়সে প্রবাসী ও 'মর্ডান রিভিউ' মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-এর কাজ করতেন। এরপর পাঁচবছর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মশায়ের সেক্রেটারী ছিলেন এবং তারপরে দশ বছর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে টক্‌স্ অফিসার ছিলেন। পরের বয়সে ইংরেজী ও বাংলা বই লিখে লেখক হিসেবে প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে গণ্যমান্য হয়েছেন। ইংরেজী বইগুলি ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় দুই জায়গাতেই ছাপা হয়। এছাড়া বিলাতে ইংরেজী খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনগুলিতে প্রবন্ধাদি ছাপা হয়। সেজ দেবর ডাক্তার—কলকাতায় একজন খ্যাতনামা শিশুচিকিৎসক ছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র অতি উচ্চাশা নিয়ে কলকাতায় পার্ক সার্কাসে, দিলখুসা স্ট্রীটে নিজের চেষ্টা ও নিজের প্রচুর

অর্থ খরচ করে 'ইন্‌স্টিটিউট্‌ অফ চাইল্ড হেল্‌থ্‌' নাম দিয়ে বিরাট প্রাসাদের একটি শিশু হাসপাতাল গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু হায় ! বাঙালির পরশ্রীকাতরতা, দলাদলির ফলে তাঁকে সবদিকে হার মানতে হলো। তিনি যে কতখানি সংগ্রাম করে এই মহৎ উদ্দেশ্যে নেমেছিলেন, সেটা কেউ বুঝল না বা যাচাই করলো না। শত্রুর দল তাঁকে নানারকম বিপাকে ফেলে তাঁর ঐ পরিশ্রমের কৃত ইন্‌স্টিটিউট্‌ থেকে তাড়িয়ে নিজেরা সেটা দখল করে নিয়ে শান্তি পেয়েছে। তিনি যখন প্রথম ওটা স্থাপনের প্রস্তাব আমায় জানিয়েছিলেন, তখন আমি তাঁকে অনেক বারণ করেছিলাম, বলেছিলাম, 'সেজঠাকুরপো, তুমি বাঙালীর চরিত্র জানো না, এই যে একটা সৎ উদ্দেশ্যে তুমি এই পরিমাণ পরিশ্রমে নিজের গাঁটের সব টাকা খরচ করতে বসছো, হিংসায় জর্জরিত হয়ে আমাদের দেশের লোক তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে।' তখন তিনি আমায় উল্টো বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, আমায় বলেছিলেন 'মেজবৌদি, তুমি ভুল ধারণা করো না, আমি ত একেবারে উল্টো মনে করছি। সকলে আমার সঙ্গে এরকম একতা দেখাবে, এমন কি গরীব মায়েরা তাদের শিশুদের উপযুক্ত ভাল চিকিৎসার জন্য বিশেষ কিছু দিতে না পারলেও চাঁদাস্বরূপ অন্ততঃ একটি করে টাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসবে !'

১৯৭৪ সনে কি বিফলমনোরথে তাঁর মৃত্যু হয় ! ওরকম মনে আঘাত পেয়ে ভেঙে না পড়লে হয়ত আরও অনেকদিন বাঁচতেন।

এঁদের পঞ্চম ভাই হিরণ্ময় ছিলেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ন'ভাই মন্মথ চৌধুরী ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার এবং ছোট ভাই বিনোদচন্দ্র চৌধুরী প্রথমে 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রেসে ছিলেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় পরের দিকে ছিলেন।

॥ ৩ ॥
বিবাহ

বিয়ের আগের দিন থেকেই সাংঘাতিক ভাবে চেঁচামেচি, হুল্লোড় আরম্ভ হয়েছে। আমি দিনকয়েক মাত্র অসুখ থেকে উঠেছি, শরীর বেশ দুর্বলই। সুবিধে পেলেই কোথাও একটু নিরিবিলি শুয়ে বসে কাটাবার চেষ্টা করছি আর মনে মনে আতঙ্ক হচ্ছে, এতদিন তো স্বাধীন ভাবে কাটিয়েছি, না-জানি এখন শ্বশুরবাড়ির সবাই কেমন ভাবে নেবেন। যিনি স্বামী হবেন, আমায় নিয়ে তিনিও সংসার করতে গিয়ে কতখানি খুশী হবেন, আমার উপর কতখানি নির্ভর করতে পারবেন।

কোনরকমে সারাদিন কাটলো, সন্ধ্যেবেলা একটি স্ত্রী-আচার হলো। একে আমাদের দেশে 'অধিবাস' বলে। এতে পাঁচ এয়োস্ত্রী মিলে রং দিয়ে আঁকা কুলোতে নানারকম সামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে ও রং-এ আঁকা মাটির ঘটে জল আম্রপল্লব দিয়ে, কনেকে একটা জলচৌকিতে বসিয়ে তার হাত পা ধুইয়ে নানারকম ভাবে বরণ, ধানদুর্বো দিয়ে আশীর্বাদ্‌ করে হাতে শাঁখা পরিয়ে দেওয়া হয়। এই স্ত্রী-আচারে পাঁচজন এয়ো-স্ত্রীলোক

দরকার হয়। এয়ো-স্ত্রীদের মধ্যে মা ও দিদি, আরও তিনজন চেনা ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসবার জন্য মা লোক পাঠিয়েছেন, তাঁরা এসে পৌঁছন নি, এদিকে অধিবাসের ভাল সময় চলে যাচ্ছে দেখে মা দিদিকে বললেন, 'খুকী, আয় আমরাই সেরে ফেলি পুঁটুকে নিয়ে তিনজনে।' পুঁটু তো হেসেই কুটিকুটি। যাই হোক এই স্ত্রী-আচারের পর দিদি আমার হাতে শাঁখা পরাতে বসলেন। হাত আমার ছোট ছোট নরম হলেও চুড়ি ইত্যাদি সহজে গলতে চাইতো না। মার ধারণা আমি ছেলেবেলায় পাঁচটা পাথর দিয়ে 'গুটি খেলা' বা 'ওলট-পালট' খুব বেশি খেলতাম বলে হাত শক্ত করে ফেলেছি। শিশুকাল থেকেই ঐজন্য মার কাছে খুব বকুনি খেতে হতো। দিদি আস্তে আস্তে খুব ধৈর্য ধরে শাঁখা পরিয়ে যে নতুন চুড়ি গড়ানো হয়েছিল তার কয়েকগাছি পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখনি তো হাত দুখানা গিন্নীবান্নির মত দেখাচ্ছে।'

বিকেল থেকে নীচে একতলার বড় উঠোনের একধারে বড় বড় উনুন তৈরী করে ময়রারা মিষ্টি করতে আরম্ভ করবে বলে হৈচৈ পড়ে গেছে। ওপর থেকে দেখছি তাল তাল ছানা, খোয়া, বস্তা-ভরা চিনি, ময়দা, ঘি-এর টিন সব এসেছে। ময়রারা গামছা কাঁধে তাদের হাতা, ঝাঁঝরা, বড় বড় কড়া নিয়ে এসে হাজির। মিষ্টি তৈরী করে রাখবার জন্য বড় বড় বারকোশ, থালা, মাটির গামলা ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়েনি। পুণ্যব্রত ও দাদার ওপর ভার পড়েছে সারারাত জেগে সব তদারক করবার।

সন্ধ্যেবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পুঁটু বললো, 'টুনু, চল্ দেখে আসি ময়রারা কি করে মিষ্টি তৈরী করছে! এক-আধটা চাখাও যাবে।' দুজনে দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে যেই নেমে উঠোনে পৌঁছেছি অমনি দাদা ও পুণ্যব্রত হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, 'পালাও এখান থেকে! কেন এসেছ ঘুরঘুর করতে?'

পুণ্যব্রত আস্তে আস্তে বললো, 'এখনও তৈরী হয়নি কিছু, মিষ্টি তৈরী হয়ে গেলে কি রকম হয়েছে দেখবার জন্যে উপরে নিয়ে আসবো।' আমরা দুজনে আস্তে করে উপরে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরবেলা সবে একটু রাতের অন্ধকার কাটতে আরম্ভ করেছে কি শানাইওয়ালারা এমনি পেঁপুঁ শুরু করে দিল যে তাদের আওয়াজে বাড়িসুদ্ধ লোক সবাই মন্ত্রমুগ্ধ স্বপ্নপুরী থেকে উঠে একটা হৈচৈ যা আরম্ভ করে দিল! দিদি সকলের কাজকর্ম কার কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে সকলের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

বাবা সম্প্রদান করবেন সেজন্য তিনি কিছু খাবেন না। দিদি সবাইকে চা-খাবার দিতে দিতে বললেন, 'টুনুর আজ খেয়ে দরকার নেই। ওদিকে ওবাড়িতে ছেলেও নিশ্চয়ই উপোস করবে।' দিদির এই বিধানে মনে মনে খুব রাগ হলো, কারণ এর আগে জীবনে কখনো আর উপোস করিনি। বিয়ের পর শুনেছিলাম উনিও নাকি উপোসে ছিলেন।

দিদির বিয়ের সময় ছোট ছিলাম কিন্তু আমার বেশ মনে আছে মা থালায় করে সব খাবার নিয়ে একটা ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দিদিকে খাইয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর আরও বেশী রাগ উঠলো একটু পরে গায়েহলুদের তত্ত্ব আসার পর। কত রকমারি মিষ্টি ও সঙ্গে প্রকাণ্ড বড় একটা রুইমাছ এসেছে। দিদি চাকরকে ডেকে মাছ কিভাবে কাটা হবে এবং দুপুরে সকলের খাবার জন্য কি কি রান্না হবে বুঝিয়ে বলে দিলেন। প্লেটে করে সবাই মিষ্টি খাওয়া শুরু করলো।

এরকম আমার আরেকবার রাগ হয়েছিল খুব বেশী, যেদিন আমার মেজ ছেলে জন্মেছিল সেদিন। কখনো খাওয়া নিয়ে কোনরকম হ্যাংলাপনা করিনি, তবু। চিংড়িমাছের কালিয়া রান্না হবে বলে বেশ বড় বড় চিংড়িমাছ বাজার থেকে আনিয়ে চাকরকে রাঁধতে দিয়েছি। সে রান্নাবান্না করছে, এর মধ্যে মেজ ছেলে জন্মগ্রহণ করলো। এরপরে আমি বললাম, আমার বেজায় খিধে পেয়েছে, আমায় ভাত ও চিংড়িমাছ এনে দেওয়া হোক। সে সময়েও দিদি আমার কাছে ছিলেন। কিছুতেই আমায় চিংড়ির মালাইকারী ও ভাত খেতে দেওয়া হলো না, বদলে বিস্বাদ দুধসাবু গিলতে হলো। অবশ্য এও ঠিক যে, এখন যেমন রুগীকে সব কিছু খেতে দেওয়া হয়, আগের দিনে সেরকম হতো না। আগের কালে রুগীকে এটা খাবে না, ওটা খাবে না করে ভয়ঙ্কর মানামানি করা হত এবং এই করে রুগী একেবারে দুর্বল হয়ে পড়তো।

মাছ খাওয়া সম্বন্ধে এক মজার গল্প আমার বড় ননদের কাছে শুনেছি—তাঁর শাশুড়ীঠাকরুণের কাণ্ড। বৃদ্ধা মহিলা সকালে বাজার থেকে মাছ আনতে দিয়েছেন। এদিকে বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ বেলা এগারোটার সময় মারা গিয়েছেন। সেদিন থেকে তো বৃদ্ধা মহিলার মাছ খাওয়া ঘুচে গেল। বৃদ্ধা মহিলার স্বামীর জন্য কোন শোকচিহ্ন মাত্র দেখা যেতো না, কিন্তু প্রত্যেকদিন আমরণ ঠিক বেলা এগারোটার সময় দোরগোড়ায় বসে কপালে হাত চাপড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এই বলে কাঁদতেন—'মরলো তো মরলো, এমন সময়ে মরলো, বাজার থাইক্কা মাছ আনাইছিলাম, খাইতে পারলাম না।' [অর্থাৎ মরলো তো মরলো, এমন সময়ে মরলো (তাঁর স্বামীর কথা) যে বাজার থেকে মাছ আনিয়েছিলাম, আর খেতে পারলাম না]।

তা দুবার দুবার আমাকেও খেতে না দেওয়াতে উপোস করার কোন কথা উঠলে ঐ বৃদ্ধার মত আমার মনে শোক জেগে ওঠে।

বিয়েবাড়ির ধুমধামে সবাই ব্যস্তসমস্ত। আমি আর কি করি, পেটের চিঁচিঁ নিয়ে একটা ঘরের এক কোণে মাদুর পেতে শুয়ে পড়লাম। প্রথম নানারকম চিন্তা আসতে লাগলো মনে। ভেবে ভেবে অস্থির হতে লাগলাম অন্য বাড়ি, অন্য পরিবেশে থাকবো কি করে ? তারপর মনকে জোর দিলাম, 'যাক্ গে, এত চিন্তা করে কি হবে ? যা হবার তা হবে। ও-বাড়ির রকম অনুযায়ী চলবো, তাহলেই হবে।' এসব আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

বেলা পড়ে আসতে আরম্ভ করেছে, মা এসে ডাকলেন, 'ওঠ্ মা, আর কত ঘুমুবি ? তোকে শিখিয়ে দিই, আঙুলের ফাঁকে ফুল গুঁজে সপ্ত প্রদক্ষিণের সময় কিভাবে বরণ করে বরের পায়ে ফুল ছড়িয়ে ফেলতে হয়।' এই বলে মা একগাদা ঝরা রজনীগন্ধা

ফুল নিয়ে নিজের হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে নিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরণ করবার নিয়ম শেখালেন। অন্যান্য দেশে এই নিয়ম আছে কিনা জানি না। অন্ততঃ আমি যেসব হিন্দু বিয়ে দেখেছি সে অন্য রকমের, কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে সাতবার ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রথা কনের ভাই কিম্বা সম্পর্কিত কোন আত্মীয় কনেকে ধরে ধরে সাতবার পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করবার সময় সাতবার বরণ করে বরের পায়ে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। এরপর মালাবদল হয় এবং পরে সম্প্রদানের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ ইত্যাদি শুরু হয়।

বাবা আমায় সম্প্রদান করেছিলেন। অনেকে পিতার সম্প্রদান করতে নেই বলে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু বাবা সকলকে বলে দিলেন, আমি যাকে জামাই করবো বলে পছন্দ করেছি, নিজে আমি আমার মেয়েকে তার হাতে সঁপে দেবো।

সন্ধ্যের আগেই রাণু এসে হাজির। বললে, 'যা, ভাল করে চান করে আয়, তারপর তোকে সাজাতে বসি।'

আমি বললাম, 'সাজাবি আবার কি?'

রাণু বললে, 'না, সাজাবো না। তবে কপালে একটু চন্দন দিয়ে সাজাতে দিবি তো!'

তারপর কথা উঠল কাপড় পরার সময়। মাথায় কতখানি ঘোমটা দেওয়া হবে। আমি বললাম, 'বাপু, তোমরা গেঁয়োর মত মুখ ঢেকে ঘোমটা দিতে পারবে না আমার। আমি ঐ সং সাজতে পারবো না।'

মা শুনেই বললেন, 'না, না, ওর যে রকম ইচ্ছা সেইভাবে পোশাক পরতে দে তোরা।'

সেই সময়ে বিবাহিত ভদ্রমহিলারা যেভাবে মাথার অর্ধেকটা শাড়ি দিয়ে ঢাকতেন সেই রকম করে মাথায় কাপড় দিয়ে দুদিকে ছোট ছোট সোনার ব্রোচ্ দিয়ে মাথার চুলের সঙ্গে আটকে দেওয়া হলো।

এর মধ্যে 'বরযাত্রী এসে গিয়েছে! বরযাত্রী এসে গিয়েছে!' বলে চেঁচামেচি, দৌড়াদৌড়ি, ভীষণ হুল্লোড়ে সবার উত্তেজিত অবস্থা। খানিকক্ষণ পরে দিদি এসে বললেন, 'বাব্বা! এখানে আমাদের কনের যেমন জেদ এটা না ওটা, বরেরও তেমনি জেদ! সে-ও টোপর মাথায় দেবে না, গায়ে থেকে সেলাই করা জামা খুলবে না। দেবা-দেবী মিলবে ভাল!'

পুঁটু আগেই মাকে বলে রেখেছিল, 'মা, তোমাদের ঐ নাপতেনী যেন টুনুর পা দুটোতে থেবড়িয়ে আলতা পরাতে আসে না। আমি টুনুর পায়ে তুলি দিয়ে সরু করে আলতার লাল রেখা এঁকে দেবো।' পুঁটু বললে, 'দে টুনু তোর পা বাড়িয়ে, আলতা পরিয়ে দিই।'

এদিকে বিয়ের লগ্ন হয়ে এলো, জামাইদা ও দাদা দুজনে দুদিকে হাত ধরে আমায় ছাদে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম একটা একটু হুড়োহুড়ি, ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ। তারপর সজনীকান্ত দাস বরযাত্রী হয়ে এসেছেন, কেবলই চিৎকার করে

বলছেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, আরো ক'টা শট্ তুলে নিই।'

এই শুনে বাবা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, 'দেখুন, আপনারা এখন ক্যামেরা বন্ধ রাখুন। ফটো তোলার সময় অনেক হবে। আমি বিয়ের লগ্ন পার হতে দিতে পারি না।'

বাবার হুঙ্কারে আর কি করেন, ভদ্রলোককে থামতেই হল।

যে ঘরটায় সব জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল, দেখলাম পরে রকমারি সুন্দর সুন্দর ফুল আরো সাজানো হয়েছে। পরে শুনলাম শ্রীযুক্ত অশোক চ্যাটার্জি এত সব ফুল দিয়ে তাঁর গাড়ি সাজিয়ে এনেছিলেন এবং পরে ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। অশোকবাবুর এই গাড়ি সাজানো ব্যাপার ওঁর 'দাই হ্যান্ড, গ্রেট অ্যানার্ক' বইএ বিশদভাবে লেখা আছে।

রাত্তিরে বিয়ের অনুষ্ঠানের পর বাবা ও আমাকে একটা আলাদা ঘরে বসিয়ে খেতে দেওয়া হল। বাবাও সারাদিন উপোসে, আমিও অভুক্ত। কারোরই এত রাত্রে খাওয়ার বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। আর সকলে অন্যত্র খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব আরম্ভ হলো।

উনি কোথায় পড়েছি ইত্যাদি শুনতে শুনতে অশোক চ্যাটার্জি মশায়ের কাছে পড়েছি শুনে বেশ আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, 'কাল আমরা দাদার বাড়ি যাবো ; ওখানে সপ্তাহখানেক থাকার পর শ্যামবাজারের একটা বড় বাড়ির সামনের তেতলার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি, তাতে আমরা যাবো। বাড়িটা নতুন হয়েছে। ফ্ল্যাট-এর কিছু কাজ এখনও বাকী। দিন সাতেকের মধ্যে হয়ে যাবে।'

॥ ৪ ॥
শ্বশুরবাড়ি যাত্রা

পরদিন আবার কিছু স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠানের পর বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গের সমাগম। দুপুরে খুব ঘটা করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিকেলে অশোক চ্যাটার্জি মশায় তাঁর গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। আগেই ঠিক ছিল যে তিনিই তাঁর গাড়িতে আমাদের বাদুড়বাগানে ভাসুরের বাড়ি নিয়ে যাবেন। তিনি যখন শুনলেন যে সিটি কলেজে আমি তাঁর কাছে পড়েছি খুবই খুশী হয়ে গেলেন। কলেজে অশোকবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি।

বাদুড়বাগানের বাড়িতে আসার পর তিনি আবার অনেকগুলি ছবি তুললেন। তারপর প্রবাসী আপিসে গিয়ে সবাইকে খুব গর্বভরে বলতে লাগলেন, 'The bride happens to be my pupil.'

বড় জা, একটি ননদ (বয়সে বেশ বড় কিন্তু সম্পর্কে ছোট), ছোট জা (এটি এক বছর আগে বিয়ে হয়ে এসেছিল), এক ভাগ্নে-বৌ সবাই নানারকম স্ত্রী-আচার করে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

সারাদিন সেজ দেওর ক্ষীরোদচন্দ্রকে তাঁর নিজের কাজে কোথায় কোথায় ঘুরতে হয়েছে ; সন্ধ্যেবেলা এসে হাজির। আমি মেঝেতে একটা মাদুরের ওপর বসেছিলাম। সেইখানেই একগাল হেসে পাশে বসে বললেন, 'আমার চাইতে বয়সে দশ বছরের ছোট, আমি কিন্তু আপনি বলে সম্বোধন করতে পারবো না, আমি 'তুমি' করে বলবো এবং আমাকেও 'তুমি' করেই বলবে। আর এই নাও—আমি এটা দিলাম—এখন আমার আর এর বেশী কিছুই দেবার সাধ্য নেই। যখন সাধ্য হবে, তখন অবশ্যই দেবো।' এই বলে আমার হাতে একটা নতুন ঝকঝকে পাইপয়সা গুঁজে দিলেন। এই পাইপয়সা এখনও আমার ব্যাগে গচ্ছিত আছে। মানুষটি আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন কিন্তু তাঁর ঐ পাইপয়সাটা যে আমার কাছে কত অমূল্য ধন ! পরজীবনে অনেক সময় টাকা থেকে আরম্ভ করে এটা-সেটা অনেক কিছুই দিয়েছেন কিন্তু ঐ পাইপয়সার কাছে সেসব কিছুই মূল্যবান নয়।

রাত্তিরে বাড়ির পুরুষমানুষ সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে মেয়েদের খাওয়ার পালা। বড় জা প্রকাণ্ড একটা থালায় ভাত, ডাল, তরকারী মাছ, ইত্যাদি সাজিয়ে ছোট জা, বড় ননদ ও আমাকে একসঙ্গে ঐ এক থালাতে খেতে বললেন। আমি আগে কখনও কারো সঙ্গে এক থালায় খাইনি। একটু বাধ-বাধ লাগলো বটে, আর না খেলেও অভদ্রতা হবে, সেজন্য এক কোণা দিয়ে তুলে সামান্য একটু খেতে বাধ্য হলাম। ক্ষিধে ছিল না, সেজন্য খাবারও কোন ইচ্ছা ছিল না।

সবার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে উপরের একটা ঘরে শ্বশুরমশায়, আমার ভাসুর, ভাগ্নে, বাড়িয়ে মেয়েরা সবাই একত্র হয়ে বসে গল্পসল্প করলেন। বড় জা আমার গয়নার বাক্স খুলে গয়নাগাঁটি বাবা যা দিয়েছিলেন সকলকে দেখালেন। সকলের ছোট ননদ (যিনি নাকি আমাদের বিয়ের প্রথম অগ্রণী ছিলেন) আসতে পারলেন না বলে দুঃখ করতে লাগলেন। আরও দুঃখের কারণ হলো সবার ছোট দুটি ভাই অতি স্নেহের পাত্র অনুপস্থিত থাকার জন্য। সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্ট মুভমেন্টে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের ছয় মাসের জেল হয়েছিল। আমাদের বিয়ের সময় তারা দমদম জেলে আটক ছিল। দু ভাই—টুলু (মন্মথ) ও তার ছোট বিনু (বিনোদ) ছিল একেবারে যমজ ভাই-এর মত। বাড়ির সকলের অতিশয় আদরের ছিল তারা। দুজনে একসঙ্গে একখানা চিঠি আমাকে 'মেজবৌদি' বলে সম্বোধন করে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য খুব দুঃখ জানিয়ে জেল থেকে লিখে পাঠিয়েছিল। বিয়ের অন্যান্য উপহারের সঙ্গে এই চিঠিখানাও আমরা সুন্দর ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে সাজিয়ে রাখলাম এবং সেটা এখনও যত্নে রেখেছি।

পরদিন সকালে সকলে চা খেয়ে ওঠার পর হঠাৎ দেখি বাবা সেই ভবানীপুর থেকে বাদুড়বাগানে এসে হাজির। আমি দোতলার ঘরে ছিলাম, সেই ঘরেই বাবাকে বসতে দেওয়া হলো। বাবা আমায় বললেন, 'গতকাল তোর শরীরটা তত ভাল ছিল না, এখন কেমন আছিস দেখে যাবার জন্য তোর মা আমায় পাঠিয়ে দিলে।'

শ্বশুরমশায়ও এলেন নীচের ঘর থেকে। বাবা ও তিনি গল্পসল্প করতে লাগলেন।

বাবা খানিক পরে ফিরে যাবার জন্যে উঠে শ্বশুরমশায়কে বললেন, সন্ধ্যেবেলা ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠিয়ে দেবেন।

শ্বশুরমশায় তখন বলে উঠলেন, 'মশায়, আর কত কি দেবেন ? আমার বাড়িতে আর তিলার্ধের জায়গা নেই। আমাকে কি সব মাথায় করে রাখতে হবে ?'

আমার তাঁর কথায় হাসি পেয়ে গেল। একটু মুচকি হেসে ফেলতে তিনিও খুব অট্টহাসি হাসলেন। বাবা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মনের মত দেবার তো আর ক্ষমতা রইল না।'

বোধহয় বছর আষ্টেক আগে তাঁর যে প্রচুর টাকা খোয়া গিয়েছিল, হঠাৎ সেই ব্যাপারটা মনে পড়ে যায়।

তার পরদিন বিকেলে বৌভাতের অনুষ্ঠান। সকলেই খুব ব্যস্ত সারাদিন ধরে। আমি একটা ঘরের কোণায় বসে ঝিমোচ্ছি। একে জলবসন্তে অতদিন ভোগার দরুন শরীর কাহিল, তারপর হাতে কোন কিছু কাজ নেই। ছেলেবেলা থেকে মা অভ্যেস করিয়ে দিয়েছিলেন, এমনি বসে সময় না কাটিয়ে সেলাই বোনা যা হয় একটা কিছু কাজ হাতে নিয়ে রাখার। কাছে-ধারে কোনও বই পাচ্ছি না—পড়ে সময় কাটাতে পারি।

সন্ধ্যে প্রায় ঘনিয়ে আসছে, নিমন্ত্রিতেরা সবাই এসে যাবে, জায়েরা, ননদ সবাই তাঁদের চুল বেঁধে দেবার জন্য চুলের ফিতে, কাঁটা, চিরুনি নিয়ে এসে হাজির। আমি যেভাবে খোঁপা বাঁধতাম সকলের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার ভাসুর ঘরে উঁকি মেরে দেখে চেঁচিয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, 'এটা কি ? কোথায় তোমরা ওকে সাজাবে, না ! উল্টো, তোমরাই নিজেরা ওর হাতে সাজতে বসেছ ! এক্ষুণি লোকজন সব এসে পড়বে।'

এদিকে শুনছি ভাগ্নে ক্ষিতীশ-এর সঙ্গে কি একটা ফুস্‌ফুস্ গুজ্ গুজ্ হচ্ছে। তারপর শুনলাম যে ঠাকুররা পোলাও রাঁধতে গিয়ে একেবারে কাদা করে ফেলেছে। আসলে ননদ দেশ থেকে একরকম সরু চাল নিয়ে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গে ওকে 'কালজিরা চাল' বলে। এই চালের যেমনি সুন্দর গন্ধ, তেমনি খেতে সুস্বাদু। ছোট ছোট চাল। কিন্তু এই চাল-এর ভাত কিম্বা পোলাও রাঁধবার আলাদা কায়দা। এই চাল একমাত্র পূর্ববঙ্গেই হয়। কলকাতার ঠাকুররা এই চালে রেঁধে অভ্যস্ত নয়। তারা সাধারণ পোলাও-এর চাল মনে করে যেভাবে রাঁধতে গিয়েছে তাতে চাল একেবারে ঘ্যাঁট হয়ে গিয়েছে। তখন ক্ষিতীশ ভাগ্নেকে আবার চাল কিনে আনবার জন্য বড়বাজারে পাঠানো হয়েছে। কারণ সেদিন রবিবার ছিল বলে কাছাকাছি দোকান বাজার সব বন্ধ ছিল।

শ্বশুরমশায়কে এই ব্যাপার কিছু জানানো হয়নি। শুনলে পর খুবই রাগান্বিত হবেন। তিনি কেবলই সবাইকে খেতে বসিয়ে দেবার জন্য তাড়া দিচ্ছেন। আর তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে খাবার জল বরফ দিয়ে ঠান্ডা করা হচ্ছে, জল ঠান্ডা হলেই সবাইকে খাবার জন্য ডাকা হবে। যাই হোক, ভাগ্নে চাল নিয়ে এসে পৌঁছনোমাত্র ঠাকুররা চটপট আবার পোলাও রেঁধে ফেললো।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ভাসুর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায়কে সঙ্গে করে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য নিয়ে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করতে বললেন। সুনীতিবাবু একটি পূজার্অর্চায় বা সন্ধ্যাকালে বাজাবার শাঁখ ও তামার উপর রূপো দিয়ে বাঁধানো পূজোর ফুল রাখবার একটি রেকাব, তাতে আবার ব্রাহ্মী ইন্‌সক্রিপশনে আমাদের বিয়েতে ঐ জিনিসটা দিচ্ছেন বলে এন্‌গ্রেভ করে লেখা—আমার হাতে দিলেন। তারপর অল্পসল্প আলাপ করে বললেন, 'আজ উঠি। পরে অন্যদিনে বসে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

বিভূতিবাবু এলেন তাঁর বই 'অপরাজিত' দুখণ্ড নিয়ে। তাঁকে হাত তুলে নমস্কার জানালাম। হাসতে হাসতে বই দুখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আসবো আরেকদিন শিগ্‌গিরই, তখন গল্পসল্প হবে।'

প্রবাসী আপিসের সহকর্মীরা মিলে একজোড়া কানের সোনার ঝুমকো ও দামী একখানা লালপাড় গরদের শাড়ি দিয়ে গেলেন।

অমল হোম মশায় একটা ব্রঞ্জ-এর তিব্বতী বজ্র এনে আমায় দেবার জন্য কার হাতে যেন দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই জিনিসটি আর আমার হস্তগত হয়নি।

অমলবাবু বরাবর আমাদের বাড়ি আসতেন। একদিন তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই নীরদ, তোমরা সকলের দেওয়া সব জিনিস সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছ কিন্তু আমি বৌমাকে যে বজ্রটা দিয়েছিলাম সেটা সাজিয়ে রাখনি কেন? ওটা তো সাজিয়ে রাখবারই জিনিস!'

শুনে আমরা একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। জানি না কার হাতে দিয়েছিলেন, সেই জিনিসটি আর আমরা পাইনি। বহু আরো বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সব এসেছিলেন, তবে আমার আর বেশী মনে নেই।

মা, বাবা, দিদি, পুঁটু, জামাইদা, দাদা এবং অন্যান্য ছেলেরা যাঁরা আমাদের বাড়ি বিয়ের সময় উপস্থিত থেকে কাজকর্ম করেছিলেন সবাই এসেছিলেন বৌভাতে। বাড়ি ফিরে যাবার সময় বাবা শ্বশুরমশায়কে বলে গেলেন যে পরদিন বিকেলে যেন দ্বিরাগমনের জন্য আমাদের ভবানীপুরের বাড়ি যাবার অনুমতি দেন, বাবা লোক দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিন সোমবার সন্ধ্যায় আমরা ভবানীপুরে গেলাম। মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় ফিরবার কথা, কিন্তু বাবা বহু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে সন্ধ্যায় খাবার জন্য নেমন্তন্ন করেছেন। মঙ্গলবার ভোরে ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজে দেখা গেল পুলিসে আগের দিন রাতে খুব বেশী ধরপাকড় আরম্ভ করেছে এবং সেই সঙ্গে ওঁর বিশেষ বন্ধু গোপাল হালদার মশায়কেও গ্রেপ্তার করে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

উনি এবং গোপালবাবু ভবনাথ সেন স্ট্রীটে একই বাড়িতে থাকতেন। উনি একতলায় দুখানা ঘরে দুটি ভাই টুলু ও বিনুকে নিয়ে থাকতেন এবং কাছেই একটা মেসে তিন ভাই মিলে খাওয়া সারতেন, আর গোপালবাবু তাঁর মা-বাবাকে নিয়ে

দোতলায় থাকতেন।

গোপালবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে খবর পড়েই উনি সকালের জলখাবার খেয়ে বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রায় সন্ধ্যানাগাদ উনি ফিরে এলেন। রাতে নিমন্ত্রিত সকলের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা দুজনে ভাসুরের বাড়ি বাদুড়বাগানে ফিরলাম।

তার পরদিন দুপুরে সকলে খাওয়া-দাওয়ার পর ডাক্তার দেওর ক্ষীরোদ (তিনিও লোয়ার সার্কুলার রোডে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতেন) এলেন এবং হঠাৎ দুই ভাই মিলে ফিসফাস করে কি পরামর্শ হলো। আমাদের তিন জা ও ননদ প্রিয়বালাকে বলা হলো, 'চলো সবাই, বেড়িয়ে আসবে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

আমরা তাড়াতাড়ি বের হবার জন্য তৈরী হতেই দু ভাই আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমরা সবাই বাসরাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতেই দক্ষিণমুখী একটা বাস আসার সঙ্গে সঙ্গে দেওর-মশায় গরুতাড়া করে নেবার মত বড় জা, ছোট জা ও ননদকে বাস্‌এ তুলে নিয়ে আমাদের দুজনকে ফুটপাতে রেখে রওয়ানা দিলেন।

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। তখন উনি একটা ট্যাক্সি ডেকে আমায় ভবনাথ সেন স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ওখানে ওঁর দুখানা ঘর ছিল। ঘর দুটো খুবই সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরের একধারে একটা 'ডিভান' সুন্দর রঙীন ছাপানো কাপড়ে ঢাকা। অন্যদিকের দেয়ালে বড় বড় কয়েকটা বই-এর সেল্‌ফে বহু মূল্যবান সব বই ঝকঝক করছে। একটি ছোট টি-পয় সূক্ষ্ম কারুকার্যে খোদাই এক কোণে রাখা ছিল এবং আরেক দেয়ালে একটি টেবিল ও চেয়ার, বসে লেখাপড়া করবার জন্য। সব আসবাবপত্রই পুরোনো দিনের বিলিতি দোকানের। বইগুলো সব ঘুরে ঘুরে দেখছি, এর মধ্যে একটি চাকর একটা প্লেটে একটি তোতাফুলি মিষ্টি ও এক গেলাস সরবৎ এনে আমায় দিল। এই চাকরটি গোপালবাবুদের কাজ করতো।

আমি বললাম, 'এ কি, এইমাত্র যে খেয়ে এসেছি, আর তো খেতে পারবো না!'

উনি বললেন, 'যা হয় একটু খাও, তোমার জন্যই আনালাম।'

টুলু, বিনুদের ঘরখানায় বই কাপড় ইত্যাদি সব ছড়ানো পড়ে আছে দেখলাম। খানিক পরে ওবাড়ি থেকে বেরিয়ে আপার সার্কুলার রোড ও মোহনবাগান রো-এর কোণায় একটা প্রকাণ্ড বাড়ি 'যতীন্দ্র ম্যানসন' নাম দিয়ে তৈরী হচ্ছিল, ভাগে ভাগে একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত প্রায় কুড়িটা ফ্ল্যাট ছিল, তারই একটা ফ্ল্যাট আমাদের থাকবার জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন, সেখানে গেলাম। ফ্ল্যাটের কাজ তখনো চলছে। মিস্ত্রীরা বললো আর এক-দেড়দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের ফ্ল্যাটটা ছিল বাড়ির সামনায় তেতলার ওপরে। ফ্ল্যাটটা দেখে খুবই পছন্দ হয়ে গেল। বড় বড় চারখানা ঘর। ঘরগুলির সামনে দক্ষিণ খোলা বারান্দা, তারপর রাস্তা, এরপর দূরে বড় কম্পাউন্ডওয়ালা মিত্তিরদের বিশাল বাড়ি, তার ছাদের টাওয়ারে প্রকাণ্ড ঘড়ি। বারান্দায় দাঁড়ালে কতদূর পর্যন্ত খোলা নীল আকাশ। আর সব ঘরগুলিতেই সুন্দর হাওয়া বইছে। রান্নাঘর, বাথরুম ইত্যাদির ব্যবস্থাও খুবই ভাল দেখলাম। কলকাতার

এঁদো বাড়ি দেখলে খুব খারাপ লাগতো আমার। সব ঘুরেফিরে দেখে ফ্ল্যাট-এর নীচেই বাসস্টপ ছিল, বাসে করে সেজ ঠাকুরপো ক্ষীরোদের বাড়ি গেলাম। আমাদের দেখতে পেয়েই জায়েরা এবং ননদ ঠাকরুণ তাঁদেরও সঙ্গে নিয়ে যাননি বলে ওঁকে খুব ব্যঙ্গবিদ্রূপ আরম্ভ করলেন।

॥ ৫ ॥
গৃহ-প্রবেশ

তার পর দিন থেকেই এক জ্ঞাতি ভাসুরপো ওঁর কাছেই থাকতো তখন, ভবনাথ সেন স্ট্রীটের বাড়ী থেকে একটু একটু করে জিনিসপত্র আনতে আরম্ভ করলো। আর উনি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে শুরু করলেন। তারপর শুক্রবারে বাবার দেওয়া সব আসবাব, তৈজসপত্র, চায়না ইত্যাদি একটা ট্রাকে করে ভবানীপুর থেকে নতুন ফ্ল্যাটে এনে তোলা হলো। সে আরেক কাণ্ড। ট্রাক-ভর্তি এত নতুন জিনিসপত্র কোন্ ফ্ল্যাটে উঠছে দেখবার জন্য রাস্তায় লোকের ভিড় জমে গেল। আবার মিত্তিরদের বাড়ীর যে বুড়ো কর্তামশায় ছিলেন তাঁরও খুব কৌতূহল হল। সারাদিন বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখছেন। মুখে মুখে রটে গেল নতুন বিয়ে হয়ে আসছে পাশ করা মেয়ে।

সমস্ত বাড়ীটা একেবারে নিজের হাতে সাজাবার পর উনি বাদুড়বাগানে শ্বশুরমশায়ের কাছে সমরকে (জ্ঞাতি ভাসুরপো) দিয়ে বলে পাঠালেন, উনি যেন শনিবার বিকেলে আমায় নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। শনিবার বিকেলে পাঁচটার সময় শ্বশুরমশায় ও বড় ননদ প্রিয়বালা, তার তিনবছর বয়সের মেয়ে ও আমি শ্যামবাজারের যতীন্দ্র ম্যানসনের ফ্ল্যাটে একটা ট্যাক্সি করে গেলাম। উনি আগেই কাশীনাথ বলে একটি চাকরকে ঠিক করে রেখেছিলেন। আমরা যেতেই দোর খুলে দিয়ে এই যে আমার নতুন 'মা ঠাকরণ' বলে সে হাত জোড় করে নমস্কার করলো। তাকে দিয়ে দোকান থেকে কিছু খাবার আনিয়ে চা তৈরী করে সবাইকে দিলাম। অল্পক্ষণ বসার পর শ্বশুরমশায় বললেন, তিনি বাদুড়বাগানে ফিরে যাবেন, তবে ননদ দুদিন আমাদের কাছে থেকে যাবেন।

কাশী কিছু বাজার সওদা আগেই করে রেখেছিল। তরকারী কুটে, কি রান্না হবে সব ব্যবস্থা কাশীকে বুঝিয়ে দিলাম। কাশী রান্না করতে জানতো, সুতরাং সেই সন্ধ্যায় আমায় আর রান্না-ঘরে ঢুকতে হলো না।

পরদিন সকালে বাবা ভবানীপুরের বাড়ী থেকে শ্যামবাজারে দেখা করতে এলেন। আমাদের ফ্ল্যাট দেখে বাবা খুব খুসী হয়ে গেলেন। তিনি তখুনি বসে একটা ছোট সংসারে যাবতীয় জিনিস যা দরকার হয়, ছোট-ছোট বাসনকোসন থেকে আরম্ভ করে চাকি, বেলুন, তাওয়া ইত্যাদি সব কিনে দিয়ে গেলেন।

সেদিন থেকে অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল ১৯৩২ সন, ১৭ই বৈশাখ ১৩৪৩ সালে শনিবার

সন্ধ্যে থেকে সুরু হলো আমার দায়িত্বপূর্ণ বিবাহিত জীবনযাত্রা।

বিয়ের পর দশটা দিন ভাসুরের বাড়ী থাকার পর শ্যামবাজারে নিজেদের ফ্ল্যাটে এসে সারাদিন কাজে-কর্মে কেটে যেতে লাগলো। উনি দশটার আগেই খেয়ে 'প্রবাসী' আপিসে চলে যেতেন, ফিরতেন বিকেল পাঁচটায়। সমরের তখন কলেজ ছুটি হয়েছে, সে বাড়ীতেই থাকতো, তাইতে গল্পসল্প করে খানিকটা সময় কাটতো। দুদিন পর সে-ও দেশে চলে গেল গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে।

একদিন বেশ একটু ইতস্তত করে ওঁকে বললাম, আমি ভাবছি আবার একটু পড়াশুনা আরম্ভ করি, বি.এ পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলি। তা শুনে উনি বললেন, 'বি.এ পাশ করে কি করবে ? আমি ত কখনই তোমাকে চাকরী করতে দেবো না। যা কিছু শিখতে চাও, পড়তে চাও বাড়ীতে প্রচুর শিখবার, জানবার বই আছে, দরকার হলে আরও বই কিনে দিচ্ছি, এগুলো বসে পড়। আমি নিজে তোমাকে এই বইগুলি পড়ার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করে যাবো। বি.এ পড়তে গেলে আর কতটুকু শিক্ষা লাভ হবে।'

ফ্ল্যাটে তখনও ইলেকট্রিসিটির সব ফিট্ হয় নি। দু'রাত কেরোসিনের হ্যারিকেন লণ্ঠন ও মোমবাতি জ্বালানোর পর তৃতীয় দিনে সব লাইন তৈরী হয়ে গেল। তখন বাল্‌ব লাগিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাবার পালা আমাদের নিজেদের। উনি সব ঘরের জন্য বাল্‌ব, ও শেড্ কিনে নিয়ে এসে বললেন, এখন বাল্‌ব লাগাবে কে ? আমি ত বাল্‌ব লাগাতে জানি না।

আমি বললাম, আমি লাগাতে জানি। মইটা এনে ধরে থাকো, যাতে পিছলে না যায়, আমি বাল্‌ব লাগিয়ে দিচ্ছি।

ঐ ফ্ল্যাটগুলোর রান্নাঘরের উপরে একটা মাচা ছিল অতিরিক্ত জিনিষ-পত্র রাখবার জন্য। সেজন্য বাড়ীওয়ালা প্রত্যেক ভাড়াটাকে একটা করে কাঠের মই তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। উনি মই এনে ধরতেই আমি চট্‌পট্ মই বেয়ে উঠে বাড়ীর ভেতরের দিকে সব বাল্‌ব লাগিয়ে শোবার ঘরের বারান্দার দিকে দরজার উপরের ব্র্যাকেটে বাল্‌ব লাগাবার জন্য যেই মই বেয়ে উঠেছি ওপরে, হঠাৎ মিত্তিরদের বাড়ীর দিকে চোখ পড়তেই দেখি, ও বাড়ীর বুড়ো কর্তা বারান্দার রেলিং ধরে গলা বের করে দেখছেন আমি কি করছি। আমি তাই দেখে মই-এর ওপর থেকে একেবারে মেঝেতে লাফ দিয়ে পড়লাম।

উনি প্রথম বুঝতে পারেন নি আমি ওরকম লাফিয়ে পড়লাম কেন। ব্যাপারটা বলার পর খুব হাসতে লাগলেন। বুড়ো ভদ্রলোক হয়ত ভাবছিলেন নতুন বৌমানুষ, বেটাছেলের মত মই বেয়ে উঠে কি করছে ?

ও বাড়ীতে যে সব ভাড়াটেরা এসেছিল তারা ও কাছাকাছি বাসিন্দারা আমায় বাড়ী থেকে বের হতে দেখলেই এদিক থেকে ওদিক থেকে চিড়িয়াখানার জন্তু দেখার মত করে আমায় দেখতো। আমার নামই পড়ে গেলো 'পাশ করা নতুন বৌ।'

আমাদের উপরের চারতলার ফ্ল্যাটএ তিনটি ভাই, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকতে এলেন। তাঁদের নাম একেবারে ভুলে গেছি। তবে পদবী ছিল 'রাহা'

বেশ মনে আছে। তাঁদের কথা কখনো উল্লেখ করতে হলেই আমরা বলতাম 'বড়রাহা,' 'মেজরাহা' ও 'ছোটরাহা'। তাঁদের সঙ্গে আলাপপরিচয় হওয়ার পর বের হল যে মেজরাহা ভদ্রলোক ও আমার স্বামী এক আপিসে 'মিলিটারী একাউন্টস-এ কাজ করেছেন। ওঁর প্রথম চাকরী মিলিটারী একাউন্টস আপিসে। সরকারী চাকরী পছন্দ ছিল না বলে কয়েক বছর কাজ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাইহোক্ ! এই চেনা সূত্রে বাড়ীর গৃহিণীরা এসে আমার সঙ্গে একেবারে তাঁদের ছোট বোনের মত ব্যবহার করতেন এবং বৃদ্ধা মহিলা 'বৌমা ! বৌমা !' বলে ডেকে খুবই স্নেহভরে প্রত্যেকদিন দুটি বেলাতেই এসে খোঁজখবর নিতেন।

একদিন আমাদের চাকর কাশীর খুব জ্বর উঠেছে। আমি ওঁকে বললাম, 'কাশীর ত জ্বর, একটু বাজার করে দেবে কি ?'

উনি চট্ করে বেরিয়ে গিয়ে চার পয়সার সাগুদানা কিনে এনে দিয়ে বললেন, 'কাশীকে সাবুদানা জ্বাল দিয়ে "দুধসাবু" খেতে দাও। আমি আর বাজার-টাজার করতে পারবো না। বলে স্নানের ঘরে চান করবার জন্য ঢুকে পড়লেন। আমি ডাল ভাত রেঁধে রেখেছিলাম : দুটো মাত্র আলু ঘরে ছিল, তাড়াতাড়ি ভেজে নিয়ে, ডাল ভাত, আলু ভাজাই দিলাম খেতে। ঐ খেয়ে উনি আপিসে চলে যাওয়ার পর নিজেও ডাল দিয়ে দুটি ভাত খেয়ে নিলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাহাদের বৃদ্ধা মা এসে বসে গল্প-সল্প করতে করতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন 'বৌমা ! আজ কি রাঁধলে ?'

আমি হেসে বললাম, 'কাশীর জ্বর হয়েছে, আজ আর আমাদের বাজার হয়নি। ঘরেও কিছু তরিতরকারী ছিল না, তাই দুজনে ডাল ভাত খেয়ে নিয়েছি।'

উনি ত শুনে ভয়ানক হা-হুতাশ করতে লাগলেন, তাঁকে কেন আমি কিছু জানাইনি সেজন্য। খানিক পরে তিনি চলে গেলেন। ওমা ! তারপর যা কাণ্ড, ভীষণ লজ্জা বোধ করতে লাগলাম। সন্ধ্যে হওয়ামাত্র রাহাদের যিনি ছোট ভাই ছিলেন তিনি দুহাতে দুটি বড় বড় থালা ভর্তি করে আমাদের দুজনের জন্য গরম গরম রান্না রকমারি মাছ, তরকারী, ডাল ভাত ইত্যাদি সব নিয়ে এসে হাজির।

এরপর রাহাদের বড় ভাইএর কাণ্ড আবিষ্কার করে আমরা ত হেসেই অস্থির, আবার জ্বালাতনও বোধ করতাম। আমাদের ফ্ল্যাটের সদর দরজার বাইরে একটা 'ইলেকট্রিক বেল' লাগিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কয়দিন ধরে দরজায় বেল বাজতে শুনে গিয়ে দরজা খুলে কাউকে দেখতে পাই না। খুবই আশ্চর্য লাগে। একদিন আমি সদর দরজার কাছেই ফ্ল্যাটের ভেতর কি করছিলাম, বেল শোনামাত্র দরজা খুলে দেখি বড় রাহা ভদ্রলোক তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। আমার আর বুঝতে বাকী রইল না। বুঝলাম, ইনিই রোজ বেল বাজিয়েই পালিয়ে যান। এরপর আরও দু তিন দিন ভদ্রলোককে এরকম করতে দেখে ওঁকে বললাম যে ওই বড়রাহা ওরকম করে বেল বাজিয়ে পালান। উনি বিশ্বাস করতে চাইতেন না ; খালি বলতেন, ছোট ছেলেমেয়েরা ও-রকম করে। কিন্তু ও-বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা এত ছোট ছিল যে 'বেল'

পর্যন্ত তাদের হাত পৌঁছবার কথা নয়। তারপর একদিন বেলের আওয়াজ পেয়ে উনি নিজে দরজা খুলেই দেখেন বড়রাহা আমাদের বেলটা টিপে দিয়েই ছুটে তাড়াতাড়ি পড়িমড়ি করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পালিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকবারই এরকম ধরা পড়ে যাওয়ার পর ভদ্রলোক ঐ খামখেয়াল বন্ধ করলেন।

উনি ত রোজ সাড়ে নয়টা নাগাদ খেয়ে দেয়ে 'প্রবাসী' আপিসে চলে যেতেন। বাসে করেই যেতেন, তবে খুব বেশী দূরে যেতে হতো না। সময় থাকলে হেঁটেও চলে যাওয়া যেতো। আপিসে দুপুরে কিছু খাওয়ার জন্য কাশীকে দিয়ে কিছু ফল, মিষ্টি এবং ফ্লাস্কে করে ঘোলের সরবৎ পাঠিয়ে দিতাম। বিকেল বেলা আপিস্ থেকে ফিরে এসে সামান্য কিছু জলখাবার খেতেন। কিন্তু আমি দেখলাম ঐ জলখাবারটুকু খেয়ে খানিকক্ষণ ইংরেজী বাজনা শুনেই গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই উনি 'সেন্ট পল্স কলেজের শিক্ষক ক্রিস্টোফার অ্যাক্রডে'র কাছ থেকে কিছু দিনের জন্য তাঁর গ্রামোফোন পেয়ে খুব বিলিতি বাজনার চর্চা আরম্ভ করেন। গ্রামাফোনটা দেখে আমি তো খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ওটার রেকর্ড চলতো বাঁশের কাঁটা দিয়ে। প্রত্যেকবার বাজানোর পর একটা ছোট কল দিয়ে বাঁশের কাঁটা কেটে নিতে হতো। আমার ইংরেজী ক্ল্যাসিকেল মিউজিকের এই প্রথম হাতেখড়ি হলো। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে যদিও পিয়ানো ছিল কিন্তু ওটা বাজিয়েই বাংলা গান গাওয়া হতো। শিলং ওয়েলস্ মিশন স্কুলে আমাদের Hynn গাইতে হতো। তখন ইংরেজী স্বরলিপি খানিকটা শিখেছিলাম। তবে শিলং-এ সাহেবদের ক্লাবে নাচের সঙ্গে ইয়োজান স্টাউসের Dance music–waltz প্রচুর শুনে অভ্যস্ত ছিলাম।

বাজনা শুনে যে ঘুমিয়ে পড়তেন, পরে রাতে খাবার জন্য ডাকতে ডাকতে আর ঘুম থেকে তোলা যেতো না। বেশীর ভাগ রাতেই অভুক্ত থাকতেন। বেগতিক দেখে ব্যবস্থা করলাম দুপুরে আরেকটু বেশী কিছু খেয়ে আপিস থেকে এসে আর কিছু না খেয়ে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যের মধ্যেই রাতের খাওয়া খেয়ে নেবেন। তাহলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেও আর রাতভোর উপোস থাকতে হবে না। এতে দেখলাম শরীরটাও বেশ একটু ভাল হচ্ছে।

মাসখানেক পর দেখলাম আপিস থেকে ফিরে আসার একটু পরেই আমি এখুনি আপিস থেকে আসছি বলে বেরিয়ে যেতেন এবং ফিরে এসে কখনো দুটো টাকা, কখনো তিনটে টাকা এনে আমার হাতে দিতেন। কি ব্যাপার বুঝে উঠতাম না। একদিন জিজ্ঞাসা করার পর জানলাম যে ওঁরা একসঙ্গে মাসের মাইনে পান না। সেই সময়টাতে রামানন্দবাবুদের আপিসের অবস্থা মন্দের দিকে চলছিল, একদিনে কর্মচারীদের পুরো মাইনে ত দিয়ে উঠতে পারতেনই না ; একসঙ্গেও বেশী টাকা বের করতে পারতেন না। কর্মচারীদের খরচপাতি চলে কি করে ? সবাই তখন সন্ধ্যেবেলা আপিসে ধর্না দিতে আরম্ভ করলেন এবং সারাদিনে যা আয় হতো তা থেকে সকলে ভাগ বাঁটোয়ারা করে মাথা পিছু দু চার টাকা যা হয় অন্তত কোনোক্রমে দৈনিক খরচ চালাবার মত

নিয়ে যেতেন।

ওঁকে মাত্র একশো টাকা মাইনে দিতেন। আমার যখন বিয়ে ঠিক হলো জামাইদা বললেন, 'যাই ত আমি 'বুবার' কাছে। 'প্রবাসী'-আপিসে গিয়ে সব খবর করে আসিগে।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে কেদারবাবুর ডাকনাম ছিল 'বুবা'। ওঁর সঙ্গে বহুকাল আগে থেকেই জামাইদার পরিচয় ছিল। তিনি কেদারবাবুকে গিয়ে সব খবর বলতে তিনি ওঁর বিষয়ে বললেন, অসাধারণ পন্ডিত, মেধাবী মানুষ, আমাদের কম করে হলেও ওঁকে তিনশো টাকা মাইনে দেওয়া উচিত কিন্তু আমরা আর তা পারি কোথায়? আমরা কেবল একশো টাকা দিই।'

বিয়ের পর একদিন উনি মুখ ফুটে রামানন্দবাবুকে বললেন, 'বিয়ে করেছি, খরচা-পত্র তো বেড়ে গেলো, যদি কিছু দয়া করে বাড়িয়ে দেন।' তাই শুনে রামানন্দবাবু পাঁচটি টাকা মাত্র বাড়ালেন। কিন্তু হায়! এই একশো পাঁচ টাকাও যদি একসঙ্গে পেতেন তবু কোন রকমে হয়ত আমাদের একটা গতি হতো। আমাদের ফ্ল্যাট-এর ভাড়া ছিল ৫০ টাকা মাসে, আর বাকী ৫০ টাকায় আমরা দুজন ও দুটি দেওরের যাবতীয় খরচা চালিয়ে থাকতো হতো। কিন্তু আজ দুই, কাল তিনটি করে টাকা পেয়ে সমস্ত কিছু চালানো এক বিষম বিপত্তির কারণ হলো।

একদিন উনি পাঁচটি টাকা মাইনে বাবদ আনলেন। সেই সময়ে খুব ভাল ল্যাংড়া আম বাজারে বেরিয়েছে। টাকায় কুড়িটা আম হিসাবে দেড় টাকায় তিরিশটা আম কিনে, দশটা আম আমাদের নিজেদের জন্য রেখে কুড়িটা আম একটা ঝুড়িতে করে একদিন সকাল বেলায় কাশীকে দিয়ে 'টলু' ও 'বিনু' দুটি দেওরের জন্য দমদম্ জেলে পাঠিয়ে দিলাম। সন্ধ্যে নাগাদ কাশী আমার ঝুড়ি ফেরৎ নিয়ে এসে হাজির। বললো, সারাদিন বসিয়ে রাখলে জেলের আপিস ঘরের বাইরে, তারপর সাড়ে পাঁচটার সময় ঝুড়িটা ঘর থেকে বাইরে এনে ফেরৎ দিয়ে জেলারবাবু বললেন, 'ও আমটাম ছোঁড়াদের দেওয়া চলবে না।' ঝুড়িটা খুলে দেখা গেল পাঁচটা আম জেলখানার লোক বের করে নিয়েছে।

মাসখানেক পর হঠাৎ একদিন রাত দশটার পর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে হাজির। বাংলা ১৩৭৫ সনে ভাদ্র সংখ্যা 'কথাসাহিত্যে' তাঁকে স্মরণ করে তাঁর মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে কি নিগূঢ় অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত তাঁর ব্যবহার ছিল তা লিখেছিলাম—এখানে সেটা উদ্ধৃত করলাম।

বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', ইত্যাদি পড়ে তাঁর সম্বন্ধে নানারকম কৌতূহল হতো কিন্তু কখনই ভাবি নি যে তাঁর সঙ্গে আবার আমার কোনদিন আলাপ-পরিচয় হবে ও দুজনে মুখোমুখি বসে সরল মনে গল্প করব।

কিন্তু সুযোগ ঘটে গেল আমার বিবাহ থেকে। তিনি আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলেন; তারপর কাজ করবার সময়ও এক মেসে ছিলেন।

আলাপ প্রথম হল বিয়ের পরেই। বৌভাতের দিন উনি আমায় ডেকে এক

ভদ্রলোকের সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন—"এই আমার বন্ধু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।" হাত তুলে নমস্কার করতেই ভদ্রলোক একগাল হেসে তাঁর দু ভল্যুম "অপরাজিত" আমার হাতে দিলেন। এরকম অপ্রত্যাশিতভাবে লেখককে দেখে ও তাঁর নিজের হাত থেকে বই পেয়ে মনটা কেমন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল, তেমনি কৃতার্থও বোধ করলাম। বলে গেলেন, "শীগগিরই আবার দেখা হবে।"

তারপর প্রায় মাসখানেক গেল, কিন্তু তাঁর আর কোন দেখা নেই। ওঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিনি স্কুল ছুটি হওয়াতে দেশে গিয়েছেন। গ্রামের জীবনের উপর তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কখনই তিনি দেশের এই মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

এরপর হঠাৎ একদিন রাত দশটায় গাঢ় ঘুমে স্বপ্ন দেখছি, উনি এসে ডেকে বললেন, "ওগো ওঠো, বিভূতিবাবু এসেছেন, তোমার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে চাইছেন।" আমার উঠবার মতলব নেই, বললাম, "বলে দাও ঘুমিয়ে আছি।" একটু পরে উনি এসে আবার বললেন, "বিভূতিবাবু নাছোড়বান্দা, তোমার সঙ্গে আলাপ না করে যাবেনই না।" অগত্যা কি আর করব, উঠে চোখমুখ ধুয়ে গিয়ে বসলাম এবং প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে অনেক গল্প-সল্প হল।

আমি শিলং-এর মেয়ে শুনেই বললেন, "ওঃ! আপনি পাহাড়ের মেয়ে, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার বনবে ভাল।"

এরপর থেকে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন এবং নানারকম খোস-গল্প করে দু-তিন ঘন্টা কাটিয়ে যেতেন। ছুটিতে যখনই কোথাও যেতেন, কলকাতায় ফিরে এসেই—কি দেখেছেন, কি করেছেন, সেসব গল্প ছুটে এসে আমার কাছে না বললে তাঁর ভাল লাগত না।

তাঁর নানারকম ছেলেমানুষি কথার জন্য মাঝে মাঝে আমার স্বামী ভয়ঙ্কর ধমক দিতেন, কিন্তু রাগ করা দূরে থাক, উল্টে 'হো! হো'! করে হাসতেন। তাঁর ঐ সরল হাসি দেখে আমি আবার খুব সহানুভূতি দেখাতাম এবং তাইতে তিনি খুবই খুশী হয়ে উঠতেন। অবাক হয়ে যেতাম দু-বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসার টান দেখে।

নিজের বেশভূষার দিকে কোনদিন কোন লক্ষ্য ছিল না। কোনদিন জুতো পালিশ করাবার কথা ভাবতেন বলে সন্দেহ। পারতপক্ষে নিজের পয়সা দিয়ে কখনও সিগারেট কিনে খেতেন না। আমাদের বাড়ি বিড়ি খেতে খেতে এসে ঢুকতেন এবং দোরগোড়ায় জুতো খুলে রাখতেন। আসামাত্র আমি অ্যাশট্রে এগিয়ে দিয়ে বলতাম—"ওটা ফেলুন দেখি!" তারপর চাকরকে ডেকে বলতাম, "যা, বাবুর জন্যে সিগারেট নিয়ে আয়, আর জুতোটা ভাল করে পালিশ করে দে।" চাকর সিগারেট নিয়ে এলে দিব্যি আনন্দে সিগারেটটি তুলে নিয়ে দেশলাই জ্বেলে ধরাতেন এবং এরপর চা ও খাবারের সঙ্গে গল্পে মেতে যেতেন। এরকম প্রায়ই হত।

একদিন তিনি চলে যাওয়ার পর আমার তিন বছরের দ্বিতীয় পুত্র হঠাৎ দেখি কি একটা জিনিস মুখে নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। জিনিসটি আর কিছু নয়।

অ্যাসট্রে থেকে কুড়নো বিভূতিবাবুর খাওয়া আধপোড়া বিড়ি। আমি হঠাৎ বুঝতে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস করেছি, "কি মুখে দিয়েছ ?" সে মহানন্দে জোরে বলে উঠলো, "বিড়ি ! বিড়ি ! আমি বিভূতি জেঠামশাই হয়েছি।" বিভূতিবাবু আরেকদিন এলে পর তাঁর কাছে যখন এই গল্পটা করলাম, তিনি আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলেন, বললেন "হ্যাঁ বাবা, এরকম বলেছিলি !"

তিনি ছোটদের সঙ্গেও একেবারে ছেলেমানুষের মত মিশতে পারতেন।

তিনি ছোট ছেলেদের জন্য একটা গল্পের বই লিখেছিলেন, সেই সময়ে গত দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেই গল্পের বইএ বিমানযুদ্ধের বর্ণনা দেবার সঙ্কল্প করে একদিন আমাদের বাড়ি এসে হাজির। এসেই আমার বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, "ওরে ভোঁদো, কোথায় তুই, শীগগির আয় বাবা ! কতগুলি 'বমার'-এর নাম আমায় বলে দে।" যুদ্ধের সময় যে সব "বমার" ইত্যাদি ব্যবহার হত ছেলেরা তাদের বাবার কাছে থেকে সব ছবি দেখে তাদের নাম খুব রপ্ত করেছিল, সেটা উনি জানতেন। বড় ছেলে তখন মাত্র ছয় বছরের। সে বিভূতিবাবুর কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে খেলে বেড়াচ্ছে, তিনি তার পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন আর বলছেন, "আয় না রে, তোর বাবা আসবার আগে আমায় বলে দে, তা না হলে তোর বাবা এসে গেলে আমায় জেরা করে মারবে।" ওদিকে আবার বন্ধুকে ভয় আছে, যদি তাঁর কাছে অজ্ঞতার জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়।

একদিন আমি ও বিভূতিবাবু বসে গল্প করছি, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। এর মধ্যে আমার ছোট দেওর একটি বাঘের ছাল (ছেলেরা তাদের কাকার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল, বাঘ শিকার খেলবে বলে) গায়ে দিয়ে বাঘের মাথাটা ঠিক মুখের সামনে দিয়ে হাতে পায়ে হামা দিয়ে আস্তে করে গুড়ি মেরে মেরে বিভূতিবাবুর পায়ের কাছে এসে হালুম করে শব্দ করেছে কি সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভয় পেয়ে এমন চিৎকার দিলেন যে তাঁর কাণ্ড দেখে আমরা তো হেসেই অস্থির। পরে আমি তাঁকে ঠাট্টা করে বললাম, "এই বুঝি আপনি বীরপুরুষ ? জঙ্গল জন্তু-জানোয়ার কত কিছুই ভালবাসেন, 'আরণ্যকে' কত কিছুই লিখেছেন, আর একটা মরা বাঘের ছাল দেখে অজ্ঞান হবার উপক্রম !"

১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে আমার স্বামী পাটনার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী এঁদের যাবার কথা। ঠিক হয়েছে সবাই মিলে একসঙ্গে ইন্টার ক্লাস গাড়িতে যাবেন। এর মধ্যে যেদিন রওয়ানা হবেন, সেদিন সকালবেলা হঠাৎ বিভূতিবাবু আমাদের বাড়ি এসে হাজির। উনি বললেন, "কি মশায় ! আমার সঙ্গে আপনিও কি যাবার ইচ্ছা রাখেন ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হুঁঃ। নিয়ে গেলে কি আর যাবো না !" উনি বললেন, "চলুন 'শনিবারের চিঠির' আপিসে, দেখা যাক্ কি করা যায়।"

খানিক পরে দুজনে ফিরে এলেন। ঠিক হয়েছে সকলে থার্ডক্লাসে যাবেন, কারণ বিভূতিবাবুর ভাড়াটাও ঐ টাকায় কুলিয়ে নিতে হবে।

টিকিটের ব্যবস্থা তো হল, এখন জামা-কাপড় ? শীতকালে পাটনায় খুবই শীত।

কলকাতায় অত গরম কাপড় দরকার হয় না। ওঁর জন্য যা নিজের ছিল, তাছাড়া অমল হোম মহাশয়ের কাছ থেকে তিব্বতী বক্কু, টুপি, বালাপোষ ইত্যাদি যোগাড় করা হয়েছিল। এখন বিভূতিবাবুর জন্য আবার কোথায় কি পাই ? ছোট দেওরকে বললাম, "বিনু, বার কর তো তোমার ওভারকোট, মোজা ইত্যাদি।" তারপর সেইসব পরে আমার ওয়ারড্রোবের আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানা দেখে আহ্লাদে হেসেই অস্থির। আরশিতে নিজের চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর বলছেন, "বাঃ ! খাসা হয়েছে।" তাঁকে বলে দিলাম সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গেই দু-বন্ধু আমাদের বাড়ি থেকে খেয়ে রওয়ানা হবেন।

সন্ধ্যেবেলা এসে দেখলেন ওঁর বিছানা ইত্যাদি হোল্‌ডলসে ভরা হচ্ছে। পরিষ্কার চাদর, বেডকভার, বালিশ, সব চাকরকে এগিয়ে দিচ্ছি, সে ঢোকাচ্ছে। বিভূতিবাবু কাছেই খাটের উপর বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "নীরদ যাচ্ছে যেন রাজাটা, আর আমি সঙ্গে যাচ্ছি চাকরটা।" তাঁর এই উক্তিতে হাসবো কি কাঁদবো, একটু দুঃখও হল। তারপর তাঁর সঙ্গে যে ছোট ব্যাগটা ছিল তা খুলে দেখি একটা নোংরা লাল গামছা ও আধময়লা একটি ধুতি। তাড়াতাড়ি যতটা পারি তাঁকেও পরিষ্কার ধুতি, তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে যতটা পারা গেল সভ্যভাবে ফিটফাট করে পাঠানো গেল। তিনি কিন্তু নির্বিকার।

ওঁদের যেদিন পাটনা থেকে ফিরবার কথা তার একটা দিন আগেই ফিরলেন। হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা দু-বন্ধুতে এসে হাজির। বর্ধমান স্টেশন থেকে উনি ছেলেদের জন্য এক চাঙারি মিহিদানা, সীতাভোগ কিনে এনেছেন। এসে বললেন, "বিভূতিবাবুর জন্য কি আর এগুলো আনতে পারি ? সজনীবাবুদের উপর রেগে শোধ মেটাবার জন্য আমার চাঙারি থেকে মুঠো মুঠো সব নিয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন। অতি কষ্টে কিছু বাঁচিয়ে এনেছি।"

পরে আসল ব্যাপারটা শুনলাম। বিভূতিবাবু পাটনা থেকে একদিনের জন্য বক্তিয়ারপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন এবং তাঁরা সেখান থেকে কলকাতায় কোন এক আত্মীয়কে দেবার জন্য বিভূতিবাবুর সঙ্গে এক ঝুড়ি খাজা দিয়ে দেন। সারা রাস্তা সজনীবাবুরা কেবল ঐ খাজার ঝুড়িতে হাত ঢোকান আর খাজা বের করে করে খান। তাইতে তিনি রেগে আমাদের চাঙারির উপর শোধ তুলবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু হায়, শেষ পর্যন্ত আমার ছেলেদের হাত থেকেও রেহাই পেলেন না। ওঁরা দু-বন্ধু হাতমুখ ধুয়ে যখন খেতে বসেছেন হঠাৎ দেখি আমার দুই বালক যে ঘরে বিভূতিবাবুর মালপত্র রাখা ছিল, সেখান থেকে তাঁর খাজার ঝুড়ি আবিষ্কার করে তা থেকে দু-ভাই দুটি খাজা নিয়ে দিব্য সদ্‌গতি করতে করতে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তো 'হাঁ ! হাঁ !' করে চেঁচিয়ে উঠেছি, তাইতে বিভূতিবাবু হেসে বললেন, "আহা, খাক্‌, খাক্‌, ওরা ছেলেমানুষ !"

তারপর খাওয়াদাওয়ার পর উনি তো গিয়ে ঘুমিয়ে রইলেন। বিভূতিবাবু অনেক রাত পর্যন্ত বসে গল্প করলেন। বোধ হয় মেসে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। যাবার

সময় কতক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "দেখুন এক কাজ করুন। ঝুড়ি থেকে দুটো খাজা একটা আপনার ও একটা বিনুর (ছোট দেওর) জন্য রেখে দিন।" আমি অবশ্য তখুনি বলে দিলাম, "ঐ তো কটামাত্র খাজা রয়েছে, সবই নিয়ে যান। ও তো আপনার নিজেরও জিনিস নয়। আরেক জনকে দিতে হবে।"

তাঁর সব বইগুলিতেই প্রকৃতির উপর আকর্ষণ দেখা যায়। সর্বদাই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। একবার গ্রীষ্মের ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, "এবার বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পা পিছলে পড়তে পড়তে মাথার উপর একটা গাছের ডাল ভেবে যেই চেপে ধরতে যাবো, হঠাৎ তখনি চোখে পড়লো ওটা তো গাছের ডাল নয় ; ছিট্-ছিট্ হলদে ও বাদামী রংএর একটা সাপ। এ-গাছ থেকে ও-গাছে লম্বা হয়ে দুদিক থেকে জড়িয়ে আছে।" তাঁর কাছে এই গল্প শুনে আমি তো শিউরে উঠলাম। তিনি এমন করে ঐ সাপের দৃশ্যটা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, যে ঠিক একটা ছবির মত আমার মনে গেঁথে আছে ; এবং যখনি তাঁর সেই গাছের ডালের ছদ্মবেশে সাপের কথা মনে হয়, তখুনি একটা ছবি চোখে ভেসে ওঠে এবং সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তাঁর দেশ যশোরের বনগাঁয়ের কাছে বারাকপুর গ্রামে ছিল। সেখানে একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার অল্পবয়স্কা মেয়েকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। সেই মেয়েটির ডাকনাম ছিল "খুকু"। ছুটিতে যখনি দেশে যেতেন, ফিরে এসে খুব খুকুর গল্প করতেন। একবার এসে বললেন, "জানেন, একদিন আমি বিকেলে দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছি, খুকু এলো পুকুর থেকে জল তুলে। এসে আমাদের বাড়ির খিড়কির দোর দিয়ে একটু উঁকি মেরেই পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি ডাকলুম, 'খুকু, এদিকে আয়।' সে একটু এগিয়ে আসতেই, আমি একটি কচুরিপানার ফুল তুলে পাশে রেখে দিয়েছিলুম, সেটি তার খোঁপায় গুঁজে দিলুম। আহা, ফুলটা ভারী মানিয়েছিল তার খোঁপায়।"

তাঁর মুখে এই কচুরিপানার ফুলের সৌন্দর্যের কথা শুনে আমার নিজের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ হয়ে গেল এই ফুলটার ওপর। আমি পাহাড়ের মেয়ে, কচুরিপানা আগে আর কোথায় দেখব ? কিন্তু আজকাল যখনি কোথাও জলের মধ্যে সেই বেগুনী রং-এর সুন্দর ফুলের থোকাটি দেখি, তার সৌন্দর্য উপভোগ না করে পারি না এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বর্গীয় সুহৃদ্ বন্ধুটির কথাগুলো কানে বাজতে থাকে।

একবার এসে আমায় বললেন, "জানেন ! ঐই নামে একটি মেয়ে আমার বই পড়ে অতি সুন্দর চিঠি লিখেছে, এবং সেও আপনাদের শিলং-এই থাকে।" আমি নামটি শুনেই বললুম, "আরে, এ যে আমার সহপাঠী !" আমার এই সহপাঠী ও তার পিতাঠাকুর কয়েকবারই ওঁকে তাঁদের বাড়ি শিলংএ নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছেন এবং সেখানে খুব ঘুরে বেড়িয়ে এসে আমায় বলতেন, "আপনার জন্মস্থান দেখে এলুম।"

যতবারই কোথাও যেতেন যাবার আগে এসে আমার 'হোল্ড-অল্' ও 'এ্যাটেসীকেস্‌টি চেয়ে নিয়ে যেতেন। আর বলতেন, "ভদ্রলোকের বাড়ি যাচ্ছি, একটু ভদ্রসদ্র হয়ে যেতে হবে তো!"

তিনি যখনি যা বলতেন, এমন করে বলতেন যে, ঠিক যেন জলছবির ছবির মত মনে ছাপ পড়ে যেতো। না দেখে থাকলেও একটি অতি মর্মান্তিক দৃশ্য আমার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। একবার দেশ থেকে এসে বললেন, "মস্ত বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ওপর।"

আমি বললুম, "কি হল?"

বললেন, 'ইছামতী নদীতে দিদি নাইতে গিয়েছিলেন আর ফিরলেন না; কুমীরে নিয়ে গিয়েছে, ডাঙ্গায় শুধু তাঁর থান কাপড়খানা ও ঘটি পড়ে ছিল। এখন ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দেখাশোনা আমাকেই করতে হবে।"

তিনি তাঁর একমাত্র ভাই নুটুকেও অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সব সময়ে তার গল্প করতেন এবং খুব উৎসাহ করে ভাইকে ডাক্তারী পাস করিয়েছিলেন। তারপর ঘাটশিলায় বাড়ি করে দিয়ে ভাই-এর সেখানে প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করে দেন। দুই ভাই-এ অদ্ভুত ভ্রাতৃপ্রেম ছিল। বিভূতিবাবুর মৃত্যুর শোক সংবরণ করতে না পেরে ভাইটিও সাত দিন পরে আত্মহত্যা করে বসেন।

ঘাটশিলা জায়গাটা তাঁর খুব ভাল লাগতো। সেখানে বাড়ি করবার সঙ্কল্প করে প্রায়ই যাতায়াত করতেন এবং তার পরের স্টেশন গালুডিও যেতেন। আমায় অনেকবার গালুডিতে বেড়াতে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু ছেলেরা ছোট ছোট থাকাতে আমার আর যাওয়া হয়নি।

একবার আমার ভাসুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী পূজোর ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাবেন ভাবছেন, এই কথা বিভূতিবাবু শুনেই বললেন, "গালুডি যান, এক্ষুণি বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি।"

উনি গালুডি গিয়ে বরাবর যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়ি ঠিক করে দিয়ে, কখন কি করতে হবে, কার সাহায্যে জিনিসপত্র পাওয়া যাবে ইত্যাদি একটা মস্ত তালিকা লিখে দিলেন। তাঁর এই তালিকা দেখলেই বোঝা যায় শুধু বেড়িয়ে বন-জঙ্গল দেখেই তার সন্তুষ্টি ছিল না—নজর সব কিছুর উপরেই ছিল। আমি তাঁর লেখা এই তালিকাটি আমার ভাসুরের কাছ থেকে চেয়ে এখানে উদ্ধৃত করলাম।

তালিকাটি ঃ—

সকালে—নেকড়াডুংরি পাহাড় থেকে সূর্যোদয় দর্শন।

দুপুরে—বলরাম সায়রে স্নান।

বিকেলে ৪॥ / ৫- Beauty Spots

(১) সুবর্ণরেখার ধারে;

(২) ন-দীয় নোলা—a hillock;

(৩) উলদডুংরির পথে চন্দ্ররেখা গ্রাম পর্যন্ত যাওয়া;

(৪) সুবর্ণাচলে ভ্রমণ (ask চৌধুরীরবাবু Assi. Station Master)

(৫) মোহিনীবাবু নার্সারির সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ তাঁহার আপিসঘর হইতে সুবর্ণরেখার ওপারের দৃশ্যদর্শন (বৈকালে) ;

(৬) সাঁওতালদিগের সমাধিস্থান দর্শন, স্টেশন হইতে সুবর্ণরেখার পথে বামদিকে কিছুদূরে শালবনের ভিতর ;

(৭) বড়বিল অথবা সম্ভব হইলে শতগুড়ুম ভ্রমণ। গুঁইরাম গাড়োয়ানের গাড়িতে। কৃষ্ণ আনিয়া দিবে।

(৮) ধারাগিরি বাসাডেরা waterfall—4miles.

সকালে—

(৯) রাখামাইনস্ ভ্রমণ (নীলঝর্ণা) ;

(১০) রাণী ঝর্ণা ভ্রমণ ;

(১১) বসাক ভিলার শালের রাস্তা দিয়ে প্রথম Railway level crossing পর্যন্ত ভ্রমণ।

Provisions

হাট

সোমবার—৩টা/৪টা

চাল সকাল সকাল গিয়া ক্রয় করিতে হইবে।-

সরিষা তেল—বিনোদমার্কা ১ টিন

ভাল ঘৃত—প্রয়োজন মত

মাখন—

চা—

সোনামুগের ডাল—

তেঁতুল—

মাছ ও মাংসওয়ালাকে কৃষ্ণ বলিয়া দিবে ;

মুর্গী ও ডিম হাটে কিনিতে হইবে।

হাটে পেঁপে কিনিয়া প্রতিদিন খাইতে হইবে।

মাছের সের ছয় আনা মাত্র।

available

আলু	মাড়োয়ারীর দোকানে জিনিসপত্র
বেগুন	ক্রয় করিতে হইবে। অর্ডার দিলে
পেঁপে	টাটানগর হইতে ভাল জিনিস
টোমাটো	আনাইয়া দিবে।

দুধ কৃষ্ণ ব্যবস্থা করিবে।

লোকজন
গিয়াই চন্দ্রমোহন পান্ডে পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে আলাপ,
বাদলবাবু ও বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ,
চৌধুরীবাবুর সঙ্গে আলাপ,
কলসীবাংলার বৌদিদির সঙ্গে আলাপ।

জল

কলসীবাংলা হইতে জল আনাইতে হইবে।
মেথরের বন্দোবস্ত ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণের দ্বারা অথবা
পোষ্টমাষ্টারের দ্বারা—
মশারি লইয়া যাইতে হইবে—
হ্যারিকেন লণ্ঠন—৪টা
ষ্টোভ
দা। বালতি। দড়ি।
খানিকটা তার আলনার জন্য, অন্ততঃ দশ হাত ;
টিংচার আইডিন—১শিশি। কুইনাইন—১শিশি।

Imp
Deck Chair
পেয়ারা গাছের তলায় ছায়ায় অথবা বাংলোর সম্মুখে হরিতকী গাছের তলে ডেক্ চেয়ার পাতিয়া চিন্তা ও অধ্যয়ন।

৯-৩৩মিঃ —২॥০ (পড়া যায় না)

১৭/১৮ই অক্টোবর নাগাদ আমরা একসঙ্গে ধারাগিরি যাইব। আমরা বেলা একটার গাড়িতে রাখামাইনস্ হইতে আসিব।

আমার ভাসুর বিভূতিবাবুর কথায় খুব খুশী হয়ে মনের আনন্দে গালুডি রওয়ানা হয়ে গেলেন। দুদিন পরেই তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি এলো, বিভূতিবাবুর ওপর ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে লিখেছেন, "এটা আবার একটা বাড়ি নাকি ? একটা মাঠকোটা, তার দরজা বন্ধ করা যায় না, কোন হুড়কো নেই, ছিটকানি নেই, রাতে ট্রাঙ্ক-বাক্স দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখতে হয়। মাঝরাতে হায়না বাড়ির ভেতর উঠোনে এসে হাঃ ! হাঃ ! করে ডাকে।" ইত্যাদি।

একদিন পরে বিভূতিবাবু খবর করতে এসেছেন, গালুডি থেকে কোন চিঠিপত্র এলো কিনা, আমরা তাঁকে চিঠিখানা পড়ে শোনালাম, শুনে কোন গ্রাহ্যই করলেন

না। হাসতে হাসতে শুধু বললেন, "ওসব ঠিক হয়ে যাবে।"

আমি ওঁকে বললাম, "ব্যাপারটা কি? ওঁরা লিখছেন বাড়ি কদর্য, আর এই ভদ্রলোক কোন কেয়ারই করছেন না!"

উনি নিজে আসলে খুবই 'কনফিডেন্ট' ছিলেন যে ওঁদের জায়গাটা ভাল লাগবেই। আর সত্যি হলোও তাই। কয়দিন থাকার পর আমার ভাসুর ও জায়ের গালুডি জায়গাটা এতই ভাল লেগে গেল আর মাঠ-কোঠার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না, উল্টে, আরও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে লিখে নিয়ে গিয়ে খুব হৈ-চৈ করে পূজোর ছুটি কাটিয়ে এলেন।

তাঁর ঐ তালিকায় "বাদলবাবুর সঙ্গে আলাপ।" লেখাটা পড়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বাদলবাবু কি গালুডির কোন বিশিষ্ট লোক?" উনি কেন জিজ্ঞাসা করায় আমি তখন আমার একবার জামসেদপুর যেতে হাওড়া স্টেশনে কি ঘটেছিল তাঁকে তা বললাম।

একবার আমার দুই ছেলে নিয়ে জামসেদপুর, যাচ্ছি সঙ্গে আমার ন দেওর, তিনি তখন জামসেদপুরেই কাজ করেন। হাওড়া স্টেশনে ছোট দেওর বিনু আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে এসেছে। হঠাৎ একটি লোক একটা বন্ধ করা কাঠের প্যাকিং বাক্স গাড়িতে এনে আমাদের বললে, "আপনারা গালুডি স্টেশনে বাদলবাবুকে এই বাক্সটা দিয়ে দিতে পারবেন কি?" আমার ছোট দেওর ভীষণ ভাবে আপত্তি জানালেন। ন'দেওর বললেন, "নিয়েই নিই।" কিন্তু ছোট দেওর বরাবরই একটু সন্দিগ্ধচিত্ত, হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "ভগবান জানেন, ওই বাক্সটার ভিতর বোমা আছে না কি আছে! ওসব হবে না, ছোট ছেলে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ, কোন্ হাঙ্গামায় পড়বো কে জানে?" যাক্! আমরা আর নিলাম না। কিন্তু গালুডি স্টেশনে মুখ বাড়িয়ে সেই বাদলবাবুটিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলাম। বিভূতিবাবুকে এই গল্পটা বলার পর বললেন, "তা বিনু একদিকে ভালই করেছিল, সবাইকে ত বিশ্বাস করা যায় না, তবে বাদলবাবু অতি সজ্জন মানুষ।"

আমি তাঁকে অনেকবার আবার বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁর ঐ একই উত্তর ছিল, "না। ও আর সম্ভব হবে না।" এরপর হঠাৎ একদিন এক ছুটির পর এসে বললেন, "আমি বিয়ে করে এলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকে?" বললেন, "কল্যাণীকে।" আমার মনে হয় এই নামটা তিনি নিজেই দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর স্ত্রীর নাম শুনেছি "রমা"। তিনি বরাবর তাঁর স্ত্রীর কথা উল্লেখ করতে আমার কাছে 'কল্যাণী' বলেই বলতেন। তারপর কি করে বিয়ে হলো, কেন করলেন ইত্যাদি অনেক কথাই বললেন। তিনি সেই সময়ে কলকাতায় মাস্টারী করতেন আর প্রতি সপ্তাহের শেষে বাড়ি যেতেন। সোমবার বিকেলে এসে আমায় বলতেন, "কল্যাণী কি আমায় আসতে দেয়, নিজের শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে আমার ধুতির কোণা নিয়ে গেরো বেঁধে সেটা চেপে শুয়ে থাকে। পাছে আমি চুপি চুপি উঠে চলে আসি।" আমি ঠাট্টা করতাম, "বৃদ্ধকালে বিয়ে করলে এই অবস্থাই হয়!" সঙ্গে

সঙ্গে "হাঃ! হাঃ!" করে সরল অট্টহাসি।

উনি এবং বিভূতিবাবু এক মেসে থাকতেন এবং দুজনেই বিশেষ কিছু করেন না, পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন দেখে মেসের দু-একজন ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন যে এঁদের জীবনে কিছু হবে না। তবু তাঁর আত্মবিশ্বাস্ টলে নি, ওঁর ওপর বিশ্বাসও টলে নি। তখনও ওঁর আত্মজীবনী প্রকাশ হয় নি, লন্ডনে ছাপা হচ্ছিল। বিভূতিবাবু তখন লিখছেন যে, "নীরদ, আজ কোথায়... যারা নাকি তোমাকে ও আমাকে বিদ্রূপ করে বেড়াতো, তারা আজ কোথায়?"

বিভূতিবাবু অবশ্য তখন খ্যাতনামা বাংলা লেখক। তাঁর প্রথম বই 'পথের পাঁচালী" যখন লিখতে শুরু করেন, তখনই কয়েক পাতা ওঁকে উনি দেখান এবং উনি পড়ে তাঁকে খুব উৎসাহ দেওয়ার পর তিনি আস্তে আস্তে বইখানা শেষ করেন। এর উল্লেখ করেও তিনি লেখেন যে, "যখন আর কেউ আমাকে উৎসাহ দেয় নি, একমাত্র তুমিই দিয়েছিলে।" আর একটা কথাও তিনি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে, সেটা ওঁর খুব ভাল লেগেছিল। তিনি জানান্ যে তাঁর এবং অন্য বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে কোনও রেষারেষি নেই, সকলেই সকলের সাফল্যে খুশী। তিনি কি নিজের গুণেই লিখেছিলেন? এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনে হয়, কারণ লেখকদের মধ্যে পরস্পর-প্রীতির খুব পরিচয় আমি পাই না।

একমাত্র একটা বিষয় নিয়ে তিনি কখনো আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন না। সেটা হল "ভূতের গল্প" বা "পরকাল"। উনি জানতেন আমরা স্বামী-স্ত্রী একেবারেই এ জিনিসে বিশ্বাস করি না। আমি দু-একবার তাঁর কি বিশ্বাস জানবার জন খোশামোদ করেছি, কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিতেন। অথচ এই পরকালের আলোচনা আমাদেরই ঘরে বসে স্বর্গীয় চপলাদেবীর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা চালিয়ে গিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের আলোচনার সময় আমাকে উপস্থিত থাকতে দিতেন না। আমরা দিল্লী আসার পর হঠাৎ একদিন বিকেলবেলা গজেনবাবু, সুমথবাবু এঁদের নিয়ে আমাদের বাড়ি এসে হাজির। তাঁকে দেখে আমাদেরও যেমন আনন্দ হলো, তাঁরও তেমনি। ওঁকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, "নীরদ, তুমি একটা বাঁদর। নীরদ, তুমি একটা বাঁদর।" আমার এখনও তাঁর সেই কথাগুলো কানে বাজছে।

তাড়াতাড়ি গরম গরম হালুয়া আর চা করে সবাইকে দিলাম। উনি কেবলই বড়াই করে বলতে লাগলেন, "খেয়ে দেখ হে, আসল ঘি-এ তৈরী হালুয়া।"

তখন ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারিনি, কারণ বনস্পতি ব্যবহার তখনো শিখিনি, কলকাতায় ততদিনে ঐ বস্তু চালু হয়ে গিয়েছে। চা খেয়ে গিয়েই দৌড়ে আমার শোবার ঘরে ঢুকে আমার খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর বন্ধুরা, যাঁরা সঙ্গে এসেছিলেন, যত ডাকাডাকি করছেন, 'ওঠা যাক,' বলে উনি তত শক্ত করে খাটের দুটো পাশ আঁকড়ে ধরে বলতে লাগলেন, "তোমরা যাও, আমি যাবো না।" ঠিক ছেলেমানুষের মত করতে লাগলেন, যেন তাঁর বন্ধুরা জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন।

'যেতেই হবে', বলে অগত্যা উঠে, আমি দিল্লী এসে তাঁকে চিঠি লিখিনি বলে

চক্ষু রক্তবর্ণ করে অভিযোগ করাতে, আমি বললাম, "ঠিকানাই জানি না কি করে লিখবো।" তার উত্তরে বললেন, "মুখস্থ করে রাখুন—গোপালপুর হাইস্কুল, গোপালপুর পোষ্টআপিস্।" (গোপালপুর না গোপালগঞ্জ বলেছিলেন মনে পড়ছে না ঠিক, তবে গোপালপুর বলেই মনে হয়।) এই প্রায় দশবার বলতে বলতে দরজা পর্যন্ত গেলেন। তারপর ছল্ ছল্ চোখে আবার আসবো বলে বিদায় নিয়ে গেলেন। হায়! কে জানতো তাঁর সঙ্গে ঐ শেষ দেখা।

অপূর্বমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র যখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন, কিছুতেই আর মনকে বোঝাতে পারলাম না যে ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী সরল বন্ধুটির আর দেখা পাবো না বা তাঁর কথা আর শুনবো না।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় আসতেন। তিনি এসেই ডিভানের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে যে গল্প সুরু করতেন, দেখতে দেখতে কখন যে রাত দশটা বেজে যেতো টেরই পেতাম না। প্রথম যেদিন সুনীতিবাবু এলেন সেদিন উনি আমার হাতের আঁকা একটা অয়েলপেন্টিং তাঁকে দেখালেন। সুনীতিবাবু ত সেই ছবি দেখে একেবারে মুগ্ধ। কেবলই বলতে লাগলেন, এত সুন্দর ছবি এঁকেছেন! এই ছবি আঁকা বন্ধ করবেন না, সমানে চালিয়ে যেতে থাকুন। কিন্তু বাধ্য হয়ে ছবি আঁকা স্থগিত রাখতে ও পরে বন্ধই করতে হলো।

সেই সময়ে 'মডার্ন রিভিয়ু' আপিস থেকে 'বিশাল ভারত' বলে আরেকটা হিন্দী বই বের হতো, তার সম্পাদনা করতেন পণ্ডিত বেনারসীদাস চতুর্বেদী। তিনি উত্তর ভারতের লোক ছিলেন। উনি একদিন বললেন, 'আজ আপিসফেরৎ পণ্ডিতজী আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসবেন। তিনি শুধু দুধ পাঁউরুটি খান। উনি বলেছেন পাঁউরুটি নিজেই নিয়ে আসবেন, তুমি শুধু গরম দুধের ব্যবস্থা রেখো।' বিকেলবেলা ওঁর সঙ্গে পণ্ডিতজী তাঁর পাঁউরুটি হাতে নিয়ে এলেন। পরণে খদ্দরের ধুতি, গায়ে সাদা খদ্দরের মেরজাই ও কাঁধে একটি লাল গামছা। শুনেছিলাম যে তিনি জামা ছাড়াই শুধু গায়ে থাকেন, তবে সেদিন আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ, সেজন্য বোধ হয় জামা ছিল গায়ে। আমি তাঁর হাত থেকে রুটিটা নিয়ে স্লাইজ করে কেটে একটা প্লেটে নিয়ে আর বাবার দেওয়া রূপোর বাটিতে গরম দুধ নিয়ে দিলাম। রূপোর বাটিতে দুধ দেওয়াতে একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, আমায় কেন আর এই রাজসিকভাবে অভ্যর্থনা করছেন! আমি অতি সাধারণ সন্ন্যাসী মানুষ।

এর মধ্যে একদিন খবর এলো গোপাল হালদার-এর জেঠাইমা— শ্রীযুক্ত রঙীন হালদার ও আমার ব্রাহ্মগার্লস স্কুলের সহপাঠিনী লক্ষ্মী হালদারের মা— মারা গিয়েছেন। ভবনাথ সেন স্ট্রীটের বাড়িতে আমার স্বামী ও এই পরিবার থাকতেন ওপর এবং নীচের তলায়। লক্ষ্মী এসে অনেক করে শ্রাদ্ধে যাবার জন্য অনুরোধ করে গেল। আমার ভাশুর ও জায়ের যাবার কথা। ঠিক হল আমার বড়জা ও আমাকে উনি

নিয়ে যাবেন। দিদি বিকেলবেলা তাঁর দেড়বছরের শিশুকন্যা কৃষ্ণাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন।

উনি সন্ধ্যের একটু আগে আমাদের বললেন, 'তোমরা যাবার জন্য তৈরী হও, আমি একবার একাই ও-বাড়িতে ঘুরে আসি।'

একটু পরে বাড়ি এসে বললেন, 'কে একটা লোক সিগারেট খেয়ে আমার নাকমুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়েছে, তাইতে আমার গা-বমি-বমি করছে।' বলে শুয়ে পড়লেন এবং এমন ঘুম দিলেন আর উঠবার নাম নেই। আমি ও আমার জা দুজনে কয়েকবার ডাকডাকি করেও ওঠেন না দেখে বসে গল্পসল্প করতে লাগলাম।

রাত যখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, আমি তখন ওঁকে ডেকে বললাম, 'এটা কি ! দিদিকে কি আজ রাতে আমাদের বাড়ি উপোস থাকতে হবে?' সেদিন চাকরকেও ছুটি দিয়েছিলাম। আবার উনুন ধরিয়ে অত রাতে রান্নার যোগাড়ও হাঙ্গামা। আমার কথা শুনে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে পয়সা নিয়ে দ্বারিকের দোকান থেকে ডাল, আলুরদম, লুচি কিনে নিয়ে এলেন। আমরা দুই জা মিলে বসে খেলাম। এখন চিন্তা হল শিশু কৃষ্ণার জন্য। দিদি ভেবেছিলেন রাত দশটায় দুধ ভাত বাড়ি ফিরেই খাওয়াতে পারবেন, এদিকে আমাদের বাড়িতেও দুধের কোন ব্যবস্থা নেই। দিদি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিছরি আছে কি ঘরে?' আমি বললাম, 'আছে।' মিছরি বের করে দিতে বেচারী ক্ষুধার্ত কৃষ্ণাকে মিছরির জল করে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হল। রাত এগারোটার পর আমার ভাশুর এসে হাজির। বললেন, 'ওকি ! আমি তোমাদের সকলের অপেক্ষায় ও-বাড়িতে এতক্ষণ ধরে বসে আছি, তোমরা কেউ যাওনি কেন?' তারপর সমস্ত কাহিনী শুনে হাসতে লাগলেন। পরে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিদি ও মেয়েকে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

সমরের কলেজ খুলে যাওয়াতে সে দেশ থেকে ফিরে এলো। সেদিন তার বিকেলের দিকে ক্লাস, সেজন্য সকালে কলেজ যাওয়ার তাড়া নেই। বেলা বারোটা নাগাদ দুজনে খেতে বসে গল্পসল্প করছি, কাশী আমাদের পরিবেশন করছিল, হঠাৎ সদরে বেল বেজে উঠলো। কাশী দরজা খুলে দিয়েই খুব খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি এসে বললো, 'টলুবাবু, বিনুবাবু এসেছেন।' কাশী তাদের আগেই চিনতো। কাশী আগে ঐ ভবনাথ সেন স্ট্রীটেই আরেকবাড়ি কাজ করতো। সে সেখানে সময়মত মাইনে পেতো না তাই ছেড়ে দেয়। আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সমর উঠে গিয়ে এসে বললে, ঠিকই। আমি উঠে হাত মুখ ধুতে ধুতে দু ভাই কাপড়চোপড়ের পুঁটলি বগলে, একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে এসে ঢুকলো। ন'দেওর টলু একগাল হেসে বললে, 'এই বুঝি আমাদের নতুন মেজবৌদি !' বলে ঢিপ করে প্রণাম করলে, পেছনে পেছনে ছোট দেওর বিনুও তার লম্বা লম্বা হাত দিয়ে করজোড়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। আমার তো একটু সঙ্কোচই লাগলো তাদের প্রণামের ঘটা দেখে। কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট বড় হলেও বয়সে আমি তাদের ছোট।

কাশীকে বললাম, তাড়াতাড়ি এঁদের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। আগে

অল্প কিছু খাবার ও চা দেওয়া যাক, তারপর যা হয় রান্না চড়িয়ে দাও।

আমি নিজে হালুয়া করে, পাঁপড় ভেজে নিয়ে টিপট্-এ চা ভিজিয়ে, দুধের জাগে দুধ, চিনির বাটিতে চিনি, কাপ ইত্যাদি সব ট্রেতে করে সাজিয়ে নিলাম।

উনি, আমি ও সমর কেউ-ই চা খেতাম না, সেজন্য বাড়িতে চা-এর সরঞ্জাম থাকলেও কোন পাট ছিল না।

ন'দেওর তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দাড়ি কামিয়ে চান করে পরিষ্কার হয়ে এসে চা খেতে বসলেন। আর ছোট দেওর যেভাবে ফিরেছিলেন সেই অবস্থাতেই খাবারঘরের কোণে একটি টেবিলে ফল সাজানো ছিল, লাফ দিয়ে সেই টেবিলের ওপর উঠে বসে একটার পর একটা কলার সদগতি করতে লাগলেন।

খাবার, চা ইত্যাদি ট্রেতে আমার নিজের হাতের কাজকরা ট্রে-ক্লথ পেতে বিলিতি কায়দায় সাজিয়ে দেওয়াতে ন'দেওর খুব খুশী হয়ে বললেন, 'এতসব আপনি শিখলেন কোথায় ?' আমি তাই শুনে শুধু হাসলাম।

চা খেয়ে ছোট দেওর সমরকে নিয়ে ওঁর কাছে 'প্রবাসী' আপিসে রওয়ানা দিলেন। কাশীকে বললাম তাড়াতাড়ি খিচুড়ি, ডিমের ডালনা ও বেগুনভাজা রেঁধে ফেলতে। আমি ও ন'দেওর বসে গল্পসল্প করতে লাগলাম। রান্না হতে হতে ওদিক থেকে উনিও খুব উত্তেজিত অবস্থায় ছোট ভাই ও সমরকে নিয়ে বাড়ি এসে হাজির। সকলে খাওয়াদাওয়া সেরে অনেকক্ষণ জুড়ে গল্পসল্প করার পর ভাই-এরা সবাই মিলে বাদুড়বাগানে দাদার বাড়ি ঘুরে আসতে গেলেন। সেদিন সকলের আনন্দ দেখে কে !

শ্বশুরমশাই নবদ্বীপে থাকতেন। তাঁকে টেলিগ্রাম করে খবর পাঠানো হল যে টলু, বিনু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। পরদিন তিনিও এসে পৌঁছে গেলেন। উনি বাদুড়বাগানে ভাশুরের বাড়িতেই রইলেন। তবে তাঁকে বলে দিলাম, যে ক'দিন কলকাতা থাকবেন রোজ দুপুরে আমাদের বাড়ি এসে ছেলেদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবেন।

কয়দিন পর নবদ্বীপ ফিরে যাওয়ার আগের দিন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ওঁকে বললেন, 'নিরু, তোমার জন্য আমার বড় চিন্তা হচ্ছে ! বিয়ে করে সংসার বাড়লো, এর ওপর দু ভাই-এর দায়িত্ব, একা তুমি কি করে সব খরচ সামলাবে ? সেই ভেবে চারুকে প্রস্তাব করেছিলাম, এক ভাই তার কাছে থাক ও আরেকজন তোমার কাছে—যতদিন তারা কোন চাকরিবাকরি না পায়। কিন্তু চারু বললে, 'তাদের নানারকম অসুবিধা আছে। তার পক্ষে সেটা করা সম্ভব হবে না।' উনি তক্ষুনি শ্বশুরমশায়কে বললেন, 'বাবা, তুমি টলু-বিনুর জন্য কোনো চিন্তা করো না।' ওঁর কাছে সব শুনে বললাম, 'যেমন করে হোক আমাদের সকলের চলে যাবে। চিন্তা করে কিছু লাভ নেই। ভগবান ঠিক সব চালিয়ে দেবেন। আমার ভাই নেই, ওরা আমার নিজের ভাইয়ের মত। ওরা আজ কোথায় যাবে ? আমাদের কাছেই থাকবে, শ্বশুরমশায় বিশেষ চিন্তিত থাকলেও সব শুনে আশ্বস্ত-মনে নবদ্বীপে ফিরে গেলেন।

উনি রোজ আপিসে চলে যেতে দুটি ভাই কি করে সময় কাটায় ভেবে পেতো

না। এ বাড়িতে গানের চর্চা খুব বেশী। শাশুড়ীঠাকরুণ বরাবর অতি সুন্দর গান গাইতেন। ন'দেওর টলু দাদার বাড়ি থেকে তাদের অতি পুরোনো একটি টেবিল হারমোনিয়াম নিয়ে এসে গানবাজনা শুরু করে দিল। এই টেবিল হারমোনিয়ামের পিছনে এক ইতিহাস আছে। ১৯১৮ সনের ভূমিকম্পে ওঁদের কিশোরগঞ্জের বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র চাপা পড়ে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, কিন্তু একমাত্র এই টেবিল হারমোনিয়াম আস্ত রয়ে গিয়েছিল। দুটি ভাই-ই খুব ভাল গান গাইত। প্রায়ই তারা দুজনে 'ডুয়েট' গাইত। এখনও যখন তাদের দুজনের একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'র গান গাওয়ার কথা মনে করি, তাদের গানের সেই সুর যেন কানে বাজে।

টলু জানি না কোন্ ফাঁকতালে আমার গুন্‌গুনিয়ে গান গাওয়া শুনে ফেলেছিল। একদিন বললে, 'মেজ বৌদি, আপনি তো ভাল গাইতে পারেন! একটু অভ্যেস করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আসুন রোজ আমরা খানিকক্ষণ বাজনা বাজিয়ে একসঙ্গে গাইব।' কিন্তু গান জানি না—প্রথম থেকেই প্রচার হয়ে যাওয়ায় লজ্জায় কিছুতেই আর মুখ খুলতে পারলাম না। গান শেখার মত করে শিখিনি, তবে মোটামুটি এমনি গেয়ে যেতে পারতাম। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে শ্রীযুক্ত সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রবিবাবুর বহু গান শিখেছিলাম।

গান শিখবার একেবারে সুযোগ যে পাইনি তা নয়। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ভর্তি করে বাবা 'সঙ্গীত সঙ্ঘে' গান ও এস্রাজ বাজাবার শিখবার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতি রবিবারে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের বিল্ডিং-এ সঙ্গীত সঙ্ঘের ক্লাস হতো। প্রথমতঃ দেখলাম শুধু ক্লাসে শিখলেই হয় না, অন্ততপক্ষে দিনে ঘন্টা দুই গান ও এস্রাজ বাজানো দুইয়েরই অভ্যেস করা দরকার। সেটা বোর্ডিং-এ থেকে সম্ভব হতো না। দ্বিতীয়তঃ আরেকটা ব্যাপারে আমার ঐ গান-বাজনার ক্লাসে যেতে ঘোরতর আপত্তি হয়েছিল। অন্যান্য মেয়েরা যারা বাড়ি থেকে গান ও বাজনা শিখতে আসতো তারা প্রায়ই যে ওস্তাদ গান শেখাতেন তাঁকে নানারকম জিনিস এটা-ওটা ও মিষ্টি এনে এনে দিত। আমি লক্ষ্য করলাম যাদের কাছ থেকে উনি নানারকম সামগ্রী পেতেন তাদের দিকে খুব বেশী নজর করতেন শেখাবার, আর অন্যদের পাঁচ মিনিটের জন্য তা-না-না করে ছেড়ে দিতেন। তারপর একদিন যখন বলে বসলেন, 'এনারা সবাই আমায় কত কিছুই দেন, কিন্তু আপনি তো আমায় কিছুই দেন না!' তাঁর কথার রকমে আমার খুব রাগ হলো এবং বিশেষ খারাপও বোধ করলাম। মনে মনে ভাবলাম, 'তবে রে! গান-বাজনা শিখবার জন্য ঘুষ দিতে হবে? শুধু স্কুলের মাইনে দিলেই চলবে না!' পরের রবিবারে আমি আর গানবাজনা শিখতে যাই না এবং ক্লাস থেকে নাম কাটাবার জন্য দরখাস্ত দিলাম। তখন 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' সেক্রেটারী ছিলেন আর্য চৌধুরী। আমায় তিনি ছাড়বার কারণ অনেক করে জিজ্ঞাসা করলেন এবং থেকে যাবার জন্য অনেকবার বললেন। কিন্তু আমি তাঁর কাছে ওস্তাদের ব্যবহার জানাতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করলাম। এখানেই আমার গানবাজনার সাধনা সাঙ্গ হয়ে গেল।

টলু, বিনু জেল থেকে ফেরার পর বাড়িতে এতজনের জায়গা কম বলে সমর

কলেজের হস্টেলে চলে গেল।

সারাদিন টলু, বিনু ও আমি মিলে হৈচৈ গল্পসল্প করে কাটাতাম। মাঝে মাঝে আমরা আবার লুকোচুরি খেলতাম। একদিন আমার যখন লুকোবার পালা এলো, আমি তাদের আচ্ছা করে জব্দ করে দিলাম। রান্নাঘরের ওপর যে একটা মাচা ছিল সেটা ভ্রাতৃদ্বয়ের জানা ছিল না। কাশী কি একটা রাখবার জন্য মইটা এনে রান্নাঘরের সামনে ঠেকিয়ে রেখেছে। আমি আস্তে করে চুপিচুপি মই বেয়ে উঠে লুকিয়ে রয়েছি। তারপর 'কু' করে আওয়াজ দিতেই দুই ভাই মিলে আমাকে খুঁজে বের করতে আরম্ভ করেছে। খুঁজে খুঁজে হয়রান। তাদের খেয়ালই হয়নি যে আমি আবার মই বেয়ে উঠে যেতে পারবো। খানিক পরে শুনতে পেলাম দুই ভাই বলাবলি করছে, 'এ তো বড় তাজ্জবের কথা ! কোথায় অদৃশ্য হল ?' একটু পরেই আমি নিজেই ধরা দিলাম। বিনু টলুকে ডাকতো ন'দা। বললো—'ন'দা রে ! একেবারে 'গাছুয়া' !' অর্থাৎ একেবার গেছো(গাছে চড়া) মেয়ে।

ওঁরা ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে ময়মনসিংহের ভাষায় কথা বলতেন। আমি সিলেটের মেয়ে হয়েও পূর্ববঙ্গের ভাষায় যাকে বলে 'বাঙ্গাল কথা' সেরকম বলতে পারতাম না। বাড়িতে মা ও বাবা নিজেদের মধ্যে সিলেটি ভাষায় কথা বললেও, আমরা বরাবর শিশুকাল অবধি কলকাতার চলিত ভাষায়ই কথা বলে অভ্যস্ত। তবে বাঙ্গালভাষা বুঝতে কোন অসুবিধা হতো না। সিলেটি ভাষা ও ময়মনসিংহের ভাষা খানিকটা তফাৎ হলেও খুব কাছাকাছির মধ্যে—বুঝতে বেশ ভালই পারা যায়।

প্রথম প্রথম টলু-বিনু ভাবতো আমি ওদের কথা বুঝি না। সেজন্য মাঝে মাঝে আমার বিষয়ে কোন কথা বললে আমি যদি তার উত্তর দিয়ে ফেলতাম তবে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়তো। আমার বিষয়ে তাদের বলাবলির কারণটা ছিল তাদের ব্যবহার দেখে কোনরকমে তাদেরকে অভদ্র মনে করি কি না কিম্বা বিনু অনেক সময় বিনা অনুমতিতে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ফল, মিষ্টি ইত্যাদি খেতো, এতে বিরক্ত হই কিনা !

একবার সেজ দেওর ক্ষীরোদের বাঙ্গাল কথা বুঝে ফেলতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। সেজ দেওর প্রায়ই শ্যামবাজারে আমাদের পাড়ায় রুগী দেখতে আসতেন। এদিকে এলেই দুপুর বারোটা নাগাদ আমাদের কাছে এসে একবার ঢুঁ মেরে যেতেন। বাড়িতে ঢুকেই জিজ্ঞেস করতেন, 'আজ কি রান্না হয়েছে ?' এই বলে একটা প্লেটে যা রান্না হয়েছে তার অল্প একটু একটু তুলে নিয়ে একটা কাঁটা দিয়ে খেয়ে খুব খুশী হয়ে চলে যেতেন। আমি চারটি ভাত খেয়ে নিতে বলতাম, কিন্তু কিছুতেই রাজী হতেন না। বলতেন, এখনো আরও কাজ বাকী আছে। ভাত খেলে পর আর কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। তাছাড়া তাঁর নিজের বাড়ির রান্না সব নষ্ট হবে। আমি একদিন বললাম, 'সেজ ঠাকুরপো, রোজ এসে খেয়ে যেও, আমি নানারকম তরকারী রেঁধে রাখবো।' তিনি ওঁদের ভাষায় বললেন, 'রুজ রুজ আইলে আমারে পিছা লইয়া মারতে আইবা' অর্থাৎ 'রোজ রোজ এলে আমায় ঝেঁটা নিয়ে মারতে আসবে।' এই বলে খুব হো হো করে হেসে উঠলেন, ভাবলেন আমি তো বোধ হয় ওঁর কথা একবর্ণও

বুঝতে পারলাম না। উল্টে আমি সব ভাল করে বুঝতে পেরে উত্তর দিলাম, 'ভয় নেই, পিছ্য হাতে কখনই নেবো না।' জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তো পিছ্য কি ?' বারান্দার এক কোণে একটা ঝাঁটা পড়েছিল, আমি আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিতে হেরে গিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

বিয়ের সময় পান, সুপুরি ইত্যাদির জন্য বাবা রূপোর বাটা, পেতলের রেকাবী কৌটো সব সরঞ্জামই দিয়েছিলেন। উনি পান, সুপুরি বা চা, সিগারেট কিছুই খেতেন না। আমি আবার সুপুরি চিবোতে খুবই ভালবাসতাম। ছেলেবেলা থেকে এত সুপুরি খেতাম যে বাড়িতে মার কাছে যেমনি বকুনি খেতাম, তেমনি স্কুলে নীচু ক্লাসে পড়বার সময় টীচারের বারণ সত্ত্বেও সুপুরি চিবোবার জন্য শাস্তি পেতাম। অনেক সময় মুখ পেছনে করে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, দু-একবার বেঞ্চির উপরও দাঁড়াতে হয়েছে। বিয়ের পর এরকম শাস্তি না পেলেও অনেক সময় 'কট' শব্দ করে দাঁতে সুপুরি ভাঙার শব্দ শুনে উনি এমন করে 'উঁ' করে একটা ভর্ৎসনার আওয়াজ করতেন যে তখনকার মত একটু লজ্জা বোধ করলেও আবার যে-কে সেই। তবে যখন দেখলাম ভাসুরও খুব সুপুরি খান তখন একটু সাহস বাড়লো।

তারপর দুটি দেওর পান খেতে ভালবাসে দেখে বাড়িতে পান, সুপুরি, চুন, খয়ের মশলা ইত্যাদি কিনে পানের ব্যবস্থা রাখলাম। তবে তারাও রোজ খেতো না। আমি মাঝে মাঝে তাদের পান সেজে দিতাম। আমার হাতের সাজা পান খেয়ে ন'দেওরের খুব লোভ বেড়ে গ্যাছে। একদিন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে চুল শুকোচ্ছি, এমন সময়ে টলু এসে বললে, 'মেজবৌদি, একটা পান খাওয়াবেন !' আমি বললাম, 'বেশ দিচ্ছি সেজে, তবে তুমি বাপু সব সরঞ্জাম আমায় এগিয়ে দাও।' এই বলে তাকে হুকুম করতে লাগলাম—'ঐ ওখানে পান আছে নিয়ে এসো, ওখান থেকে চুন, খয়ের, সুপুরি নিয়ে এসো, অমুক জায়গায় এলাচ, মৌরী আছে'—এই করে করে তাকে চার-পাঁচবার যখন উঠে যেতে হয়েছে তখন সে বললে, 'একটা পান খাবার জন্য যদি এত পরিশ্রম করতে হয়, তবে আর আমার পান খেয়ে দরকার নেই !'

তারপর আবহমানকাল তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই ব্যাপার স্মরণ করে যখনি দেখা হয়েছে, একত্র হয়েছি, আমরা হাসাহাসি করেছি।

সব দেওর ও ননদের সঙ্গেই ছিল আমার একটা অদ্ভুত সরল আন্তরিক সম্পর্ক। দুদিনের মধ্যেই তারা যেমনি আমায় আপন করে নিয়েছিল সবাই, আমিও তাদের নিজের ভাইবোনের মতই মনে করেছি। আমাদের মধ্যে দূরত্ব কখনই ছিল না। সংসারে চলাফেরা, থাকার মধ্যেও আমার নিজস্ব একটা 'প্রিন্সিপল' ছিল এবং এ বাড়িতে উনি এবং ভাইয়েরা সবাই লক্ষ্য করলেন যে তাঁদের ও আমার মধ্যে তার কোন ব্যবধান নেই। এখানে আমি 'প্রিন্সিপল' শব্দটা ব্যবহার করলাম—যাকে বলে 'নীতিপরায়ণতা'।

একদিন আমাদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় আমি আর টলু রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম সামনের মোহনবাগান রো রাস্তার ফুটপাতের গাছতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আমি চিনতে পারলাম। আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে

পড়ছিলাম, সে তখন থার্ড ইয়ারে পড়তো।

গাছের তলায় ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি টলুকে বললাম, 'এই মেয়েটিকে আমি তো চিনি! ও এখানে দাঁড়িয়ে কি করছে?' টলু একটু মুচকি হেসে তার এক বন্ধুর নাম করে বললো, 'ইনি তো অমুকের বান্ধবী।' টলুর ভাবে বুঝলাম সে সব ব্যাপারটা জানে। মোহনলাল রো-এর একটু কোণার দিকে একটা বাড়িতে টলুর সমবয়সী এই ভদ্রলোক থাকতেন। অল্পসময়ের মধ্যেই দেখতে পেলাম ঐ ভদ্রসন্তানটি হেঁটে হেঁটে গাছের তলায় এসে মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে যাবার জন্য যে একটা গলি ছিল তাতে ঢুকে গেলেন।

এরপর কয়েকদিনই এই দৃশ্য দেখার পর একদিন আমি টলুকে বললাম, 'তোমার অমুক বন্ধু এই মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেলেন না কেন?' আমি কলেজে থাকাকালীনই শুনেছিলাম যে মেয়েটি কাকে যেন বিয়ে করতে ইচ্ছুক। এখন বুঝলাম যে সে এই ভদ্রলোক। টলু একদিন ভদ্রলোককে কথার ছলে বলে দিয়েছে যে মেজবৌদি বলছিলেন, আপনি আপনার এই বান্ধবীটিকে বিয়ে করে ফেলেন না কেন? তার উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'মেজবৌদিরও যেমন কথা!'

এই কথা শুনে অবধি আমার গা রাগে জ্বলতে লাগলো তাঁর ওপর। তবে রে শয়তান! একটা মেয়ের জীবন নিয়ে হেসে খেলে বেড়িয়ে ছলচাতুরীর মতলব! কিছুদিন ধরে দেখলাম টলু, বিনুদের ঘরে কয়েকটা বড় বড় আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নতুন ফ্ল্যাট—তাতে আরশোলা হবার কথা নয়। বুঝলাম পুরোনো অন্য বাড়ির জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে আরশোলা এসে বংশ বৃদ্ধি করেছে। একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ কেউ নেই দেখে আমি দেওরদের ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা বন্ধ করতেই অন্ধকারে আরশোলা বেরিয়ে ফুড়ুৎ-ফাড়ুৎ আরম্ভ করছে দেখে আমি ঘরের আলো জ্বেলে একটা খ্যাংরা ঝাঁটা নিয়ে ঝপাৎ ঝপাৎ করে পিটিয়ে আরশোলা মারতে লাগলাম।

এর মধ্যে টলু কোথা থেকে বাড়ি ফিরে ঘরের সামনে এসে বাইরে থেকে বললে, 'মেজবৌদি, এখানে দরজা বন্ধ করে কি করছেন?' উত্তর দিলাম, 'তোমার অমুক বন্ধুকে পিটছি!' শুনে টলু বললে, 'আপনি তো বড় সাংঘাতিক মানুষ! কি ভয়ঙ্কর কথা বললেন!' আমি কখনও যা অন্যায় হচ্ছে বলে মনে করতাম তা কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না।

এর কিছুদিন পর শুনলাম ভদ্রসন্তানটির বিয়ে। একটি অতিশয় সুন্দরী কমনীয় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো। বিয়ের পর দুজনে প্রায়ই আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতেন। শ্রীমান বলে বেড়াতে লাগলেন, তিনি মান্যতাবশতঃ পিতার আজ্ঞা পালন করেছেন। সুন্দর টুকটুকে একটি শিশুপুত্রও জন্মালো। হায় রে পোড়াকপাল ঐ শিশুপুত্রের ও অভাগা মায়ের! কিছুকাল পরে শুনলাম এদের তিনি ত্যাগ করে বাপের কাছে ফেলে রেখে সেই পূর্ব বান্ধবীকে বিয়ে করে দক্ষিণ কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। এরপরে জানাজানি হলো, তিনি দু'নৌকাতেই পা দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

তাতে মনে হয়, আমি খ্যাংরা ঝাঁটা দিয়ে পেটানোর উল্লেখ করাটা এমন কিছু অন্যায় কাজ করিনি ! তবে ব্যাপার সব ক্রমে ক্রমে ঘটে থাকলেও তাঁর স্বভাবটা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলাম এবং সন্দেহ আগেই হয়েছিল যে এঁর গতি সুবিধের দিকে যাচ্ছে না।

॥ ৬ ॥
শিলং থেকে বিদায়

টলু, বিনু জেল থেকে ফিরে এসেছে খবর জেনে বাবা শ্বশুরমশায়কে চিঠি দিলেন যে তিনি যদি আমাকে কিছুদিনের জন্য শিলং যাবার অনুমতি দেন, তবে দাদাকে পাঠিয়ে দেবেন আমায় শিলং নিয়ে যাবার জন্য।

কখনও ভরা গরমে আগে কলকাতায় থাকি নি বলে বিয়ের পরেই বাবা শ্বশুরমশায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁরা শিলং ফিরবার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিনা। তখন শ্বশুরমশায় বলেছিলেন, 'এই তো সবে বিয়ে হলো : এখন কয়দিন এখানেই থাক্, আর এখন থেকে তো আস্তে করে গরম সইতেই হবে। টলু, বিনু জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এলেই তখন যাবে।'

শ্বশুরমশায় বাবার চিঠি পাওয়ামাত্র কাউকে পাঠিয়ে দেবার জন্য লিখে দিলেন। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবার জন্য দাদাকে পাঠিয়ে দিলেন। বাবার আদেশানুযায়ী দিনক্ষণ পালন করে রওয়ানা হলাম। আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে দেবার ওঁর বিশেষ ইচ্ছা বুঝতে পারলাম। কয়েকবার আপিসে টাকার জন্য হেঁটে কিছুই আদায় করতে পারেন নি। তবে ওঁর সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে কোন কথা হয় নি। আমিও কোন পয়সাকড়ি চাই নি। স্টেশনে সবাই গিয়েছে, আসাম মেল তখন বিকেল তিনটে নাগাদ ছাড়ে। গাড়ি প্রায় ছাড়-ছাড়, গার্ড হুইসল্ বাজিয়ে সবুজ নিশান নাড়তে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ বিনু ট্রেনের জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে আমার হাতে দুটি টাকা গুঁজে দিয়ে খুব লজ্জা ও কাঁচুমাচু মুখে বললো—'মেজদা আপনাকে দিতে বললেন।' আমি বললাম, 'আমার তো ওখানে টাকার কোন দরকার হবে না, তোমরাই রেখে দাও। তোমাদের কাজে আসবে।' বিনু শুনতেই চাইলো না ; এরই মধ্যে ট্রেনও রওয়ানা দিল। ট্রেনে বসে সারাক্ষণ কেবল মনে হতে লাগলো যে নিজের প্রাপ্য কয়টা টাকা পাওয়ারও যে দুর্গতি ! এই দুটি টাকায় ওঁদের অন্ততঃ তিনদিন থেকে চারদিন বাজার খরচ চলে যেতো।

শিলং পৌঁছানোর পর দিদিমা, ছোটমাসী, মামীমা, সব মাসতুতো, মামাতো ভাইবোনেরা একে একে দেখা করতে এলেন। একটা হৈচৈ-হট্টগোলের মধ্যে দিনগুলি কাটতে লাগলো। যদিও মাত্র সাড়ে তিনমাসের পরিচয় এঁদের সকলের সঙ্গে, কিন্তু যখনি একটু নিরিবিলিতে থাকতাম, থেকে থেকে মনটা বেশ অস্থির হয়ে উঠতো। এনারা তিনটি ভাই মিলে কি ভাবে আছেন, কি খাওয়া-দাওয়া করছেন, কেমন করে

সব চলছে ভেবে আকুল হয়ে উঠতাম। বাপেরবাড়ি গিয়ে স্ফূর্তির বদলে একটা অসোয়াস্তি বোধ করতাম প্রায়ই। কিন্তু আমার এই দুশ্চিন্তা যাতে প্রকাশ্যে না বোঝা যায় তার জন্য আবার সর্বদা সচেতন অবস্থায় থাকতে হতো।

কোন রকমে মাসখানেক কাটার পর পূজো এসে গেল। কলেজ ছুটি হতে পুঁটুও বাড়ি এসে গেল। বাবা পূজোয় ওঁকে শিলং যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন এবং যাতায়াতের খরচার টাকাও পাঠিয়ে দিলেন। উনি যাবেন কি যাবেন না কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ একদিন দুপুরের গাড়িতে গিয়ে হাজির।

দাদা(বীরেন) বাড়ির বাইরে কোথায় যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখেন উনি কুলীর মাথায় মাল চাপিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকবার চেষ্টা করছেন। দাদা তো চেঁচিয়ে উঠলেন ওঁকে দেখে, আরে ! আরে ! এদিকে আসুন !

বাড়িতে একটা চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

দুপুরে খাবার আগে আমি স্নান করবার জন্য স্নানের ঘরে ঢুকেছি, পুঁটু কেবলই এসে দরজায় টোকা দিচ্ছে আর হাসছে ও বলছে, ওরে টুনু, শিগ্‌গির বেরিয়ে আয়। হিঃ হিঃ—নীরদদা—হিঃ হিঃ—নীরদদা !

দেখলাম বাবা খুব উৎসাহে ওঁর সঙ্গে নানারকম কথাবার্তায় ব্যস্ত। মা উত্তেজিত অবস্থায় পুঁটুকে নিয়ে জামাই-এর খাওয়াদাওয়ার কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করবার জন্য হেঁসেলে ঢুকেছেন। বাড়িতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। খবর পেয়ে মামাবাড়ির সবাই একে একে আসতে আরম্ভ করলেন। সর্বাগ্রে দিদিমা তাঁর নাতজামাইকে দেখতে এসে নানারকম হাসিঠাট্টা আরম্ভ করলেন। উনিও দমবার পাত্র নন। উনি বেঁটে ছোটখাট মানুষ। নাতজামাইএর কাছে হেরে গিয়ে দিদিমা 'জামাই তো একেবারে বামন' এই উক্তি করে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন।

সন্ধ্যের একটু আগে গিরিশদাদি (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কাজ থেকে ফিরে এসে উনি এসেছেন শুনে দেখা করবার জন্য সবাই যেখানে বসে গল্পসল্প করছিলেন সেখানে এসে দাঁড়ালো। উনি খবর জানান নি টেলিগ্রাম করে, তার জন্য সকলে গঞ্জনা দিচ্ছিলেন শুনে গিরিশদাদি ওঁকে বললো, 'ভালা করছইন, ভালা করছইন ! ফয়সাটা ত বাঁচাইয়া দিছইন।' অর্থাৎ ভাল করেছেন, পয়সাটা তো বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

গিরিশদাদির ছিল আকণ্ঠ ঋণ। উনি শিলং যাওয়ার কয়েকদিন পর একদিন গিরিশদাদি ঘোড়দৌড়ে এক টাকার একটা টিকিট কিনে জিতে একশো টাকা পেলো। তখনকার দিনে সব রূপোর এক টাকা ছিল। হঠাৎ দেখি গিরিশদাদি তার ধুতির খুঁটে পোঁটলা বেঁধে টাকা নিয়ে আসছে, আনন্দে তার মাথার সাদা চুল সব খাড়া হয়ে গিয়েছে আর তার পিছন পিছন সব খাসিয়া পাওনাদারের দল সারি দিয়ে চলেছে। আর গিরিশদাদি আধভাঙা খাসিয়া ভাষায় তাদেরকে কেবলই বোঝাচ্ছে, 'দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো, একটু অপেক্ষা কর।' গিরিশদাদির অবস্থা দেখে হাসবো কি কাঁদবো বোঝা মুস্কিল হয়েছিল।

শিলং পাহাড় দেখে ওঁর আনন্দ কি ! রোজ দুবেলা হেঁটে হেঁটে চারিদিক ঘুরে

বেড়িয়ে দেখতে লাগলেন। ভোরে অন্ধকার থাকতেই আস্তে করে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে যেতেন বাড়ির কেউ ওঠার আগেই। তারপর ঘন্টাচারেক প্রায় কত দূর দূর ঘুরে বাড়ি ফিরতেন। বাড়ির সবাই ঐভাবে অন্ধকারে, কিছু না খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যেতে কত বারণ করতেন কিন্তু কে কার কথা শোনে! খুব লম্বা লম্বা পাড়ি দিয়ে এসে বাবার সঙ্গে জায়গাগুলোর বিষয় আলোচনা করতে বসে যেতেন।

একমাত্র বাবা শুধু শিলং শহরই নয়, আশেপাশের সব জায়গা পাহাড়, নদী, গর্জ, জঙ্গল সব খুব ভাল করে জানতেন। সাধারণ শিলংবাসীরা এ সমস্ত জায়গা, পাহাড় এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। তারা দু-একটা জলপ্রপাত দেখেই সন্তুষ্ট থাকতো। উনি বেড়িয়ে ফিরে এসে গল্প করতেন কোন জলপ্রপাতের একেবারে নীচ পর্যন্ত গিয়ে কি করে উঠলেন কিম্বা কোন্ পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে আবার বেয়ে বেয়ে হামা দিয়ে উঠলেন। ওঁর এইভাবে বেড়ানোর জোর মাঝে মাঝে কিছু ছোট বোনের উপর দিয়ে ও কিছু মামাতো ভাই মানুকে নিয়েও চলতো। দু-একদিন যাওয়ার পর আর তারা যেতে চাইতো না। আমি একটু অসুস্থ ছিলাম বলে আমার উপর আর ঐভাবে বেড়ানোর জন্যে জোর করতে পারেন নি। এইভাবে শরীর না বুঝে ঝোঁকের মাথায় অতিরিক্ত ওঠা-নামা, দৌড়ঝাঁপ করার ফলে মাস-দুয়ের মধ্যে কি হয়েছিল পরে তা লিখছি।

আপিসের ছুটি ফুরিয়ে যেতে কলকাতা ফিরে যেতে হলো। ঠিক হলো আমি আরও মাস দুই পরে মা ও বাবার সঙ্গে কলকাতা যাবো। পুঁটুও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে কলকাতা রওয়ানা হয়ে পড়লো। বাড়ি একেবারে খালি হয়ে গেল। মা ও আমি রোজ একটু করে জিনিসপত্র গোছাতে আরম্ভ করে দিলাম। শীতের জন্য প্রায় চার-পাঁচ মাস বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে, সুতরাং সেই অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করতে হবে। দিন আট দশ পরে একদিন মাঝরাত্তিরে ভীষণ জোরে ভূমিকম্প বাড়ি সাংঘাতিক ভাবে কাঁপিয়ে তুললো। শিলং-এ সব সময়ে যখন তখন হঠাৎ দুর-দুর করে ভূমিকম্পে বাড়ি বরাবর কেঁপে উঠত। কিন্তু এতো জোরে এবং বহুক্ষণ ধরে এরকম ভূমিকম্পের ধাক্কা আগে আর দেখিনি। বাবা তাঁর শোবার ঘর থেকে আমায় ডেকে জোরে জোরে বললেন, 'তোর মাকে সঙ্গে করে শীগ্গির বাইরে বেরিয়ে আয়, আমি ততক্ষণ দোর খুলছি। অন্ধকার রাতে বাইরে বাগানে মা ও বাবা দুদিকে দুজন আমায় জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। গিরিশদাদি ও রাখাল গরু তিনটেকে ঠেলে ঘর থেকে বার করে নিয়ে চেঁচামেচি সুরু করেছে, এর মধ্যে আস্তে আস্তে ভূমিকম্প থেমে এলো। ধীরে ধীরে সবাই আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। এতক্ষণ আমরা বাইরে টর্চ হাতে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালার পর মায়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মা হাতে করে তাঁর চাবির গোছা, একটা দেশলাই-এর বাক্স ও একটি মোমবাতি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন।

আমাদের কলকাতা রওয়ানা হবার দিন ঘনিয়ে এলো। বাবা অর্ডার দিয়ে খুব ভাল অনেক কমলালেবু ও ডিঙ্গামানিক কলা আনালেন আমার শ্বশুরবাড়ি ও দিদির

বাড়ির সকলকে দেবার জন্য। দু বাড়ির জন্য দুটো ঝুড়িতে আলাদা করে সব প্যাক করালেন।

বাবার আদেশানুযায়ী আবার দিনক্ষণ দেখে আমরা শিলং ছেড়ে কলকাতা রওয়ানা হলাম। কিন্তু হায়, কে জানতো যে জায়গাকে নিজের ভিটেমাটি মনে করে অত ভালবেসেছিলাম, মাস-ছয় না দেখলে হাঁপিয়ে পড়তাম, যেখানকার গাছপালা, নদী, পাথর প্রত্যেকটি আমার প্রাণের সঙ্গী ছিল, সেই শিলংকে অলক্ষ্যে চিরকালের মত পিছনে ফেলে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখন যখন সেই জন্মস্থানের কথা মনে হয়, আবার ফিরে যাবার জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে, তখন ভাবি হয়ত ঐভাবে অলক্ষ্যে দেশটাকে ছেড়ে আসা ভালই হয়েছিল। তখন যদি জানতাম যে আমার যাওয়া হয়ে উঠবে না, তাহলে মনের ক্ষোভে কলকাতা বাস করা হয়ত খুবই কষ্টকর হতো।

কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছে দেখি উনি ছোট দেওর বিনুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং জামাইদাও এসেছেন মা, বাবাকে ভবানীপুরে তাঁদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। বাবারা সবাই জামাইদার সঙ্গে চলে গেলেন। উনি, আমি ও বিনু শ্যামবাজারের দিকে যেতে যেতে মাঝপথে উনি বললেন, 'ঠিক করেছি বিনু মালপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাবে, তোমায় পথে দাদার বাড়ি নামিয়ে নেবো : ওখানে চান, খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে বিকেলে বাড়ি যাবো। কাশী দেশে গিয়েছে, আর কোন চাকর নেই এখন। প্রথম বাড়িতে উঠে গিয়েই খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে।'

দাদার বাড়ির সামনে গিয়ে আমি ও উনি গাড়ি থামিয়ে নামলাম। আমাদের যাওয়ার শব্দ পেয়ে বড়জা দরজা খুলে এগিয়ে এলেন। দেখলেন বিনু আমার মালপত্র সব নিয়ে শ্যামবাজারের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো। জিনিসপত্রের সঙ্গে কমলালেবু ও কলার ঝুড়িটি খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেন। তক্ষুনি তক্ষুনি রাস্তার মাঝখানে কি করে ভাগ বাঁটোয়ারা করবো ! কিন্তু তাঁকে ফলের কোন অংশ দেওয়া হলো না ভেবে মনে মনে খুব চটে গেলেন।

দুদিনের রাস্তা ঠেঙিয়ে এসে খুবই শ্রান্ত-ক্লান্ত। সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরে একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়তে হলো। পরদিন সকালে উঠে সকলের জলখাবারের পালা, বিনু বাজার করে আনার পর তাড়াতাড়ি রান্না সারতে ব্যস্ত। উনি খেয়েদেয়ে 'প্রবাসী' আপিসে বেরিয়ে যাবার পর ঝুড়ি খুলে কমলালেবু ও কলা বের করে একভাগ বিনুকে দিয়ে ভাসুরের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। সেজ দেওর ক্ষীরোদের অংশ আলাদা করে সরিয়ে রেখে আমাদের জন্য বাকীটা টেবিলে তুলে রাখলাম এবং টলু, বিনুকে নিয়ে যেতে বললাম।

উনি বিকেলে আপিস-ফেরত বাড়ি আসার পর প্লেটে করে কলা, কমলালেবু খেতে দিয়েছি দেখে বললেন, সকালে আপিসে যাবার মুখে দাদার বাড়ি গিয়েছিলাম, বৌদি তোমার কথা বললেন, 'কলা, কমলা খাইয়া মুখটা বাঘটার মত হইছে। নাকের উপর দিয়া কলা, কমলা দেখাইয়া লইয়া গেল, একটা দিল না।' (অর্থাৎ কলা, কমলালেবু খেয়ে চেহারাটা একেবারে বাঘের মত গোল হয়েছে। কলা, কমলালেবু চোখে দেখিয়ে

নিয়ে গেল কিন্তু একটাও দিল না।)

আমি শুনেই বললাম, আগে ত ঝুড়ি খুলবার সময় পাইনি, তুমি আপিসে চলে যাবার পরই সব ফল বের করে খানিকটা কলা, কমলালেবু ওনাদের বিনুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই শুনে উনিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জোরে জোরে খুব হাঃ হাঃ করে হাসলেন।

কিছুদিন চাকর না থাকাতে সব কাজকর্মের চাপ পড়লো। বিনু বাজার সওদা করে দিত। সে লক্ষ্য করেছে আমি কয়দিন ধরে মাছ খাই না। একদিন সে জিজ্ঞেসা করার পর আমি বললাম, 'আমি যদি মাছ কুটি তবে পরে আর সেটা খেতে পারি না।' সেই শোনা অবধি মাছ কিনে এনেই সে নিজে মাছ কুটতে বসে যেতো। এর কিছুদিন পরই আমাদের কাশীরাম দেশ থেকে এসে গেলো, এতে আবার সমস্ত বাড়ির সকলের কাজ ভালই চলতে লাগলো।

॥ ৭ ॥
প্রথম সন্তান ও স্বামীর পিতৃবিয়োগ

কিছুদিন আনন্দে শিলং-এ ছুটি কাটিয়ে আসার পর একদিন হঠাৎ সাংঘাতিক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। সকালে খেয়েদেয়ে 'প্রবাসী' আপিসে কাজে গিয়েছেন, বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি, এমন সময়ে দরজায় বেল শুনে খুলে দেখি সেজঠাকুরপো ও বাবা ওঁকে ধরে ধরে এনে খুব সাবধান করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। দেখলাম উনি বিশেষ অসুস্থ। কি হলো জিজ্ঞাসা করতে সেজঠাকুরপো বললেন, 'হার্ট অ্যাটাক্।' আপিস ফেরৎ দাদার বাড়ি গিয়েছিলেন, সেখানে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়তে তাঁরা সেজঠাকুরপো ও ভবানীপুরে আমার বাবাকে খবর দেন। আমায় বোঝালেন ওঁরা যে ভয়ের কোন কারণ নেই, কিছুদিন বেশ বিশ্রামে থাকলে ভাল হয়ে যাবেন। তবে একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। শিলং-এ গিয়ে অতিরিক্ত পাহাড় ওঠানামার ফলে এরকম হয়েছে। ওষুধপত্র, সেবা সব নিয়মমত চলতে লাগলো এবং আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন অল্পদিনের মধ্যেই। তবে আরও কয়েক মাস লাগলো মোটামুটি সুস্থ হতে।

সপ্তাহকয়েক পরে আমার বড় ছেলে জন্মাবার অল্প কয়দিন আগে আমার দেখাশোনা করবার জন্য মা ভবানীপুর থেকে এসে আমাদের কাছে রইলেন। মা-বাবার ইচ্ছে ছিল আমায় তাঁদের কাছে নিয়ে যাবার। কিন্তু উনি বললেন, 'না! আমার সন্তান আমার বাড়িতেই জন্মাবে, তাছাড়া ক্ষীরোদ তার মিউনিক-ফেরৎ ডাক্তার বন্ধু বিখ্যাত গিনিকলজিস্টকে বলে সব ঠিক করে রেখেছে এবং সে নিজেও শিশু-চিকিৎসক, সুতরাং কোন অসুবিধে হবে না।'

১৯৩৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী একেবারে ডাক্তারের নির্ধারিত দিনে বড় ছেলে জন্মালো। উনি তার নাম রাখলেন 'ধ্রুবনারায়ণ'। এঁদের পূর্বপুরুষদের সবার নাম

'নারায়ণ' দিয়ে শ্বশুরমশায় পর্যন্ত। নামের পরে এনাদেরই হয়ে গেল 'চন্দ্র' দিয়ে। কিন্তু পূর্ব প্রথানুযায়ী উনি আবার 'নারায়ণ' রাখা রুজু করতে চাইলেন।

বড় ছেলে জন্মাবার পরেই সেজঠাকুরপো মার কাছে তাকে পরাবার জন্য কাপড় জামা চাইতে গিয়ে দেখেন মা ট্রাঙ্কভর্তি ছোট শিশুর যা কিছু যাবতীয় জামা, কাঁথা মোজা, টুপি দরকার সমস্ত গুছিয়ে রেখেছেন। এরকম সুন্দর পরিপাটি করে তৈরী করা জামা-কাপড় সব দেখে সেজঠাকুরপো ও তাঁর বন্ধু ডাক্তার মুখার্জি অত্যন্ত খুশী হয়ে গেলেন এবং খুবই প্রশংসা করতে লাগলেন।

দশদিন পর ডাক্তার মুখার্জি বললেন, 'এখন একটু করে করে বিছানা থেকে উঠে অল্পস্বল্প হাঁটাচলা আরম্ভ করুন।' কিন্তু সেইদিন থেকেই হঠাৎ জ্বর উঠে পড়লো এবং ক্রমশঃ জ্বর বেড়েই চললো।

কিছুদিন ধরে নানারকম সব পরীক্ষা করার পর ডাক্তাররা ধরতে পারলেন কিসের জন্য জ্বর হচ্ছে কিন্তু এই জ্বরের তাপ নামাও একটা নির্দিষ্ট সময়সাপেক্ষ। জ্বরের তাপ এক এক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে এত উঁচুতে উঠে পড়তো যে খুব বেশী কষ্টবোধ করতাম। জ্বরের প্রকোপে খুব দুর্বল হয়ে পড়ছি দেখে ওষুধ দিয়ে জোর করে দিনে কয়েক ঘন্টার জন্য যাতে জ্বর ছেড়ে যায় সেরকম ব্যবস্থা করলেন ডাক্তার। ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে ভীষণ রকমের ঘাম হয়ে জ্বর ছেড়ে যেতো। কিন্তু শরীর থেকে এত জল বের হতো যে বিছানা একেবারে সপ্‌সপে হয়ে ভিজে যেতো। এই দেখে ওষুধ খাবার আগে বড় বড় মোটা তোয়ালে বিছানার ওপর বিছিয়ে আমায় শুইয়ে দেওয়া হতো। জ্বর ছেড়ে গিয়ে ঘন্টা তিনেক পর আবার উঠে পড়তো। মা-র একলার পক্ষে আমার সেবা ও ছোট শিশুকে দেখা ভীষণ মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। তাই দেখে আমাকে দেখাশোনা করবার জন্য একজন নার্সের ব্যবস্থা করলেন।

জ্বর আর ছাড়েই না দেখে মা, বাবারা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ডাক্তার মুখার্জি ও সেজঠাকুরপো তাঁদের সমানে আশ্বাস দিতে লাগলেন যে রোগ ধরা গেছে কিন্তু জ্বর ছাড়তে সময় নেবে। বাবার মন আর বোঝে না। তিনি ঠিক করলেন যে স্যর নীলরতন সরকার ও ডাক্তার কেদার দাস এই দুজনকে একবার ডাকা যাক। এই ভেবে যেদিন ডাক্তার নীলরতন সরকারকে ডাকতে যাবেন বলে ঠিক করেছেন সেদিন সকালেই জ্বর ছেড়ে গেল। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলাম।

সেজঠাকুরপো ভিয়েনা-ফেরৎ বিখ্যাত শিশু-চিকিৎসক, সেজন্য ছোট শিশুকে কোন্ সময় কি করতে হবে, কিভাবে কি খাওয়ানো হবে সব নিয়মানুযায়ী ভাবে চলতে লাগলাম তাঁর কথামত। ঘড়ি ধরে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো ইত্যাদি সব চালিয়ে যাওয়াতে শিশুকে একলা হাতে বড় করতে কোন অসুবিধা বা কষ্ট হয়নি।

বড় ছেলে জন্মাবার কিছুদিন আগে ছোট দেওর বিনু একটা কাজ পেলো। সেটা হলো বড় জায়ের এক ভাই কিরণ একটা বাল্‌ব কোম্পানী খুললেন এবং বিনুকে বাল্‌ব বিক্রীর ক্যানভাসিং করবার জন্য জায়গায় জায়গায় পাঠালেন। বাড়িতে ছোট শিশুপুত্র নিয়ে আমরা দুজন ও ন'দেওর টলু—মন্মথ চৌধুরী রইলাম। টলু যাদবপুর থেকে

ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বসে আছে। চাকরিবাকরি খুঁজছে। তখন বেকার-সমস্যা চলেছে সাংঘাতিক।

ইতিমধ্যে ভাসুররা উত্তর কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণ কলকাতায় চৌরঙ্গী রোডের একটা বাড়িতে। ওঁরা দূরে চলে যাওয়াতে একটু একাই পড়ে গেলাম আমরা। তবে চার পাঁচ মাসের মধ্যেই আমাদের ঠিক নীচে দোতলার ফ্ল্যাটে হাস্যকৌতুকের গান গাইয়ে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, তাঁর স্ত্রী শান্তিলতা ও মেয়ে গীতাকে নিয়ে এলেন। আর বাড়িটার ভেতরের ফ্ল্যাটে এলেন সস্ত্রীক বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও 'প্রবাসী' আপিসে কাজ করতেন। দু বাড়িতেই মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করতাম। ব্রজেনবাবুর স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। আমার চার-পাঁচ মাসের ছেলেকে বড্ড ভালবাসতেন। তাকে 'বুড়ো বুড়ো' করে ডাকতেন। রোজই ব্রজেনবাবু আপিসে চলে গেলে পর তাঁর ফ্ল্যাট থেকে চেঁচিয়ে আমায় ডাকতেন, 'ও বুড়োর মা! একবার ছেলেটাকে নিয়ে আমার কাছে আয় না!' ছেলে ঘুমিয়ে উঠলে বেলা বারোটার পর তাকে দুধ খাইয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যেতাম। তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে কত আদর, কথা, লাফঝাঁপ করতেন আর আমি ব্রজেনবাবুর বই-এর আলমারী থেকে বই বের করে নিয়ে পড়তাম।

ব্রজেনবাবুর তিনটে ভল্যুম 'ন্যাচারেল হিস্‌ট্রি'র বই ছিল। আমার ঐগুলো পড়তে খুব ভাল লাগতো। একদিন ব্রজেনবাবুর স্ত্রী আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁগা বুড়োর মা, তুমি বসে বসে ওসব কি পড়?' আমি তাঁকে বললাম, 'এই বই থেকে কত কিছু জানা যায়।' একদিন তাঁকে 'নটিলাস্' শামুকের ছবি দেখিয়ে বললাম, 'এই যে বড় বড় শামুকগুলোর ছবি দেখছেন, এগুলো সব সমুদ্রের নীচে থাকে।' উনি তখন বলে উঠলেন, 'ওসব কি বুঝবো ভাই—আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।'

তিনি ব্রজেনবাবুকে কি বলেছিলেন জানি না। মাসখানেক বাদে হঠাৎ একদিন ব্রজেনবাবু ওঁকে বললেন, 'দেখুন নীরদবাবু, আমি শুনলাম আমার ঐ তিন ভল্যুম 'ন্যাচারেল হিস্‌ট্রি'র বই বৌমা খুব মন দিয়ে পড়েন, আমি আর ওগুলো দিয়ে কি করবো? আমি ওঁকে ঐ বইগুলি দিলাম। এবার যখন আমাদের বাড়ি আসবেন, বই তিনখানা যেন আলমারী থেকে নিয়ে যান।'

উনি এসে আমায় বলতে আমার আর আনন্দ ধরে না। কয়দিন পর একদিন গিয়ে বইগুলি নিয়ে এলাম।

আমার বন্ধু রাণু মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে সারা দুপুর কাটিয়ে যেতো। একদিন এসে ব্রজেনবাবুর দেওয়া বইগুলি দেখে খুশী কি। সে যখনি আসতো অনেকক্ষণ ধরে বইগুলোর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকতো। রাণুর শ্বশুর ছিলেন শ্রীযুক্ত অন্নদা সেন। তিনি তাঁর সব ছেলেদের নিয়ে নন্দকুমার চৌধুরী লেনে থাকতেন। পরে নিজে বাড়ি করে ছেলেদের সবাইকে নিয়ে বালিগঞ্জ প্লেসে চলে যান। শ্রীযুক্ত অমিয় সেন ছিলেন তাঁর বড় পুত্র এবং আরো কয়েকজনের পর আমার বন্ধু রাণুর স্বামী অরুণ সেন ছিলেন তাঁর সবচেয়ে ছোট পুত্র। অরুণ সেন মশায় সিটি কলেজে আমার

শিক্ষক ছিলেন এবং পরের জীবনে তিনি সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। বালিগঞ্জে উঠে চলে যাবার পর আর আগের মত ঘন ঘন আসতে পারে নি রাণু।

তার কোন সন্তান হয়নি। সে-ও ব্রজেনবাবুর স্ত্রীর মত আমার ছেলেকে কোলে-পিঠে নিতে খুব ভালবাসতো। ছেলে যখন মাস ছয়েকের, একদিন রাণু এসে বললে, 'চল টুলু, আমরা দুজনে হস্টেলে বেড়াতে যাই।' আমাদের বিডন স্ট্রীটের হস্টেল খুব বেশী দূরে ছিল না। দুজনে একটা রিকশা করে ছেলেকে নিয়ে হস্টেলে গেলাম। ওখানে দরজা দিয়ে ঢুকে রাণু বললো, 'তুই বাইরের ঘরে লুকিয়ে থাক, আমি তোর ছেলেকে কোলে নিয়ে প্রথম ঢুকি।'

রাণু ঢুকতেই তো সব মেয়েরা চারদিক থেকে এসে ওকে ঘিরে ধরেছে, 'ওমা কি সুন্দর, কি মিষ্টি ছেলে! কার ছেলে?' ইত্যাদি বলে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে। রাণু বেশ সহজভাবে বলে দিল, 'কেন, এ তো আমার ছেলে।' সকলে তখন সাংঘাতিক চেঁচামেচি শুরু করে দিল, 'সে কি, এদ্দিন ধরে আমরা কোন খবর পাইনি!' এর অল্প পরে আমি গিয়ে ঢুকতেই সবাই একজোট হয়ে বলতে লাগলো, 'এখন বুঝেছি কার ছেলে!' এরকম হৈ-হল্লা চলছে, এর মধ্যে বিধু ঝি আমায় দেখে হাসতে হাসতে খুব খুশী হয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে হস্টেলের মেয়েদের উদ্দেশ করে তার হাত পা নেড়ে বলতে লাগলো, 'দেখ দেখি, টুলুদিকে! বে-থা করে ছেলে কোলে নিয়ে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, আর থাকো তোমরা ঐ বই হাতে নিয়ে সব শুঁটকি হয়ে।'

আমাদের নীচে দোতলার ফ্ল্যাটে নলিনীবাবুর স্ত্রী শান্তিদিও আমার কাছে খুব আসতেন। তাঁর মেয়ে গীতার তখন বয়স নয়-দশ বছর। সে-ও আমার ছেলেকে 'ভাই ভাই' করে এসে খুব খেলা করতো। শান্তিদিও প্রায়ই ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন বা ঘন্টাখানেকের জন্য তাঁদের বাড়ি নিয়ে যেতেন। শান্তিদি বাড়িতেই একটা গানের স্কুল খুলেছিলেন। এখনও সেই গানের ক্লাসের কথা মনে হলে একটা গানের সুর খুব কানে বাজতে থাকে—'শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন, আমলকীর এই ডালে ডালে।'

'যতীন্দ্র ম্যানসন' বাড়িটা প্রকাণ্ড ছিল। তাতে নানারকম সাইজের ফ্ল্যাট ছিল। আমাদের দিকের ফ্ল্যাটগুলি বড় ছিল চারখানা বড় বড় ঘর নিয়ে। অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলির কোনটার তিনখানা, কোনটার দুখানা করে ঘর ছিল। সবসুদ্ধ কুড়িটা ফ্ল্যাট ছিল। হঠাৎ শুনলাম বাড়িওয়ালা খুব ঘটা করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন। বিয়ের দিনকয়েক পরে একদিন বাড়িওয়ালার সরকার চাকরের হাতে একটি পেতলের হাঁড়ি—তাতে ২৫টা করে বেশ বড় বড় দরবেশ এনে দিয়ে গেলেন, পরে প্রত্যেক ফ্ল্যাটে দিয়ে আমাদের বাড়িতে আসার পর আমি তাড়াতাড়ি হাঁড়ি ফেরৎ দিতে গেলাম। তিনি বললেন, 'না, মা, হাঁড়ি সমেত।'

এই সময়ে বিনু সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে কোথায় যাচ্ছিল, সে দেখি আবার বাড়ি ফিরে এসে হাজির। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে?'

সে বললে, 'ঐ এক হাঁড়ি লাড্ডু আসছে দেখে আমি কি আর লোভ সামলাতে

পারি ?'

শ্বশুরমশায় কয়েকমাস পর পর নবদ্বীপ থেকে এসে কলকাতায় দু-তিন সপ্তাহ কাটিয়ে যেতেন। একবার শ্বশুরমশায় নবদ্বীপ থেকে এসে আমাদের কাছেই আছেন, সেই সময়ে একদিন ওঁর এক উকিল বন্ধু যতীনবাবু তাঁর বাড়িতে ওঁকে দুপুরে গিয়ে খাবার জন্য নেমন্তন্ন করলেন। যতীনবাবু পেনিটিতে গঙ্গার ওপরে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকতেন। সেদিন দুপুরে খাওয়াতে গঙ্গা থেকে যখন তোলা তপসে মাছ ভাজা খেয়ে ওঁর খুব ভালো লাগলো। খেয়েদেয়ে ফিরে আসবার সময় যতীনবাবুকে বলে এলেন যে তিনদিন পর বিনুকে পাঠিয়ে দেবেন, যতীনবাবু যেন জেলে দিয়ে মাছ তুলিয়ে দেন। বাড়ি এসে মাছ-এর গল্প করলেন। বুধবার দিন কিসের ছুটি ছিল। দাদা, বৌদি, সেজভাই ক্ষীরোদ সবাইকে সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়ি যেতে বলে এলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে তপসে মাছ ভাজা খাওয়ানো হবে। একবারে তাজা তপসে মাছ গঙ্গা থেকে তুলে আনা হবে।

এদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যে থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে সারারাত জুড়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। উনি খুব ভোরে উঠে বিনুকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বৃষ্টির মধ্যেই পেনিটি পাঠিয়ে দিলেন পয়সা দিয়ে মাছ নিয়ে আসবার জন্য। দুপুরে অন্যান্য রান্নার জন্য বাজার-এর ব্যবস্থা করে মনে মনে আশঙ্কা হলো যে এত বৃষ্টিতে মাছ জালে নাও পড়তে পারে, তাহলে তো তপসে মাছের বদলে অন্য কিছু খেতে দেবার জন্য বাজার করিয়ে রাখা উচিত হবে। এই ভেবে আরেকবার বাজারে পাঠিয়ে বড় বড় কইমাছ ভাজা করবার জন্য আনিয়ে নিলাম।

বিনুর মাছ নিয়ে ফিরবার কোন লক্ষণ নেই। খুবই দুশ্চিন্তায় রান্নাবান্না করে যাচ্ছি। দুপুর নাগাদ বিনু খালি হাতে এসে বললে, 'যতীনবাবু চার চার বার জেলেদের দিয়ে জাল ফেলিয়েছেন, কিন্তু সম্ভবত বৃষ্টির জন্য একটাও মাছ জালে পড়লো না।'

যাই হোক, অন্যান্য খাবার দিয়েই সবাইকে খাওয়াতে হলো। ভাসুর জা সবাই এসে গিয়েছেন কিন্তু সেজ দেওর ক্ষীরোদচন্দ্রের আর দেখা নেই। শ্বশুরমশায় বললেন, 'অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, ক্ষীরুর জন্য আর অপেক্ষা করা সম্ভব না, এসো আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে ফেলি, ক্ষীরুর খাবার তুলে রেখে দাও।'

সেজঠাকুরপোর খাবার তুলে রেখে আমাদের খাওয়া-দাওয়া করে সব কাজকর্ম সারা হয়ে যাওয়ার পর বিকেল চারটে নাগাদ তিনি ঝড়ের মত এসে 'আমার খাবার কোথায়' বলে চেঁচামেচি করে বারান্দায় গিয়ে বসলেন। সঙ্গে আবার আরেকজন ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন। বারান্দায় বসে বললেন, 'এখানে বাইরে খাবার নিয়ে এসো।'

তাড়াতাড়ি একটা ছোট টেবিল পেতে দুজনের খাবার গুছিয়ে নিতে নিতে আরেক কাণ্ড করে বসলেন। বাড়ির নীচের ফুটপাথ দিয়ে সেজঠাকুরপোর আরও দুজন ডাক্তার বন্ধু যাচ্ছিলেন, তেতলার ওপর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'আরে, আরে—আপনারা যাচ্ছেন কোথায় ? আসুন, চলে আসুন ! দেখুন এসে মেজবৌদি

কি রকম ভালো জিনিস সব রান্না করেছেন। খেয়ে যান এসে।'

এই শুনে আমার মাথায় তো বজ্রাঘাত। খাবার তুলে রেখেছি একজনের, তবে পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় ভাবলাম দুজনে খেয়ে যেতে পারবে। না আরও দুজন একেবারে অচেনা ভদ্রলোককে ডেকে বসলো! সেজঠাকুরপোর একদম দায়িত্বশূন্য কাণ্ড দেখে শ্বশুরমশায় অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং উনিও শোবার ঘরে বসে গজরাতে থাকলেন। কেবলই বলতে লাগলেন, 'ক্ষীরোদের জন্য আমাদের মানসম্মান সব গেল। তার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

আমি বললাম, 'এখন গজগজ করে তো কোন লাভ নেই। যা হোক করে কোনরকমে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আমাদের দেশী প্রথানুযায়ী জনে জনে প্লেটে আলাদা করে খাবার সব না দিয়ে বিদেশী প্রথায় টেবিলে চারজনের জন্য চারখানা প্লেট, ছুরি কাঁটা দিয়ে আলাদা আলাদা পাত্রে মাছ, মাংস, পোলাও ইত্যাদি টেবিলের মাঝখানে রেখে ভদ্রলোকদের নিজেদের তুলে নিতে বললাম। তাঁরা খুব খুশী হয়েই নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে খেলেন এবং খুবই আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমি তাঁদের বললাম, 'আজ তো এই অবেলায় আর ভাল করে খাওয়াতে পারলাম না, আরেকদিন এসে ভাল করে খেয়ে যাবেন।'

শ্বশুরমশায়ের ভয়ানক চিন্তা হলো মিষ্টিজাতীয় কি খেতে দেবো ? সেজঠাকুরপোর জন্য শুধু দুটি সন্দেশ তোলা ছিল। বাড়িতে আম, লিচু ও কলা ছিল। তাই কেটে সব ফল মিশিয়ে অনেকখানি 'ফ্রুট স্যালাড' করে সাজিয়ে দিলাম। সেটা দেখে ও খেয়ে চার ডাক্তারের মধ্যে খুব ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম শ্বশুরমশায় এইভাবে সেজঠাকুরপোর বন্ধুদের ডেকে নিয়ে আসার জন্য খুবই অসোয়াস্তি বোধ করে তাঁর ঘরের সামনে পায়চারি করছিলেন। তাঁরা সবাই খুশী হয়ে খেয়েদেয়ে হৈ-হৈ করে চলে যাওয়ার পর তিনি স্থির হয়ে খাটের ওপর গিয়ে বসলেন।

বড় ছেলে জন্মাবার কয়দিন আগে বিনু কিরণ বাল্‌ব-এর ক্যানভাসিং-এর কাজ পেয়েছিল বটে কিন্তু কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাওয়াতে দু'তিন মাসের মধ্যেই ফেরৎ আসতে হলো। তখন উনি ভাবলেন যে বিনুকে কোনরকমে একটা কাজের লাইনে ঢুকিয়ে দেওয়া নিতান্ত দরকার। বাড়ির অন্যান্য সব ভাইরা ভাল লেখাপড়া করে পাস করেছেন। কিন্তু বিনুর পড়ায় সেরকম উৎসাহ না থাকায় সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় নি। তার পরোপকার করবার দিকে মন ছিল বেশী।

উনি একদিন বিনুকে ডেকে বললেন, রোজ সকালে ওঁর সঙ্গে আপিসে যাবার জন্য তৈরী থাকতে। এই বলে তাকে 'প্রবাসী' আপিসে নিয়ে গিয়ে প্রুফ পড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন। কেদারবাবুরা আড়চোখে তাকিয়ে দেখতেন কিন্তু কিছু বলতেন না। এমনি করে কয়েকমাস যাওয়ার পর তাঁদের একজন প্রুফরীডারের দরকার বলে বিনুকে পঁচিশ টাকা মাইনেতে ভর্তি করে নিলেন।

ইতিমধ্যে 'ফ্রি ইন্ডিয়া' বলে একটা নতুন খবরের কাগজ বের হবে বলে সংবাদ

পাওয়া গেল। এবং উনি তাতে বেশি মাইনেতে এডিটারের কাজ পেয়ে গেলেন। কাজটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথমে 'প্রবাসী' আপিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে 'ফ্রি ইন্ডিয়া' কাগজ-এর আপিসে যোগ দিলেন এবং কাগজ যাতে ভালভাবে বের হয় তার জন্য সারাদিন ও অনেক রাত পর্যন্ত খাটতে আরম্ভ করলেন।

ওঁর ভাল চাকরি হয়েছে খবর পেয়ে শ্বশুরমশায় খুব খুশী হয়ে নবদ্বীপ থেকে এলেন। তিনি আসার দিনকয়েক-এর মধ্যেই শ্রীযুক্ত সুবোধ সরকার (তিনি স্মল কজ কোর্টের জজ ছিলেন এবং পাবলিশার এস. সি. সরকার এন্ড সন্স-এর কর্তা) তাঁর বড় মেয়ে নীলিমার সঙ্গে সেজ দেওর ক্ষীরোদের বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন। নীলিমা ও আমি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল বোর্ডিং-এ একসঙ্গে একই সময়ে ছিলাম। সে আমার এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো। শ্বশুরমশাই ও বাড়ির অন্যান্য সকলে আমার সঙ্গে তার খুবই চেনাশোনা শুনে খুবই খুশী হলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে বিয়ে হবে ঠিক হলো।

সেই সময় সেজঠাকুরপো ধর্মতলার একটা বড় বাড়ির সমস্ত দোতলাটায় থাকতেন। বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই আমরা সবাই মিলে ঐ বাড়িতে একত্র হতাম। বড় ননদ প্রিয়বালা পুজোর পর মাস দুই আমাদের কাছে থেকে সেই সময়টায় তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে নিয়ে সেজঠাকুরপোর তত্ত্বাবধানে থাকবার জন্য ঐ বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর পর পর কয়েকটি শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই দিনকয়েক-এর মধ্যে মারা যায়, তাই সেজঠাকুরপো ঐ শিশুর দেখাশোনা করবেন বলে তাঁর কাছেই রেখে দিলেন।

সেজঠাকুরপো প্রত্যেকদিন দুপুরের পর আমায় শ্যামবাজার থেকে তাঁর বাড়ি যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

১৯৩৪ সনের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে একদিন বিকেলে গাড়ি এসেছে নিয়ে যাবার জন্য, সেই সময় আমাদের চাকর কামিনীকে রান্নাঘরের ওপরে মাচা থেকে কিছু বাসনকোসন যা তোলা ছিল নামিয়ে আনবার জন্য বললাম, সঙ্গে নিয়ে যাবো বলে। কামিনী মাচার ওপর উঠেই চিৎকার করতে আরম্ভ করলো, 'মা ! মা ! এটা কি হইতেছে, সব হাঁড়ি পাতিল লড়তেছে !' আমি বললাম, 'কামিনী, শীগ্‌গির নেমে এসো। সাংঘাতিক ভূমিকম্প।'

বাড়িতে আর কেউ ছিলেন না তখন। আমার এগারো মাসের ছেলে শোবার ঘরে বিছানায় বসে খেলা করছিল, আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়ির কোণায় ল্যান্ডিং-এ গিয়ে দাঁড়ালাম। ওদিকে ঐ বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা সবাই ছেলেমেয়ে নিয়ে একত্র হয়ে দৌড়ে নীচে উঠোনে নেমে জড়ো হয়েছেন। ভীষণভাবে শাঁখ বাজানো, চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। ব্রজেনবাবুর স্ত্রী প্রাণপণে আমায় উদ্দেশ করে চিৎকার করতে লাগলেন, 'ও বুড়োর মা, শীগ্‌গির নেমে আয় নীচে ! ছেলে নিয়ে বাড়ি চাপা পড়ে মরবি নাকি ?'

আমি ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললাম, 'বাড়ি যদি ধসে পড়ে তো ঐ উঠোনেই পড়বে।'

তাইতে উনি রেগে আমায় বললেন, 'ধন্যি মেয়ে তুই ! একটু ভয়ডর কিছুই নেই ! কেমন দাঁত বার করে হাসছে, দেখ না ?'

যাক্, আস্তে করে ভূমিকম্প থামলে পর আমি গাড়ি করে সেজঠাকুরপোর বাড়ি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই উনিও সকলের খোঁজ করবার জন্য ফ্রি ইন্ডিয়া আপিস থেকে এসে হাজির।

এই ভূমিকম্প বিহারে খুব বেশী হয়েছিল। প্রায় ৩৪ হাজার লোক সেখানে মারা যায়। পরের বছর কোয়েটায় আরেকটা ভূমিকম্প হয়, তাতে আরো বেশী লোক—প্রায় ৬৫ হাজার মারা পড়ে। এরপর আসামে দু-দুবার ভূমিকম্প হয়েছিল, তবে তার লোকক্ষতির মাত্রা আমার সঠিক মনে নেই। আসামের শেষবারের ভূমিকম্পের সময় আমরা তখন দিল্লীতে বাস করি। দিল্লীতেও বাড়িঘরদোর সাংঘাতিক ভাবে কেঁপে উঠেছিল।

সেজঠাকুরপোর বিয়ের কটা দিন বাড়িসুদ্ধ সকলে একত্র হয়ে খুব হট্টগোলে কাটানো হল। আমার মিষ্টি খাওয়ার গল্প প্রথম অধ্যায়ে লিখেছি।

উনি নতুন কাগজ বার করবার জন্য খুবই খেটে চললেন। রাতদিন ব্যস্ত। সারারাত জেগে ভোরে কাগজ ছাপা হয়ে বের হলে বাড়ি ফিরতেন। খুবই উচ্চাশা নিয়ে এই কাজের ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু হায়, মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর ! টাকার অভাবে কাগজখানা একমাসের মধ্যেই বন্ধ করে দিতে হলো। এবারে হয়ে গেলেন একেবারে বেকার। প্রবাসী আপিসে থাকতে দুটি তিনটি মুদ্রা যাও বা আসতো এখন সব পথই একেবারে বন্ধ, ঘোরতর অন্ধকার।

তবে ভগবান বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বিনুর ঐ প্রুফরীডারের কাজ হয়ে যাওয়াতে। সে রোজ বিকেলে প্রবাসী আপিস ছুটি হওয়ার সময় একটি করে টাকা পেতো, এবং সেটি সে এনে আমার হাতে দিত। আমি তাই দিয়ে চাল, ডাল, তেল, নুন, মাছ, তরকারী ইত্যাদি রোজকার বাজার রোজ করে সংসার চালিয়ে কয়টি প্রাণ বাঁচাতে লাগলাম। কিন্তু বাড়িভাড়া ইত্যাদি জমতে লাগলো।

'ফ্রি ইন্ডিয়া' কাগজ বের করার সময় পুলিসে ৫০০ টাকা জমা দিতে হয় এবং ঐ টাকা ওঁর নাম দিয়েই জমা করানো হয়েছিল। উনি কাগজের মালিক সদানন্দকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে মাইনে বাবদ ৫০০ টাকা ওঁর যা পাওনা হয়েছে, সেটা পুলিসের কাছ থেকে ফেরৎ পেলে নিয়ে নেবেন। টাকাটা আদায় হতে যদিও বেশ কয়েকমাস দেরী হলো, তবে পেয়ে গেলেন এবং একসঙ্গে কিছু মোটা টাকা পাওয়াতে বাড়িভাড়া ইত্যাদি পরিষ্কার করে দিয়ে দিতে পারলাম।

এই টাকা থেকে ৫ টাকা দিয়ে বড় ছেলেকে 'হল এন্ড এন্ডারসনে'র দোকান থেকে একবাক্স বাড়ি তৈরী করবার 'বিল্ডিং ব্লক' খেলনা কিনে এনে দিলেন। এই খেলনার বাক্স দেখে অনেকেই এত দামী খেলনা ইত্যাদি বলতে লাগলেন। কিন্তু সবচেয়ে মজা হলো জনৈকা নিকট-আত্মীয়া আমার মার কাছে ভবানীপুর গিয়ে অভিযোগ করলেন,

'নীরদ-এর চাকরি নেই, নিজেরা খেতে পায় না, এদিকে ৫ টাকা খরচ করে ছেলের জন্যে খেলনা কিনেছে!' এই খবর শোনা অবধি মা মনে মনে বেশ একটু দুঃখবোধ করছিলেন।

অল্পদিন পর মা একদিন শ্যামবাজারে আমাদের দেখতে এসেছেন, নানান কথাবার্তার পর হঠাৎ ওঁকে বললেন, 'বাবা, একটা কথা বলছি, কিছু মনে কোরো না। অমুক বলছিলেন তুমি নাকি পাঁচ টাকা দিয়ে কি খেলনা কিনেছ! এখন এত টানাটানির মধ্যে খেলনার জন্য এতগুলি টাকা খরচ করা কি উচিত হল?' (তখনকার দিনে অবশ্য ৫টি টাকা অনেক টাকার সামিল)

তারপর উনি যখন মাকে বুঝিয়ে বললেন যে ছেলের ঐ যা বয়স, সেই বয়সে ঐ রকম খেলনা দিয়ে খেললে পর তার বুদ্ধি, শিক্ষা ইত্যাদির সহায়তা হবে। সব শুনে এবং দেখে মা খুবই খুশী হলেন ও বললেন, 'সত্যি তো! এটা তো ছেলের শিক্ষার একটা অঙ্গ, এটা কেনার জন্য এরকম অসন্তোষ প্রকাশ করা মোটেও উচিত নয়। এই সময়েই তো এই শিশুর এরকম খেলনা দরকার।' যিনি বলেছিলেন, তাঁর নাম করে মা বললেন, 'তাহলে দেখছি তিনি অত্যন্ত অশিক্ষিত।'

সেজঠাকুরপোর বিয়ের পর শ্বশুরমশায় নবদ্বীপ ছেড়ে কাশীতে গিয়ে থাকা স্থির করেন। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে তিনি কাশী চলে গিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসের শেষে একদিন হঠাৎ একটা টেলিগ্রামে খবর এলো যে তিনি হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন।

কাগজের আপিস বন্ধ হয়ে যাবার খবর দিয়ে উনি শ্বশুরমশায়কে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিখানা পেয়েই তার উত্তর একটা পোস্টকার্ডে লিখে যে—তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এবং শীগ্‌গিরই আসছেন—ইত্যাদি নিজের হাতে ডাকে দিয়ে এসেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। তাঁর ঐ শেষ চিঠিখানা যত্ন করে তোলা আছে। আমাদের জন্য কত আকুলতা প্রকাশ করে চিঠিখানা লিখেছিলেন।

শাশুড়ীঠাকরুণ আমার বিবাহের আট বৎসর আগে মারা যান। তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর শ্বশুরমশায় সংসারের সমস্ত ভার একা নিজের ওপর তুলে নিয়ে তাঁর আটটি সন্তানকে অগাধ স্নেহ, মমতা দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন।

আমার মায়ের কাছে শাশুড়ীঠাকরুণের কত প্রশংসা শুনেছি। তাঁর গানবাজনা, সংসারের কাজকর্মে দক্ষতার জন্য একসময়ে তিনি শিলং শহরের একজন আদর্শ মহিলা ছিলেন। তাঁকে দেখতে না পাওয়ার জন্য খুবই দুঃখবোধ হয়। তবে শ্বশুরমশায়কে ঠিক আমার বাবার মত আরেকজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের মাথার উপর আছেন মনে করে খুব আশ্বস্ত বোধ করতাম।

কিন্তু হায়, কে জানতো ইনিও ক্ষণজন্মা! অল্প কিছুদিনের মধ্যে এঁকেও হারিয়ে সকলে অনাথ হয়ে পড়বো! শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুর পর আমরা খুবই অসহায় বোধ করেছি বেশ কিছুদিন।

॥ ৮ ॥

আর্থিক দুরবস্থা ও দৈবসহায়তা

শ্বশুর মশায়ের মৃত্যুর প্রায় মাস পাঁচেক পরে ১৯৩৪ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর আমার মেজ ছেলের জন্ম হয়। উনি ওর বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম অনুসরণ করে ছেলের নাম রাখলেন 'কীর্তিনারায়ণ'। কীর্তিনারায়ণ দেখতে খুব সুন্দর ও ধবধবে ফর্সা হয়েছিল। শ্রীযুক্ত অমল হোম মশায় তাকে বলতেন 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'। দেশ থেকে যখন ননদের ছেলেমেয়েরা সব আসতো তারা কীর্তিনারায়ণকে 'কার্তিকবাবু' বলে ডাকতো।

আমার জীবন শুরু হলো অদ্ভুত একটি ঘটনা দিয়ে। আমরা বাইবেলে যীশুখৃষ্টের দ্বারা নানারকম কীর্তিকলাপের কথা পড়ি, এই ঘটনাও যেন সেই রকমেরই। ভগবান যে আর্তের সহায় হন সেটা নিজেদের ক্ষেত্রে খুবই ভাল অনুভব করলাম।

যেদিন মেজ ছেলে জন্মালো, সকালে হাতে মাত্র কয়েক আনা পয়সা। আমরা দুজনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সে প্রায় ডাক্তারের নির্ধারিত সময়ের দিন কুড়ি আগে জন্মেছিল। জিনিসপত্র কিছুই কেনা হয় নি। এখন উপায়? মনে মনে কেবল ভগবানকে ডাকছি। উনি অস্থির হয়ে বারান্দায়, ঘরেবাইরে শুধু পায়চারি করছেন। সকাল ন'টা নাগাদ বাইরে সদর দরজায় বেল শোনা গেল। উনি দরজা খুলতেই শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ঢুকে এসে বললেন, 'নীরদবাবু, আপনার ঐ লেখার যে টাকা প্রাপ্য হয়েছে সেটা দিতে এলাম।' বলে ওঁর হাতে চল্লিশটি টাকা দিলেন। উনি সজনীবাবুর একটা কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমাদের তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। ভগবানের দান মনে করে বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তখনকার মত বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া গেল। ডাক্তার, নার্স সকলের কাছেই নিজেদের মান বজায় রাখতে পারা গেল।

বিনু 'প্রবাসী' আপিসে যায়, দিনান্তে একটি করে টাকা এনে আমার হাতে দেয়। তাই দিয়ে দৈনিক খরচা চালাই। চাকর রোজ সন্ধ্যেবেলা এসে যখন সারাদিনের হিসেব দিত, সেই সময় বড় ছেলে কাছে বসে খেলা করতো। সে বসে বসে সব শুনতো। কয়দিন এরকম দেখা ও শোনার পর চাকরকে কাগজ হাতে আসছে দেখলেই সে আমায় বলতো, 'লেখো! লেখো! চাল চার আনা, ডাল দু আনা, চিনি এক আনা, বেগুন দু পয়সা'—এমনি করে সে নিজেই আগে বাজারের হিসেবের একটা তালিকা বলে যেতো।' সে সময়ে জিনিসপত্র অতিশয় সস্তা ছিল বলে ঐ সামান্য পয়সাতেই কোনক্রমে সব চালিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

ওঁর আর কোন বাঁধা কাজ নেই। মনকে একটু ব্যস্ত রাখবার জন্য রোজই প্রায় সকাল সকাল দুটি খেয়ে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করবার জন্য পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়তেন। সারাদিন সেখানে পড়াশুনা করে বিকেলে ফিরতেন।

ওঁকে বেকার পেয়ে মাঝে মাঝে কোন কোন বন্ধু নিজেদের কিছু লেখার কাজ অতি তুচ্ছ পারিশ্রমিক দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। তখন খরচাপত্রের জন্য টাকা দরকার,

সামান্য কয়টি টাকা পেয়েই খুশী হয়ে যেতেন। আমি এতে একটু বিরক্তি বোধ করতাম। একদিন জনৈক বন্ধুর নামে সোনালী জলে লেখা বাঁধানো একখানা বই দেখে আমি ওঁকে বললাম, 'তোমাকে দিয়ে অমুকরা সব বই লিখিয়ে নিজেরা বেশ নাম করে নিচ্ছেন !' উনি তখন আমায় বোঝালেন, 'যখন আমি নিজে বই লিখবো তখন কি আর এই বই লিখবো ! অপেক্ষা করো ক'টা দিন। দেখো, আমি যখন বই লিখবো, তখন এমন বই লিখবো যার খ্যাতি পৃথিবী জুড়ে লোকের কাছে ছড়িয়ে পড়বে।' এই কথা শোনার পর আমি আর একটা দিনও বই লেখা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিনি। তবে সেই বই দেখবার জন্য আমায় অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৮ বছর। আর উনি যে আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, তাও ঠিকই পালন করেছেন।

একটা করে দিন যায় না তো একটা মাস, একটা মাস কাটলে মনে হয় একটা বছর। এই করে ১৯৩৪ সন কাটিয়ে শুরু হল ১৯৩৫ সন। পড়লাম তখন আরেক হাঙ্গামায়। সেই সময়ে কলকাতায় ঘরে ঘরে বেরিবেরি রোগ দেখা দিয়েছে। হঠাৎ একদিন দেখি আমারও পা ফুলতে আরম্ভ করেছে, সঙ্গে বুক ধড়ফড়ানি। তখুনি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র খাওয়া আরম্ভ করলাম। ডাক্তার সর্ষের তেলে রান্না করা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সেই যুগে বাঙালী সংসারে সর্ষের তেলেই প্রায় সব কিছু রান্না হতো। তেলের বদলে ভাল ঘি দিয়ে সেদ্ধমত রান্না করে বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। অল্প কয়দিনের মধ্যে পা ফোলা কমে গেল বটে ; কিন্তু নতুন উপসর্গ দেখা দিল। চোখে আবছা দেখতে লাগলাম। স্নান করে এসে মনে হতো ঘরের চারদিক একেবারে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এবং ইলেকট্রিক আলোর দিকে তাকালেই শনিগ্রহের বলয়ের মত চারদিকে রামধনুর রঙের একটা বলয় দেখতাম।

আমার এই অবস্থা জানিয়ে সেজঠাকুরপোকে ফোন করা মাত্র তিনি এসে গাড়ি করে তাঁর বিশেষ বন্ধু বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার নীহার মুন্সীর কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার ভদ্রলোকের রুগী পরীক্ষা করার রকমারি সব যন্ত্রপাতি দেখে খুবই অবাক হয়ে পড়লাম। অন্ধকারমত ঘরখানা, দেখে মনে হলো চারদিকে চাঁদ, তারা সব জ্বলজ্বল করছে। নানারকম ভাবে প্রায় আড়াই, তিন ঘন্টা ঐ যন্ত্রগুলির মধ্যে দিয়ে আমার চোখ পরীক্ষা করে ডাক্তার মুন্সী বললেন, 'গ্লকোমা' হয়েছে এবং ডান চোখের অবস্থা একটু গুরুতর। তবে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর চিকিৎসাধীনে থাকলে মাসখানেকের মধ্যে চোখ ভাল হয়ে যাবে। তাঁর কথাই ঠিক হলো। ক্রমশঃ ওষুধপত্র ব্যবহার করতে করতে এক মাসের মধ্যে আবার পরিষ্কার দেখতে লাগলাম।

পুঁটু ১৯৩৩ সনে বি-এ পাশ করে শিলং ফিরে গেল। তাকে নিয়ে মা ও বাবা নভেম্বর মাসে কলকাতায় ভবানীপুরে দিদির পাশের বাড়ির একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নিলেন এবং স্থির করলেন যে কলকাতাতেই থেকে যাবেন। ১৯৩৪ সনে মেজ ছেলে জন্মাবার মাসখানেক পর থেকে বাবা খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেতাম কিন্তু ঐ গুরুতর রোগীর বাড়িতে ছোট শিশু নিয়ে হট্টগোল করা উচিত নয় বলে সন্ধ্যেবেলা শ্যামবাজারে ফিরে চলে আসতাম।

১৯৩৫ সনের প্রথমদিকে বাবা একটু ভাল হলেন ; মা ছেলেদের নিয়ে তাঁদের কাছে থেকে আসবার জন্যে বললেন। আমি গিয়ে দেখলাম বাবাকে দেখাশোনা করবার জন্য একটি কম্পাউন্ডার ভদ্রলোককে আমাদের দেশ (সীলেট) থেকে আনানো হয়েছে এবং দুটি হিন্দুস্থানী চাকর রাখা হয়েছে। তারা আগে কোন এক হাসপাতালে কাজ করতো। তাইতে রুগীর সেবাশুশ্রূষা অল্পবিস্তর জানা ছিল। বাড়িতে শুধু মা ও ছোটবোন। দিদি পাশের বাড়িতে থাকতেন, ভগ্নিপতি জামাইদা তিনিও ডাক্তার। বাবার এমনি দেখাশোনা সব তদারক তাঁরাই করতেন।

আমি মার ওখানে যাওয়ার পরদিন বাবার ঘরের ঐ হিন্দুস্থানী চাকরদের জিজ্ঞাসা করলাম যে তাদের চেনাজানা কোন ছোকরা চাকর আছে যে আমার ছেলেদের সঙ্গে একটু খেলাধূলা করবে এবং আমার স্নান-খাওয়ার সময় একটু চোখে চোখে রাখবে। বলামাত্রই তাদের একজন দুপুরে গিয়ে তাদের বাসা থেকে একটি বছর বারো বয়সের ছেলে নিয়ে এসে হাজির। কথাবার্তা কয়ে তখুনি ঠিক করে নিলাম—খাওয়াদাওয়া এবং মাসে ২ টাকা করে মাইনে পাবে। সেইদিন থেকেই সে আমার কাছে রয়ে গেল। যদিও সে মিথিলার দ্বারভাঙ্গার ছেলে ছিল কিন্তু বাংলাতে কথা বলতে পারতো। তার নাম 'ধনুকধারী মন্ডল'। সে সেই ১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমাদের কাছে রইল ১৯৮৪ সন পর্যন্ত। অর্থাৎ উনপঞ্চাশ বছর সে আমাদের কাজকর্ম দেখাশোনা সব করেছে।

এখনো যদি দেশে থাকতাম সে আমাদের কাছেই থাকতো। নেহাৎ আমরা বিদেশে চলে আসাতে সে তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তার গ্রামে আছে। সে আমাদের পরিবারভুক্ত বাড়িরই ছেলের মত ছিল। ছেলেরা যখন ছোট ছোট—সন্ধ্যেবেলা তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমি বসে ধনুকে পড়াতে আরম্ভ করলাম। হাতে ধরে ইংরেজী অক্ষর চিনিয়ে লিখতে শেখালাম। একটু একটু করে 'কিং প্রাইমার', তারপর 'কিং রীডার' শেষ করলো। কিছু অঙ্কও বেশ শিখে ফেললো। ছেলেবেলায় তার মা মরে যায়। আমাকেই সে মা ডাকতো। আমাদের সে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। ক্রমশঃ সে যত বড় হতে লাগলো, ছেলেদের দেখাশোনা করা ছাড়া বাড়ির যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম সব অতিশয় নিপুণভাবে করে যেতো। পরে আমরা কলকাতা ছেড়ে দিল্লী আসার সময়ে সেও আমাদের সঙ্গে চলে আসে এবং পরে ছেলেরাও বড় হয়ে যেতে উনি তাকে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাপরাসীর কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। সে এখানেও আপিসের কাজে খুবই দক্ষতা দেখানোর জন্য প্রতিবছর উন্নতি করে করে একেবারে দপ্তরী পর্যন্ত উঠেছিল।

আমরা যখন বিলাতে চলে এলাম, সমস্ত বাড়ির ভার তার উপরেই দিয়ে এলাম। পনেরো বছর ধরে সে আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র বাড়ি সামলিয়ে রেখেছে। তারপর আমরাও দিল্লীর বাড়ি তুলে দিলাম এবং সেও আপিস থেকে অবসর পাওয়াতে তার দেশে গ্রামে ফিরে গেল। তার বাবুজীকে ও আমাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে মাসে দু-তিনখানা করে চিঠি লেখে। এখনকার দিনে এরকম বিশ্বস্ত দায়িত্বপূর্ণ লোক অতি

বিরল। আমরাও তাকে আমাদের নিজের ছেলের মতই মনে করি।

হঠাৎ একদিন দুপুরে উনি হাতে একটা খাঁচা ঝুলিয়ে নিয়ে বাড়ি এসেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঐ খাঁচায় কি ? বললেন 'গিনিপিগ' 'গিনিপিগ', ছেলে ওগুলোকে নিয়ে বেশ খেলা করতে পারবে।

তুলোর বলের মত নরম, লাল চোখওয়ালা ঐ ছোট্ট দুটো জন্তু দেখে বাড়িসুদ্ধ সবারই খুব আনন্দ। তখুনি ওগুলোকে শাক তরকারী খাওয়ানো, বাটি করে জল দেওয়া ইত্যাদি খুব যত্ন আরম্ভ হলো। তারপর দিনকয়েক যেতেই গিনিপিগ পোষার মজা জেনে গেলাম। সবসময় তো ওগুলোকে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা যায় না। ছেড়ে রাখতেই হয় কিছু সময়। কিন্তু ছাড়লেই সমস্ত বাড়ি ঘরদোর নোংরা করে, দুর্গন্ধে টেঁকা যায় না। যত খেতে দিই তত খেয়েই চলেছে। তারপর চরমে উঠলো বংশবৃদ্ধি শুরু হতে। দুটোর জায়গায় জুটে বসলো চারটে। নাকাল হয়ে ভাবছি এগুলোর হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায় ? এর মধ্যে একদিন দিদি (বড় জা) কৃষ্ণাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছেন। গিনিপিগগুলোকে দেখে তাঁরও সখ জেগে উঠলো : বললেন, বাঃ ! জন্তুগুলো তো ভারী সুন্দর, কৃষ্ণাকে এরকম কিনে দিতে পারলে বেশ হতো। আমি বললাম, কিনতে যাবেন কেন ? আপনি এগুলোই নিয়ে যান, আমাদের ফ্ল্যাটে রাখার অসুবিধে, আপনার বাড়ির উঠোনের কোণে ভাল থাকবে। তিনি বেশ খুশী হয়ে নিয়ে চলে গেলেন। শুনলাম কিছুদিন পরে তিনিও জ্বালাতন হয়ে কাকে সব দান করে দিয়ে রক্ষে পেয়েছিলেন।

কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখি উনি আরেকজোড়া গিনিপিগ নিয়ে এসে উপস্থিত। তখন দুই ছেলে একটু বড় হয়েছে, তারা তো ওগুলোকে পেয়ে খুব খেলা আরম্ভ করেছে, কিন্তু যত্ন করবার ভার আমার ওপর। আমার মাথায় তো বজ্রাঘাত। বাড়ি ঘরদোরের অবস্থা পূর্ববৎ। কেবলই ভাবছি কি করা যায় ? তারপর রেহাই পাবার পথ কি করে ঠাওরালাম লিখছি।

শ্রীমান নবেন্দু দত্তমজুমদার (ডাকনাম মীনা) ইনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের একজন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের মেজ ভাই। রোজ সকালের দিকে আমাদের বাড়ি এসে দুপুর পর্যন্ত ওঁর বইপত্র নিয়ে পড়াশুনা করতেন। আর উনি নিজে পড়তে যেতেন ইম্পিরীয়েল লাইব্রেরীতে। বেকার সমস্যায় দুজনেরই এক অবস্থা। একদিন মীনা ঠাকুরপো সকালে আমাদের বাড়ি এসেছেন, আমি বললাম, মীনা ঠাকুরপো, আপনাকে একটা জিনিস দেবো, নেবেন কি ?

তিনি বললেন, বৌদি, আপনি দিতে চাইছেন আর আমি নেবো না, তা কি হয় ! অবশ্যই নেবো, মাথা পেতে নেবো।

আমি বললাম, আচ্ছা পড়াশুনা করে নিন, যাবার সময় দেবো।

তাঁর পড়াশোনা শেষ করে আমায় ডেকে বললেন, বৌদি দিন, কি যে দেবেন বলেছিলেন !

আমি ধনুকে বললাম, গিনিপিগের খাঁচাটা এনে বাবুর হাতে দে।

মীনা ঠাকুরপো গিনিপিগ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে খাঁচাটা হাতে করে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর কিছুদিন পরে এসে গল্প করলেন ঐ গিনিপিগগুলোকে তিনি তাঁদের ময়মনসিংহের 'অষ্টগ্রাম' গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ক্রমশঃ বংশবৃদ্ধি হয়ে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি দিয়ে দিয়ে নাকি সমস্ত অষ্টগ্রাম একেবারে গিনিপিগে ভরে গিয়েছিল। আর গ্রামের লোক নাকি গিনিপিগ না বলে বলতো 'গিন্নিপুক'।

আরেকবার ওঁর সখ হয়েছে 'বেজী' পুষবার। একদিন সকালবেলায় কি কাজে শ্রীযুক্ত অমল হোম মশায়ের বাড়ি গিয়েছেন। সেখানে অমলবাবুর ছোট ভাইয়ের প্ররোচনায় দুজনে মিলে হাতীবাগানের মেলায় গিয়ে বেজী দেখে দাম-দর করে দুটি টাকায় রফা করে এসেছেন। বাড়ি এসে দুপুরে খেয়েদেয়ে আমায় বললেন, 'দুটো টাকা দিতে পারবে কি ?'

আমি শোনামাত্র ২ টাকা বের করে দিলাম। ভাবলাম কখনো তো নিজের জন্য কোন টাকাপয়সা চান না, হঠাৎ হয়ত কিছু দরকার হয়ে পড়েছে। টাকা দুটো হাতে নিয়ে ফেঁসে বলে ফেলেছেন, যাই, গিয়ে বেজীটাকে নিয়ে আসি, দামদর করে রেখে এসেছি।

ওকথা শোনামাত্র আমি তো প্রমাদ গুনলাম। যেই উনি শোবার ঘরের দরজা দিয়ে বের হতে যাবেন, আমি অমনি দৌড়ে গিয়ে ধড়াম করে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে পিঠ দিয়ে ঠেলে দাঁড়ালাম। আমি আর নড়ি না, উনিও আর ঘর থেকে বের হতে পারেন না। কতক্ষণ কাকুতি-মিনতি করার পর আর কোন উপায় না দেখে খাটে ছেলে ঘুমোচ্ছিলো তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে রইলেন। আমিও দরজায় ঠেসান দিয়ে বসে রইলাম। তারপর ঢং ঢং করে মিত্তিরবাড়ির ছাদের ঘড়িতে চারটের ঘন্টা বেজে ওঠার পর আমি দরজা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনে মনে ভাবলাম বেজীর হাত থেকে রক্ষা পেলাম, কারণ ততক্ষণে মেলা ভেঙে গিয়েছে।

পরে অবশ্য শেয়ালের 'দ্রাক্ষাফল অতিশয় টক' বলার মত বললেন, না গিয়ে ভালই হয়েছে, বেজীটা পোষ মানতো কিনা সন্দেহ, আমায় দেখে যেরকম ফ্যাঁচফোঁচ করছিল ! লোকটা অবশ্য বলেছিল যে কয়দিনেই পোষ মেনে যাবে, কিন্তু ওটা বাচ্চা ছিল না।

জন্তু-জানোয়ার পোষার সখ আমারও কম ছিল না। কিন্তু খোলামেলা বেশী জায়গা না থাকলে বড় কষ্ট। পরে যখন চক্রবেড়েতে খোলা জায়গায় বড় বাড়িতে উঠে যাই তখন গিনিপিগ, মুনিয়া, টিয়া, রামগয়লা, (জাভা স্প্যারো), লালমাছ ইত্যাদি পুষেছিলাম। কিন্তু সেখানে আবার আরেক বিপদ ছিল। প্রায়ই এগুলোকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'ঘুস' ইঁদুর (ইংরেজীতে যাকে বলে ব্যান্ডিকুট) এসে খাঁচা ছিঁড়ে মেরে রেখে যেতো।

১৯৩৫ সনের প্রথম দিকে আমার ভাসুররা চৌরঙ্গী রোডের বাড়ি থেকে বালিগঞ্জে ডোভার লেনে একটা বাড়িতে উঠে গেলেন। এর কিছুদিন পর ন' দেওর টলুর একটা চাকরি হলো। একদিন টলু তার চাকরি পাওয়ার খবর দাদাকে দিতে গিয়ে বালিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে বললো, দাদার জ্বর হয়েছে ; বৌদি বলছেন—টলু, তুমি শ্যামবাজার থেকে চলে এসে এখানে আমাদের কাছে থাক। তোমার দাদার অসুখ দেখলে আমার কেমন ভয় করে। টলু আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করলে পর আমি ও উনি দুজনেই বললাম যে এতে আমাদের বাধা দেবার কোন কারণ নেই। সে যা করবার তার ইচ্ছেমত করতে পারে। টলু দু'চারদিন পর বালিগঞ্জ চলে গেল।

ডোভার লেনে আমার ভাসুররা যে বাড়িটা নিয়ে ছিলেন খুবই খোলামেলা ছিল। বাড়ির পেছনের দিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বাগান ও ঘাসের মাঠ ছিল। ওঁরা মাঠে একদিকে 'ব্যাডমিন্টন' খেলার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে আমি ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সারাদিন ওখানে ঘুরে আসতাম। একদিন ও-বাড়ি গিয়েছি, বিকেলের দিকে আমার বড় জা ও ভাসুর দুজনে মিলে ব্যাডমিন্টন খেলছেন। আমি কাছেই আমার মেজ ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘাসের ওপর বসে তাদের খেলা দেখছিলাম। দিদি হঠাৎ কি কারণে খেলা বন্ধ করে র‍্যাকেটটা ঘাসের ওপর রেখে বাড়ির ভেতর গিয়েছেন। তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার ভাসুর অধৈর্য হয়ে কেবলই চেঁচামেচি করে ডেকেই চলেছেন 'ছায়া, শিগ্‌গির এসো' ইত্যাদি বলে। তাই খানিকক্ষণ দেখে আমি ছেলেকে ঘাসের ওপর বসিয়ে আস্তে করে দাঁড়িয়ে উঠে বেশ করে কোমরে শাড়ির আঁচলখানা জড়িয়ে নিয়ে র‍্যাকেটখানা তুলে নিয়ে হাতে দাঁড়িয়েছি, তা দেখে ভাসুর বললেন, বৌমা, তুমি কি খেলতে জানো ? পারবে কি ?

আমি কিছু না বলে শুধু হেসে 'শ্যাটলকক' ধরে খেলা আরম্ভ করলাম এবং ভাসুরকে কয়েকবারই হারিয়ে দিতে লাগলাম। তাই দেখে তিনি বেশ খুশী হয়ে বললেন, 'আমি তো জানি না তুমি খেলতে জান।'

আমি বললাম, 'আমরা স্কুলে বরাবর খেলে এসেছি। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে থাকতে তো খুব বেশী খেলতাম।'

তবে মাথার ঘোমটা ফেলে ভাসুরের সঙ্গে খেলার জন্য জায়ের কাছে কিছু ভর্ৎসনাও খেতে হয়েছিল।

চতুর্থ দেওর হিরণ্ময় কোচিনে একটা বড় কোম্পানীতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের পোস্টে কাজ করছিল। হঠাৎ খবর এলো তার সেই চাকরি ছাঁটাই হয়ে যাওয়াতে সে কলকাতা ফিরে আসছে। কিছুদিন পর এসে ভাসুরের বাড়িতেই উঠলো। ছোট জায়ের কোলে বছর দেড়েকের ছেলে এবং আবার সন্তানসম্ভাবনা বলে তাকে শ্বশুরবাড়ি কটকে রেখে এসেছে। বালিগঞ্জে কিছুদিন থাকার পর হিরু একদিন তার মোটঘাট নিয়ে শ্যামবাজারে আমাদের কাছে চলে এলো। মাসখানেক পরে কটক থেকে খবর এলো হিরুর একটি মেয়ে হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ পর থেকেই হিরু তার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে আসবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। উনি বার বার বোঝালেন যে আর

কয়টা দিন অপেক্ষা করে তারপর সবাইকে নিয়ে আসতে। এখন আনলে সবার খুবই কষ্ট অসুবিধা হবে, কারণ বিনুর ঐ একটি টাকা দিনে ভরসা মাত্র।

সেই সময় শ্রীযুক্ত অমল হোম মশায় 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' কাগজ সম্পাদনা করতেন। তিনি কিছুদিনের ছুটি নিচ্ছিলেন এবং তাঁর জায়গায় ওঁকে কাগজখানা চালাবার ভার দিয়ে যাবার জন্য ঠিক করলেন। বার বার হিরুকে বললেন, আমি মিউনিসিপ্যাল গেজেটের এই চাকরিটা পেয়ে যাই তারপর সবাইকে নিয়ে আসিস।

কিন্তু হিরু সেই কথা কিছুতেই শুনলো না। একদিন দুপুরবেলা খেয়ে সে যে কোথায় বের হলো, সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত বাড়ি ফিরলো না। খুবই উৎকণ্ঠায় রাত্রে বিনুকে ভাসুরের বাড়ি, সেজঠাকুরপোর বাড়ি সর্বত্র খোঁজ করালাম, কোথাও যায় নি। তারপর যা সন্দেহ করেছিলাম আমরা, তাই সত্য হলো। দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন সকালে ছেলেমেয়েসহ ছোটজাকে নিয়ে এসে হাজির।

এমনিতে সবাইকে দেখে আনন্দ হলেও মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। নিজেদের দুটি ছোট ছেলে নিয়ে অতিকষ্টে কোনক্রমে সংসার চালাই ; এখন এতগুলি লোকের ভরণপোষণ চালাবো কিভাবে ? মুখে কাউকে কিছু বললাম না যদিও, কিন্তু মনের ভেতর আতঙ্কে শুকিয়ে উঠতে আরম্ভ করলো। উনি বা আমি এই নিয়ে কিছু আলোচনা করতাম না, কারণ জানতাম আরো বেশী দুঃখ হবে। প্রায়ই মাঝরাতে জেগে দেখতাম ঘরময় পায়চারি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বুঝতে পারতাম যে মনে কি অশান্তির জ্বালা চলছে। রাতদিন কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম একটা কিছু সুরাহা যাতে হয়।

কি করে কি চালাবো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। আমাদের ঐ 'যতীন্দ্র ম্যানসন' বাড়িটার একতলায় রাস্তার দিকে কালীচরণ বলে একজন মুদির দোকান খুলে অবধি তার দোকান থেকে মাসকাবারি জিনিস আনবার জন্য খুব বেশী সাধাসাধি করতো। কিন্তু আমি তাতে রাজী হতাম না। কারণ দৈনন্দিন কিনলে পর আর কারো কাছে দেনা জমবার ভয় থাকতো না। আমি কালীচরণকে ডেকে বললাম, তোমার কথামত আমি কিছুদিন তোমার দোকান থেকে মাসে মাসে জিনিস নেবো স্থির করেছি, কিন্তু মাসের প্রথমেই তোমার সবটা দাম একসঙ্গে চুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না, বাবু যেমন যেমন টাকা পাবেন, আমিও তেমন তেমন ভাবে জমা দিয়ে যাবো।

সে খুব খুশী হয়ে আমার কাছ থেকে ফর্দ নিয়ে এক মাসের মত চাল, ডাল ইত্যাদি সব পাঠিয়ে দিল। এতে অন্ততঃ এক দিকের খরচার একটা ব্যবস্থা হলো আর বিনুর দেওয়া একটি টাকা দিয়ে বাড়িসুদ্ধ এতগুলি লোকের দৈনন্দিন খরচটা চালাতে থাকলাম। উনি এদিক ওদিক কিছু লিখে মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প যা উপার্জন করতেন কখনো কালী মুদীর হিসেবে, কখনো দুধওয়ালাকে কিম্বা চাকরের মাইনে দেবার চেষ্টা করতাম। এছাড়া ছিল একটা মস্ত বড় খরচা—ফ্ল্যাটের ভাড়া। যখনি কিছু বেশী টাকা

পেতেন সেটা দিয়ে ভাড়াটা মিটিয়ে দিতাম। কিন্তু সব সময়েই একটা অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়ে চলতে হতো।

আমি যে এতটা অভাব-অনটনের ভিতর দিয়ে চলেছি সেটা মা-বাবার কাছে কখনোই কোনোভাবে প্রকাশ করি নি। ভাবতাম তাঁরা অত সখ করে আমার বিয়ে দিয়েছেন, আমি এখন এই অবস্থায় জানলে খুবই মর্মাহত হবেন এবং যদি কোন আর্থিক সাহায্য দিতে চান, আমি নেবো না বলা আমার পক্ষে বলা যেমন অন্যায় হবে, তেমনি কোন্ মুখে তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এতবড় সমস্ত সংসারের খরচা চালাবো ! এতে শ্বশুরবাড়ির সবাইকে খুবই ছোট করা হবে। কালের দৈবদুর্বিপাকে বরাবর সচ্ছলতার ভিতর দিয়ে গিয়ে হঠাৎ এ রকম অবস্থায় পড়ার দরুন তাঁরা নিজেরাই যথেষ্ট সঙ্কুচিত বোধ করতেন।

১৯৩৫ সনের শেষের দিকে হিরু আমাদের বাড়ির অল্প একটু দূরে একটা তেলের কলে কাজ যোগাড় করে একটা বাড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে চলে গেল।

এর দিনকয়েক পর একদিন সজনীবাবু এসে ওঁকে বললেন, কপিল ভট্টাচার্য বলে তাঁর এক ধনবান বন্ধু এক সাপ্তাহিক কাগজ বের করতে চাইছেন। কথাবার্তা কয়ে ঠিক হলো উনি হবেন সম্পাদক ও সজনীবাবু পরিচালনা করে যাবেন। সাপ্তাহিক কাগজখানার নাম হবে 'নূতন পত্রিকা'।

১৯৩৬ সনের ২৪শে জানুয়ারী প্রথম সংখ্যা বের হলো। তারপর নূতন পত্রিকা ২য় সংখ্যা ৩১শে জানুয়ারী বের হয়ে ক্রমশঃ ৫ম সংখ্যা পর্যন্ত বের হলো। কিন্তু সজনীবাবুর বন্ধুটি আর কাগজ চালাবার জন্য টাকার কোন ব্যবস্থা করতে না পারার দরুন কাগজ বন্ধ করে দিতে হল।

'নূতন পত্রিকা' কাগজখানা অতি সুন্দরভাবে বেরিয়েছিল। যেমনি তার কাগজ, তেমনি ছাপা ও বহু ভাল ভাল প্রবন্ধ, গল্প, সপ্তাহের নানারকমের খবর থাকতো তাতে। স্যার যদুনাথ সরকার, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, নির্মলকুমার বসু, অমল হোম, মনোজ বসু, গোপাল ভট্টাচার্য (গবেষক বসু বিজ্ঞান মন্দির), হিরণকুমার সান্যাল (সিটি কলেজে আমার অধ্যাপক ছিলেন), চারুচন্দ্র চৌধুরী (আমার ভাসুর), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী প্রভৃতি প্রমুখ লেখকরা সকলে কাগজখানায় লিখতেন। উনিও অনেকগুলি প্রবন্ধ ও 'বলাহক নন্দী' নাম দিয়ে নক্সা লিখেছিলেন। আরও কাগজখানা বেশী চমকপ্রদ হয়েছিল অতিশয় সুন্দর নানারকমের ও নানাবিষয়ের শম্ভু সাহার তোলা ফটোগ্রাফগুলির জন্য। নূতন পত্রিকার ঐ কয়েক সংখ্যা আমি খুব যত্ন করে তুলে রেখেছি।

এর মাস দুয়েক পরে বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সুপারিশে ওঁর আরেকটা কাজ করে সামান্য কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাজপুতানায় 'সীতামৌ' বলে একটা ছোট রাজ্য আছে। সেখানকার মহারাজকুমার রঘুবীর সিং তাঁর ডক্টরেটের জন্য যে থিসিস্ করেছিলেন সেটাকে একটু বাড়িয়ে একটা বই হিসেবে বের করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে স্যার যদুনাথকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন

যে কাকে দিয়ে বইখানা সম্পাদনা করা যায়? স্যার যদুনাথ এঁর নাম বলে দিলেন। স্যার যদুনাথ ওঁকে খুবই স্নেহ করতেন এবং বরাবর আমাদের কাছে আসতেন। মহারাজকুমার বইটার নাম দিয়েছিলেন 'Malwa in transition'.

সব লেখালেখি করে কাজটা ঠিক হয়ে গেল। এর মধ্যে হঠাৎ একটা আশ্চর্যের ঘটনা ঘটে গেল। প্রায় মেজ ছেলে কীর্তিনারায়ণের জন্মাবার দিনের মতই। সেদিন আমাদের বাংলার নতুন বছরের দিন। সকালে বেলা সাড়ে আটটা, নটা নাগাদ আমি ওঁকে বলেছি 'দুত্তোর! আজ ১লা বৈশাখ, হাতে পয়সাকড়ি কিছুই নেই, ছেলে দুটোকে যে সামান্য কোন একটু মিষ্টি কিনে বা ভাল কিছু রেঁধে খাওয়াবো তারও উপায় নেই।' বলার প্রায় মিনিট পাঁচেক পরেই পোস্টম্যান একটি ৫০ টাকার মনিঅর্ডার নিয়ে এসে উপস্থিত। মহারাজকুমার লিখে পাঠিয়েছেন—'আমার বই সম্পাদনার কাজের জন্য আগেই আপনাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলাম।'

মহারাজকুমার অতিশয় সজ্জন মানুষ ছিলেন। একবার তিনি কলকাতায় এসে জানালেন যে আমাদের বাড়ি আসবেন, বইখানা সম্বন্ধে পরামর্শ করা দরকার। বিকেলে তিনি আসার পর চায়ের সঙ্গে নানারকম খাবার দিয়েছি খেতে। খেয়ে হাত ডুবিয়ে ধোবার জন্য পাশেই টেবিলের উপর একটা রূপোর বাটিতে জল রেখেছি। তিনি খাওয়ার পরই দেখি উঠে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকছেন। কোথায় যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন? করে পেছনে পেছনে যেতে যেতে দেখি রান্নাঘরের কোথায় একটি জলের কল ছিল সেটা খুলে হাত ধুয়ে নিলেন, হাত মুছবার জন্য তোয়ালে এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতমুখ মুছে নিলেন এবং অতি সাধারণ মানুষের মত তাঁর ব্যবহার ও সভ্য আচরণ দেখে আমরা খুবই মুগ্ধ হলাম।

॥ ৯ ॥
অভাবমোচন ও সচ্ছলতা

মহারাজকুমার রঘুবীর সিং-এর বই 'Malwa in transition'-এর কাজ করতে করতেই শ্রীযুক্ত অমল হোম মশায় আরেকটা কাজের প্রস্তাব নিয়ে একদিন সকালে আমাদের বাড়ী এলেন। বসবার ঘরে বসে তিনি কথাবার্তা বলছেন; আমি রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। নিমঝোল রেঁধে যেই ফোঁড়ন দিয়েছি অমনি অমলবাবু চেঁচিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলেন, বৌমা! বৌমা! কি রান্না হচ্ছে? এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। আমি কিন্তু এখুনি এসে আসন্-পিঁড়ি হয়ে খেতে বসে যাবো!

তাঁকে আর পাত পেড়ে আসন পেতে খাওয়ানো হয়নি, তবে বিদেশী প্রথায় ডিনার খাইয়েছি দিল্লী থাকাকালীন এবং খুবই খুসী হয়েছিলেন।

অমলবাবু এসে খবর দিলেন যে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' সম্রাট পঞ্চম জর্জের ২৫ বছর রাজত্ব পালন করা উপলক্ষে একটা রজতবার্ষিকী স্পেশাল বই নানা

রকম ছবি দিয়ে বের করবার মনস্থ করেছে। বিশেষ সাহায্যের জন্য অমলবাবু এই কাজটি নেবার জন্য ওঁকে অনুরোধ করলেন। বইখানা দুমাসে তৈরী করতে হবে। দু মাসে অবশ্য বইটা শেষ হলো না। সমস্ত বইখানা পুরো ছাপিয়ে বের হতে তিন চার মাস লেগে গেল। খুবই সুন্দর হয়েছিল বইখানা।

কলকাতা কর্পোরেশন দু মাসের বেতনের বেশী একটা বেশী দিনেরও পারিশ্রমিক দিতে রাজী হল না।

আমাদের ঠিক নীচের দোতলার ফ্ল্যাটে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার থাকতেন সেই সময়ে। তিনি, বেতার জগৎ বলে অলইন্ডিয়া রেডিও থেকে একটা কাগজ বের হতো, তার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শান্তিদি প্রায়ই বিকেলে এসে আমার সঙ্গে গল্পসল্প করে যেতেন। ওঁর কোন চাকরী নেই জেনে তিনি কেবলই উঠতে বসতে নলিনীবাবুকে বলতেন একজন এরকম উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত মানুষ আর তাঁর কিনা এই অবস্থা। আর কতগুলি অশিক্ষিত মূর্খ সব লোকেরা দিব্যি সুখে লুটেপুটে খাচ্ছে। শান্তিদির কথায় হঠাৎ নলিনীবাবুর খেয়াল হলো যে তাঁর বেতার জগৎ কাগজে এঁকে লেখার জন্য অনুরোধ করবেন। মাসে দুবার কাগজখানা বের হতো। নলিনীবাবু দুটো করে লেখা দেবার জন্য বললেন। প্রতিটা লেখার জন্য ৫ টাকা করে অর্থাৎ মাসে ১০ টাকা দেওয়া হবে। যা আসে তাই ভাল, এই মনে করে কাজটা নিয়ে নিলেন।

এই কাজটা করতে করতে ক্রমশঃ পরে 'অল ইন্ডিয়া রেডিওতে' বাংলায় আন্তর্জাতিক ব্যাপারের আলোচনা করবার ও তা রেডিওতে পড়বার ভার ওঁর ওপরেই এসে পড়লো। তখন থেকে একটা বেশ বাঁধা আয় সুরু হয়ে গেল।

এই কাজের ঠিক আগে অর্থাৎ ১৯৩৭ সনের জানুয়ারী মাসে পাটনা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন থেকে একটা আমন্ত্রণ-পত্র এলো। তাঁরা ওঁকে সেখানে সভাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে অন্যান্য লেখক সম্প্রদায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, বনফুল এঁদের সকলের একসঙ্গে ইন্টার ক্লাসে পাটনা যাবার খরচা পাঠিয়ে দিলেন। সকলে মহা উৎসাহে যাবার জন্য তোড়জোড় করছেন। যেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে সবার রওয়ানা হবার কথা, সেদিন সকালে হঠাৎ বিভূতিবাবু আমাদের বাড়ি এসে হাজির। নানারকম ব্যবস্থা করে সকলে তাঁকেও সঙ্গে নিলেন। এই কাহিনী এই অধ্যায়ের গৃহপ্রবেশ (৫) পরিচ্ছেদে লিখেছি।

ওঁর সময় হতো না বলে আমিই ছেলেদের নিয়ে এদিক ওদিক বেড়িয়ে আনতাম। দুটিই ছোট, একা বাসে ট্রামে চলার কিছু অসুবিধে হতো বলে ছেলেদের চাকর ধনুকধারীকে সঙ্গে রাখতাম। মাঝে মাঝে তাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নিয়ে সব জন্তু-জানোয়ার দেখিয়ে আনতাম, কখনও বা আউট্রাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে বসে গঙ্গার ওপরে বড় বড় বিদেশী জাহাজ নোঙর করে আছে, বা ছোট ছোট লঞ্চ সব যাওয়া-আসা করছে এসব দেখাতাম। কখনও বা কিছু খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে ঘুরে ফিরে রকমারি ক্যানা ফুলের ঝোপগুলির কাছে ঘাসের ওপর বসে সবাই মিলে স্যান্ডউইচ্ ইত্যাদি খেয়ে বিকেল নাগাদ বাড়ী ফিরতাম।

শ্যামবাজারে আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল 'দেশবন্ধু পার্ক'। সেখানে রোজ ভোরে ছেলেদের পাঠিয়ে দিতাম ধনুর সঙ্গে। ঘন্টাখানেক দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করে আসতো। বিকেলের দিকে আমি নিজে নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে। পার্কে গিয়ে আমি নিজে একটা বেঞ্চিতে বসতাম। ছেলেরা কাছাকাছি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতো। আমি যে বেঞ্চিতে বসতাম সেখানে শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার এসে প্রায়ই আমার পাশে বসে গল্পসল্প করতেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম কর্তা ছিলেন। তিনি শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবীকে 'মা' বলে ডাকতেন।

একদিন আমার বড় ছেলে ধ্রুবনারায়ণ, তখন তার বয়স তিন বছর হবে, খেলতে খেলতে হঠাৎ এসে আমায় বললো, 'মা ! আমরা যে এই ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘাসের ওপর খেলা করছি এতে ঘাসের ব্যথা লাগে না ?' এই শুনে শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবী একেবারে কেঁদে ফেললেন। কেবলই বলতে লাগলেন, ঐটুকু শিশুর কি প্রবল বুদ্ধি !

ছেলেদের বয়স যেমন বাড়তে লাগলো তাদের শিক্ষার জন্য কি করা যায় চিন্তা এসে গেল। প্রথম কিনলাম খুকুমনির ছড়া, রাঙাছবি, মোহনভোগ ইত্যাদি এবং সেগুলো থেকে ছোট, ছোট ছড়া সব মুখস্থ করতে শেখালাম। তারপর ছোটদের জন্য নানারকম গল্পের বই—'টুনটুনির বই', 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'হুক্কাহুয়া', 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ইত্যাদি কিনে রোজ সন্ধ্যেবেলা তারা ঘুমোতে যাবার আগে খানিকক্ষণ পড়ে পড়ে শোনাতাম। ক্রমশঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারতও পড়ে যেতে আরম্ভ করলাম।

তারপর এলো তাদের অক্ষর চেনাবার পালা। একদিন ওঁকে বললাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় কিনে আনবার জন্যে। কিন্তু ঐ বর্ণপরিচয়ের বদলে উনি নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগ। বইখানা নেড়ে-চেড়ে দেখলাম এতে প্রথম অক্ষর চেনাবার পদ্ধতি অন্যরকম। সে অনুযায়ী প্রথম ত লিখে সেই অক্ষর চেনাতে সুরু করলাম। ছেলেদের খড়ি কিনে দিয়েছিলাম। তারা প্রায়ই নীচে বসে মেঝেতে তাদের ইচ্ছেমত নানারকম হিজিবিজি কেটে ছবি আঁকবার চেষ্টা করতো। আমি সেই সঙ্গে খড়ি দিয়ে মেঝেতে ত বড় করে লিখে অক্ষর চেনাবার তালিম দিতে শুরু করলাম এবং লক্ষ্য করলাম বড় ছেলে ধ্রুবনারায়ণ খুব তাড়াতাড়ি সব আয়ত্ত করতে আরম্ভ করে দিল।

ক্রমশঃ আস্তে আস্তে অন্ধকার ভেদ করে ভোরের আলো দেখার মত আমাদের জীবিকার দীপশিখাও আবার জ্বলে উঠবার উপক্রম হলো। পাটনার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্বের প্রায় মাস দেড়েক পরে একটা কাজের প্রস্তাব এলো। কলকাতার খুব প্রসিদ্ধ ধনবান লাহা পরিবারের ডাক্তার সত্যচরণ লাহা তাঁর কিছু বক্তৃতা ইত্যাদি তৈরী করে দেবার জন্য সাহায্য করতে পারে এরকম কাউকে চাইছেন। ডক্টর লাহা নিজে স্বয়ং কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন এবং সে বছরে তিনি কলকাতার 'শেরীফ'-এর পদও পেয়েছিলেন। তিনি নিজে খুবই শিক্ষিত লোক ছিলেন।

ডাঃ লাহার কাজটা পেয়ে যাওয়াতে আমাদের খানিকটা বেশ সুরাহার মুখ দেখা গেল। দিনে এক ঘন্টার জন্য সেখানে ওঁকে যেতে হতো। প্রথম প্রথম কিছু সামান্য লেখার কাজ থাকলেও পরের দিকে দুজনে মিলে কেবল নানান্ বিষয়ে গল্প-সল্প করতেন। কাজ ছিলই না বলা চলে।

ডাঃ লাহা নানারকম পাখী পুষতেন। কলকাতার কাছে আগরপাড়ায় তাঁর একটা বিরাট বাগানবাড়ী ছিল এবং সেখানে বহু রকমারি পাখী তিনি পুষতেন। প্রতি শনি-রবিবারে তিনি ঐ বাগানবাড়ীতে গিয়ে থাকতেন। তাঁর কয়েকটা পক্ষিশালা দার্জিলিং ও হিমালয়ের পাহাড়ে অন্যত্রও ছিল। তিনি নানাজাতের পায়রা বহু জায়গা থেকে যোগাড় করতেন এবং এর জন্য বহু দূর দূর দেশে নিজেই গিয়ে অনেক দামী খানদানি পায়রা সব কিনে নিয়ে যেতেন।

আমরা মাঝে মাঝে তাঁর বাগানবাড়ীতে তাঁরই বিরাট গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যেতাম। তিনি নিজেই ঘুরে ঘুরে সব পাখী আমাদের দেখাতেন। আমরা যখন জাল দিয়ে তৈরী বড় বড় ঘরগুলি দেখে বেড়াতাম, সেই সঙ্গে আমাদের পেছন পেছন একটা চাকর পাখীর জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স হাতে করে ঘুরতো। পায়রা দেখাতে গিয়ে হঠাৎ একটা পায়রা দেখে চমকে উঠে বলতেন, 'মিসেস্ চৌধুরী ! শুনতে পেলেন কি ? পায়রাটা যেন কেমন করে কেসে উঠলো ! বেজায় কাসি হয়েছে এটার', বলে "নদারে, বাক্সটা দে ত ?" (চাকরকে নদা/নন্দ বলে ডাকতেন) বলেই তাড়াতাড়ি চাকরের হাতের অসুধের বাক্স থেকে একটা ছোট অসুধের গুলি বের করে পায়রাকে ধরে তার ঠোঁট ফাঁক করে খাইয়ে দিতেন। আবার মাঝে মাঝে কোনটাকে ধরে তার বুকটা আমার কানের কাছে ধরে বলতেন, "শুনুন, কি রকম হাঁপানি হয়েছে।" আমি ত কিছুই শুনতে পেতাম না, তবে শুনতে কিছু পাচ্ছি না বলে তাঁকে আর কিছু না বলে শুধু একটু হেসে মাথা নাড়তাম।

আমার পাখী, গাছপালা এসবের শখ দেখে তাঁর বাগানের ফুল, গাছ-গাছড়ার বিষয় নিয়েও বহু আলোচনা গল্প করতে আরম্ভ করতেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর কাজের বাইরে এসব শখের জিনিষ নিয়েই দিন কাটাতেন। তিনি আবার নানারকম বিলিতি কুকুরও রাখতেন। একবার তাঁর বাগানবাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম তিনি কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। তাঁর একজন কর্মচারী বললেন, তাঁর বিশেষ প্রিয় যে 'এয়ারডেল' কুকুর ছিল সেটা সেদিন সকালে একটা গোখরো সাপ শিকার করবার চেষ্টায় যখন তেড়ে যায়, তখন সাপটার কামড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ে। আরেকবার আমরা তাঁর বাগানবাড়ী যেতেই মহা উৎসাহে ইটালী থেকে আনানো মার্বেল পাথরের নতুন একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠবার জন্য করিয়েছিলেন ডেকে নিয়ে দেখালেন। আমরা গেলে পর প্রচুর পরিমাণ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও করতেন। ছেলেদেরও খুবই স্নেহ করতেন। একবার ছেলেরা বন্দুক দেখতে চাইলে উনি তাদের ডাঃ লাহার কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর শট-গান, রাইফল্, রিভলভার সবই ছিল। শোনামাত্র প্রত্যেকটার বাক্স খুলে খুলে ছেলেদের সবগুলো দেখিয়ে দিলেন।

একবার তাঁর বড়ছেলের বিয়ের সময় বহু লোকজনকে নেমন্তন্ন করেছেন খাওয়ার জন্যে। ওঁকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে যেন অবশ্য দুই ছেলেকে নিয়ে যান। দুপুরে ছেলেদের কাপড়জামা পরিয়ে ঠিক যাবার আগে আমি তাদের বলে দিলাম, "দেখো! বেশী খাবারদাবার নিয়ে নষ্ট করে ফেলো না, যেটুকু খেতে পারবে তাই থালায় নেবে।" সেই শুনে তিনবছরের কীর্তিনারায়ণ বলে উঠলো, হ্যাঁ! ওরকম করে খাবার নষ্ট করলে লোকে বলবে, "মা-বাবা কি কোনো শিক্ষে-দীক্ষে দেয়নি?"

ডক্টর লাহার এই কাজ পাওয়ার প্রায় মাস চারেক পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম মালিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশায় আমাদের বাড়ী এসে ওঁর খোঁজ করলেন। উনি বাড়ী ছিলেন না। এক টুকরো কাগজ চাইলেন। আমি তাঁকে একটা কাগজের প্যাড্ ও কলম দেওয়ার পর তিনি লিখে রেখে গেলেন, "নীরদবাবু, আগামীকাল আমার সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করতে আসবেন। বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে।" পরদিন বিকেল নাগাদ উনি সুরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবু বললেন, 'চলুন দেখি আমার সঙ্গে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বোস মশায়ের একজন সেক্রেটারীর দরকার। আমি বলে এসেছি আপনিই একমাত্র ঐ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন।'

শরৎবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক হয়ে গেল। কিছুদিন পর থেকেই উনি কাজে যাওয়া আরম্ভ করলেন। ওঁকে ঘুম থেকে উঠেই খুব ভোরে বেরিয়ে পড়তে হতো। আমরা থাকতাম শ্যামবাজার উত্তর কলকাতাতে, আর শরৎবাবুর বাড়ী ছিল দক্ষিণ কলকাতায় উডবার্ন পার্কে। দূরত্ব খুব বেশী। অত ভোরে কিছু খেয়ে যেতে পারতেন না বলে সকালের খাবার একটা টিফিনের বাক্সতে করে গুছিয়ে সঙ্গে দিয়ে দিতাম। দুপুরে বেলা একটা নাগাদ বাড়ী এসে খাওয়াদাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম করে আবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়তেন। বিকেল থেকে রাত নটা, দশটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো বলে শরৎবাবু বিকেলের জলখাবার ও রাত্রের খাওয়া তাঁর বাড়ীতেই সেরে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন সকাল বেলা উনি বসে বসে খাচ্ছেন আমি সঙ্গে যে রুটি, মাখন, ডিম ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছিলাম, তাই দেখতে পেয়ে শরৎবাবু বললেন, 'ওকি! আপনি বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে এসে খাচ্ছেন? ওসব হবে না। কাল থেকে সকালেও আপনি এখানেই খাবেন।'

এরপর থেকে দুপুরের খাওয়া শুধু বাড়ীতে খেতেন। ১৯৩৭এর জুলাই মাস থেকে শরৎবাবুর কাজ আরম্ভ করেন।

তার মাস চারেক আগে থেকে ডক্টর লাহার কাজও করছিলেন। এ ছাড়া অল ইন্ডিয়া রেডিওতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা গিয়ে বক্তৃতা করে আসতে হতো। এই এতগুলি কাজ পড়ে যাওয়াতে ছেলেদের দেখাশোনা, এদিক ওদিক নিয়ে বেড়ানো, সব দেখানো ইত্যাদির পুরো ভার আমার ওপর পড়লো।

ছেলেরা বড় হতে আরম্ভ করেছে ; তাদের কি করে ভালভাবে শিক্ষা আরম্ভ করা যায় সেজন্য পঞ্চাশ টাকার 'মডার্ন টিচিং' চার ভল্যুমের বই পাঁচ টাকা ইনস্টলমেন্টে

আমায় কিনে দিলেন। ওঁর তদারকে আমি নিজে বইগুলি পড়ে ছোটদের পড়ানোর পদ্ধতি আয়ত্ত করে অল্প করে করে ছেলেদের পড়ানো সুরু করলাম। ছবি আঁকার জন্য নানারকম রঙীন পেন্সিল, চক (খড়িমাটি), দুটো বড় ব্ল্যাকবোর্ড, কাগজ কাটবার জন্য মুখ ভোঁতা কাঁচি, মডেলিং অর্থাৎ নানারকম জিনিস হাতে গড়বার জন্য নানা রং-এর প্ল্যাস্‌টিসিন ইত্যাদি সব কিনে নিলাম। সেগুলো নাড়াচাড়া করে আমি নিজে ছবি আঁকতে, কাগজ কাটতে আরম্ভ করলাম। তাই দেখে দেখে ছেলেরা নিজেরা আমায় অনুকরণ করে তাদের ইচ্ছে মত ছবি আঁকা, কাগজ কাটা বা প্ল্যাস্‌টিসিন দিয়ে কিছু গড়বার চেষ্টা করতে আরম্ভ করলো।

এরপর আরও দাম দিয়ে কিনে দিলেন আরও পাঁচ ভল্যুমের 'প্র্যাকটিক্যাল ইনফ্যান্ট টিচার' আরেক রকমের বই। তাতে ছোট শিশুদের প্রচুর গল্প এবং কিভাবে অক্ষর চেনানো, প্রথম এক, দুই ইত্যাদি শিখিয়ে যোগ, বিয়োগ আরম্ভ করতে হয়, সব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা ছিল নানারকম ছবি দিয়ে। বইগুলিতে ছবি এঁকে এঁকে শেখানোর পদ্ধতি পড়ে আমি নিজের হাতে সাদা কার্ড কিনে তাতে এক পিঠে বাংলা অক্ষর লিখে, অন্য পিঠে রং দিয়ে একটা জিনিসের ছবি আঁকতাম যেটার নামের প্রথম অক্ষর অন্যপিঠের ছবির নামের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে মিলে যেতো। দেখলাম ঐ নিয়মে প্রথম পড়া আরম্ভ করা খুব সহজ হয়। প্রতিদিন বিকেলে পার্কে খেলাধূলা করে এলে পর ছেলেদের নিয়ে বসে ঘন্টা খানেক ছোটদের গল্পের বই বা নানারকমের ছোটদের কবিতার বই পড়ে শোনাতাম। তারপর সন্ধ্যায় তারা খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ধনুকে ইংরেজী শেখাতে বসতাম। তাকে খানিকক্ষণ পড়িয়ে নিজে বসে হয় ছেলেদের পড়াবার জন্য কার্ড ইত্যাদি আঁকতাম কিম্বা পড়াশুনা করতাম। ওঁর শরৎবাবুর বাড়ী থেকে ফিরে আসতে রাত সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে যেতো।

প্রায় সাড়ে তিনমাস শরৎবাবুর কাছে কাজ করার পর পুজো এসে গেল। সেই ১৯৩২ সনের নভেম্বর মাসের শেষে শিলং থেকে আসার পর থেকে ১৯৩৭ সনের অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা থেকে কোথাও বের হবার আর সুযোগ হয়নি। তাই পরামর্শ করে ঠিক করা গেল কাছাকাছি কোথাও কলকাতার বাইরে ঘুরে আসা যাক। আমার ছোট মামা রাঁচী থাকতেন। তিনি অনেকবার তাঁদের কাছে গিয়ে ঘুরে আসবার জন্য লিখেছেন কিন্তু নানারকম বাধা-বিপত্তি, টাকার অভাবে আর যাওয়া হয়নি। ছোট ছোট ছেলে নিয়ে অল্প কয়দিনের জন্য নতুন জায়গায় গিয়ে সংসার পাতা অনেক ঝামেলা বলে ছোটমামার কাছে রাঁচী যাওয়া ঠিক করে চিঠি দিলাম। যাচ্ছি খবর পেয়ে মামা, মামী, মামাতো ভাই পান্টু— নাম 'অমল' ও বোন গৌরী সবাই খুব খুসী।

রাঁচীর ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যায় ; দুপুরে সব জিনিসপত্র গোছ করে ধনুকে দিয়ে বিছানাপত্র হোল্ড অল্-এ ঢোকানো হচ্ছে, এসব দেখে উনি খুব চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এত মালপত্র, তারপর ছোট ছোট ছেলে সঙ্গে, পথে ট্রেন বদলানোর হাঙ্গামা, কি করে কি করবো !'

আমার ত এই কথা শুনে খুবই হাসি পেলো। মালপত্র কিছুই না, একটি মাত্র

ছোট এ্যাটেসিকেস্ ও একটি বিছানা মাত্র। আমরা ছাত্রী অবস্থায় শিলং কলকাতা করতে গিয়ে অনেক বেশী মাল নিয়ে বাস, ফেরী স্টীমার, মিটার গেজ ট্রেন, তারপর ব্রডগেজ ট্রেন এবং দুদিনের রাস্তা বছরে দুবার করে চলাফেরা করে অভ্যস্ত।

আমি ওঁকে বললাম, 'তোমার কিচ্ছু করতে হবে না। শুধু "মুড়ি"* স্টেশনে যখন গাড়ী বদল করতে হবে, তুমি ছেলে দুটোর হাত ধরে নাবিয়ে নিয়ে অন্য গাড়ীতে গিয়ে চড়ে বোসো, মালপত্র কুলীকে দিয়ে নেওয়া ইত্যাদি যা কিছু করার সব আমি দেখবো। আর ধনু ত সঙ্গে আছেই।' ধনুর ভরসা দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ধনুও রাঁচী স্টেশনে নামার পর কাঁদ-কাঁদ হয়ে এসে বললো, 'মা, "মুড়ি" স্টেশনে গাড়ী বদলের সময় অন্য গাড়ীতে আমার জুতো ফেলে এসেছি! আমি বললাম, যাক্ গে! এখন আর কি করা যাবে। রাঁচীর দোকান থেকে এক জোড়া জুতো কিনে নেওয়া যাবে।'

রাঁচী যাবার পথে মাঝরাত্তিরে জামসেদপুরে ট্রেন দাঁড়ায়। ন'দেওর টলু সেই সময়ে জামসেদ্পুরে টাটা কোম্পানীতে কাজ করতো। আগেই তাকে খবর দিয়ে রেখেছিলাম। রাত একটার সময় জামসেদ্পুর স্টেশনে পৌঁছে দেখি টলু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সে গাড়ীতে উঠে এসে বড় ছেলেকে একটা খেলনার ট্যাঙ্ক ও মেজছেলেকে সুন্দর একটা চাকাওয়ালা কাঠের হাঁস দিল।

মামা 'হিনু'তে রাঁচীর গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারে থাকতেন। বাসিন্দা প্রতিবেশী সবই বাঙালী। গিয়ে খোলামেলা চারদিকে সবুজ ঘাস, ঠান্ডা জায়গা, পরিস্কার বাতাস, বাড়ী থেকে অল্প দূরেই সুদূর ধানের ক্ষেত দিগন্ত পর্যন্ত মিলিয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি দেখে খুবই ভাল লাগলো। সকাল, বিকাল বহু দূর পর্যন্ত বেড়াতে যেতাম। কাছেই একটা আমবাগান ছিল। একদিন ঠিক করেছি আমবাগানে বেড়াতে যাবো, তাই শুনে ছেলেরা বেঁকে বসলো সেখানে ওরা কিছুতেই যাবে না। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললো, 'আমবাগানে বাঘ থাকে।' আমি অনেক বুঝিয়ে বললাম 'আমবাগানে বাঘ থাকে না।' তখন তারা বললো, 'তবে কেন আমাদের বই-এ লিখেছে? আমরা তাহলে ও বই আর পড়বো না।' এটা তারা ছোটদের জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা কোন বই-এ পড়েছিল।

বেড়াতে গিয়ে প্রায়ই আদিবাসীদের দেখতে পেতাম। শক্ত জোয়ান কালো আঁটাসাঁটা শরীর ওরাওঁ মেয়েরা, একটা শাড়ী প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে পরা, একটা কাঁধ খোলা, কানে রক্তজবা গোঁজা। তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে বলতে খিলখিল করে হাসতে হাসতে তাদের বাড়ীর দিকে যে যার গন্তব্যস্থানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে চলে যেতে থাকতো। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাতে বাড়ীর অল্পদূরে মাদলের আওয়াজ আর মেয়ে-পুরুষের গানের সুর শোনা যেতো। শুনলাম জ্যোৎস্না রাতে জঙ্গলে মেয়েরা ও পুরুষ মানুষরা মুখোমুখি লাইন করে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে গেয়ে নাচে। সেই গানের

* সে সময়ে 'মুড়ি' স্টেশন পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল-লাইন ছিল। 'মুড়ি' স্টেশনে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠে রাঁচী যেতে হতো।

সুরের একটা ভারী সুন্দর তাল থাকতো। বরীয়াতু বলে একটা পাহাড় ছিল, কোন কোনদিন আমরা ওটার ওপরে উঠতাম। 'জোনহা' জলপ্রপাতে আর আমি যেতে পারিনি। উনি ও পান্টু খুব ভোরে গিয়ে ঘুরে এসেছিলেন। সুবর্ণরেখা নদী বেশ দূরে ছিল বলে রিকশ করে সেখানে গেলাম। নদীতে তখন জল খুব কমই ছিল। ওঁরা সকলে হেঁটেই নদী পার হলেন, আমি শুধু মেজছেলেকে কোলে নিয়ে রিকশতে বসে রইলাম এবং রিকশওয়ালা গাড়ীটা টেনে নদীর জলের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

রাঁচীতে তিন সপ্তাহ থাকার পরেই শরৎবাবুর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য একটা চিঠি পেয়ে সপ্তাহ তিন পরেই আমাদের কলকাতায় ফিরে আসতে হোলো।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং শরৎবাবুর বাড়ীতেই হবার কথা। যে কয়দিন জুড়ে মিটিং হলো মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সকলে এঁরা শরৎবাবুর বাড়ীতেই থাকলেন। সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অন্যদের আরেকটি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হলো। শরৎবাবুর বাড়ী নানা রকমারি লোকে একেবারে জমজমাট। ওঁর কাছে একজনের এক একরকমের খেয়ালের গল্প শুনে হাসিও পেতো। বেচারী মিসেস্ বোসের অতিথি সেবা করতে গিয়ে নাকালের একশেষ।

মহাত্মা গান্ধীকে অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে একটা বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই 'বাপুজী সব মডার্ন যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন না' বলে বক্তৃতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। কিন্তু মজা হলো তাঁর ব্লাড্ প্রেসার বিশেষ উঁচুতে বলে তিনি মাথায় খানিকটা ঠান্ডা কাদামাটি দিয়ে রাখতেন এবং সেই মাটি রেফ্রিজারেটার-এর মধ্যে রেখে খুব ঠান্ডা করে নেওয়ার জন্য তাঁর কোন আপত্তি ছিল না।

মহাত্মা নিরামিষ খান্। রোজ খাবার ঠিক আধঘন্টা আগে তাঁর সেক্রেটারী জানাতেন সেদিন বাপুজী কি খাবেন। আধঘন্টার মধ্যে বাজার করে এনে রান্না করা সম্ভব না, সেজন্য বাড়ীতে রকমারি শাক-সবজী তরকারি সব কিনে এনে রেফ্রিজারেটার ভর্তি করে রাখতে হতো, কারণ জানা ত থাকতো না যে হঠাৎ কখন কোন্ তরকারী খেতে চাইবেন। রোজ সকালে ছাগলের দুধের সঙ্গে খানিকটা রসুনবাটা মিশিয়ে খেতেন। রোজ ভোরে ছাগলওয়ালা গোটা পনেরো-কুড়ি ছাগলী এনে বাড়ীর সামনে বেঁধে রাখতো। মহাদেব দেশাই সেই ছাগলের পালের সামনে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে পছন্দ করে দিলে সেই ছাগলের দুধ দুইয়ে নিয়ে মহাত্মাকে খেতে দেওয়া হতো।

উনি ত তাঁর কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে বড় ছেলের হলো জ্বর। সেজঠাকুরপো এসে ওষুধপত্র দেওয়াতে তিনদিন পর জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার একদিন বিকেল থেকে খুব জ্বর এলো এবং সন্ধ্যার সময় তার গলায় খুব ব্যথা হচ্ছে বল্‌লে। আমি তাকে কোলে বসিয়ে হাঁ করিয়ে গলায় টর্চ-এর আলো ফেলে দেখি তার টন্‌সিল দুটো বড় সাদা সাদা ফোস্কা মত হয়ে উঠেছে। আমার তখুনি সন্দেহ

হলো যে ছেলের গলায় ডিপথেরিয়া হয়েছে। আপিস থেকে এসে বিনুও কোথায় আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেছে। ধনুকে বললাম মেজছেলেকে রান্নার চাকরের কাছে রেখে শিগ্‌গিরি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে, ছোটবাবুকে (বিনু) খুঁজে আনুক। এই বল্‌তে বল্‌তেই বিনু হঠাৎ বাড়ী ফিরে এসেছে। তাকে বললাম, 'শিগ্‌গিরি তোমার সেজদাকে ফোন করে যত শিগ্‌গিরি হয় আসতে বলো এবং সঙ্গে করে একেবারে ডিপথেরিয়ার "সেরাম" নিয়ে যেন আসেন। মনে হচ্ছে ডিপথেরিয়ার লক্ষণ।'

মিনিট দশেকের মধ্যে সেজঠাকুরপো এসে দেখে ডিপথেরিয়া হয়েছে বলেই ধরলেন এবং সেরাম ইন্‌জেকশন দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মেজছেলেকেও এক ডোজ ডিপথেরিয়ার সেরাম ইনজেক্ট করে দিলেন যাতে তাকেও ঐ রোগে না ধরে।

এরপর বিনুকে বললাম, 'তোমার মেজদাকে ফোন করে জানিয়ে দাও যে এই ব্যাপার হয়েছে তবে যেন চিন্তা না করেন। চিকিৎসা সুরু হয়ে গিয়েছে।' এই খবর পেয়ে উনি একটু ব্যস্ত হয়েই সেদিন রাতে একটু আগেই বাড়ী এসে গেলেন কাজ থেকে।

বড়ছেলেকে নিয়ে আমি আলাদা ঘরে থাকি। দুদিনে সে একটু ভালোর দিকে গেল, কিন্তু মেজছেলে একদিন বিকেলে ধনুর সঙ্গে পার্ক থেকে বেড়িয়ে এসে বড় ছেলেকে নিয়ে যে ঘরে ছিলাম তার বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'মা ! আমার অসুখ করেছে।' আমি তাড়াতাড়ি ডিসিনফেকটেন্ট দিয়ে হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে তাকে কোলে নিয়ে গলায় টর্চ ফেলে দেখি তার গলার টনসিল দুটোও সাদা হয়ে উঠেছে। তখুনি সেজঠাকুরপোকে খবর দিতে তিনি এসে একেও আরেকটা সেরামের ইনজেকশন দিয়ে গেলেন।

দুটি ছেলের এই সাংঘাতিক অসুখ। আমি একা হাতেই তাদের সমানে সেবা করে যেতে থাকলাম। দুটিকে আমার দুপাশে শুইয়ে নানারকম শিশুদের গল্পের বই নিয়ে পড়ে শোনাতাম। গল্প শুনতে শুনতে তারা তাদের অসুখের গ্লানি ভুলে থাকতো। বড়ছেলে কয়দিন ভাল থাকার পর আবার তার গলায় ব্যথা হচ্ছে বলাতে দেখি তার টনসিল্ দুটো আবার সাদা হয়ে উঠেছে। খবর পেয়ে সেজঠাকুরপো একজন 'থ্রোট-নোজ স্পেসেলিস্ট' ও আরেকজন 'প্যাথোলজিস্টকে' নিয়ে এলেন। দুটি ডাক্তারই নানাভাবে পরীক্ষা করে গলা থেকে 'সোয়াব' নিয়ে গেলেন 'কালচার' করবার জন্য। ৪৮ ঘন্টা পরে বিশেষ গবেষণা করে দেখতে পেলেন যে ডিপথেরিয়ার বীজ একেবারে নষ্ট হয় নি। কিছুটা রয়ে গিয়েছে। তখন সেজঠাকুরপো আরেকটা ইনজেকশ্‌ন দিয়ে বলে গেলেন যে চব্বিশঘন্টা ছেলেকে চোখে চোখে খুব সাবধানে রাখতে হবে। এরকম সেরাম ইন্‌জেকশন সহ্য না হয়ে হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে যেতে পারে। আমি মনে মনে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে বিছানায় মশারীর নীচে বসে সারারাত জেগে কাটালাম। পরদিন সকালে ডাক্তার এসে দেখে বললেন, আর কোন ভয় নেই।

ক্রমে দুটি ছেলেই ভাল হয়ে উঠলো বটে, কিন্তু ১৯৩৮ সনের মার্চ মাস থেকে

আরম্ভ হলো মাসে একবার করে জ্বর ও সেইসঙ্গে টনসিল্ দুটো লাল হয়ে ফুলে উঠতো। মাস তিনেক এরকম চললো। সেজঠাকুরপো বললেন, ছেলে দুটোকে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার। ওঁর কাজের চাপের জন্য তাঁর পক্ষে আমাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমাকে একাই ছেলেদের নিয়ে যাওয়া কোথায় সম্ভব হবে চিন্তা করছি। হঠাৎ বললেন, টলুকে লিখে দাও সে জামসেদপুরে একটা ছোটবাড়ী ভাড়া নেবার চেষ্টা করুক। অন্ততঃ মাস দুয়েক সেখানে থেকে এসো।

সপ্তাহ দুয়ের মধ্যেই টলুর চিঠি এলো, একটা ছোটবাড়ী ১লা জুলাই থেকে পাওয়া গিয়েছে। সে শীঘ্রই কিছু দিনের ছুটিতে কলকাতা আসছে, ফেরার সময় আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। একটা ছোট সংসারের মত সব গোছগাছ করে নিয়ে ঠিক দিনে ছেলেদের নিয়ে টলুর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। সঙ্গে ধনুকেও নিয়ে গেলাম। আমাদের গাড়ীতে তুলে দেবার জন্য উনি এবং বিনু দুজনেই হাওড়া স্টেশনে গেলেন। আমরা সব গুছিয়ে গাড়ী ছাড়বার অপেক্ষা করছি এর মধ্যে এক ভদ্রলোক একটা কাঠের বাক্স নিয়ে এসে গালুডি স্টেশনে সেটা বাদলবাবুকে দিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। এঁর বৃত্তান্ত 'বিভূতিবাবুর স্মরণে' যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম তাতে বিশদ ব্যাখ্যা আছে।

আমাদের গাড়ী বিকাল ৩টায় জামসেদপুর পৌঁছবার কথা কিন্তু তার ঘন্টাখানেক আগে একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী থেমে গেল। ড্রাইভার যত ইঞ্জিন চালাবার চেষ্টা করে, ট্রেনটা তত সামনের দিকে না চলে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো। এমনি করে কতক্ষণ কসরতের পর জামসেদপুরে টেলিফোন করে সেখান থেকে অন্য ইঞ্জিন আনিয়ে আমাদের গাড়ীতে জুড়ে দেবার পর ২ ঘন্টা দেরী করে বিকাল ৫টার সময় জামসেদপুর পৌঁছলাম।

বাড়ীতে পৌঁছে মালপত্র সব নাবানো হচ্ছে, এর মধ্যে এক ভদ্রলোক তাঁর গাড়ী চালিয়ে এসে নেমে আমায় দেখে হাস্তে হাস্তে 'বৌদি' বলে সম্বোধন করে প্রণাম করলেন। টলু পরিচয় করিয়ে দিল—'ইনি হচ্ছেন আমাদের "শৈলেনদা"।' সম্পর্কে দেওর, শ্বশুরমশায়ের মামাতো ভাইএর ছেলে। জামসেদপুরে নিজেই ক্লিনিক খুলে ভাল ডাক্তারী করতেন।

জিনিসপত্র নামিয়ে তাড়াতাড়ি স্টোভ জ্বেলে সবাইকে চা ইত্যাদি করে খেতে দিলাম। খাবার-দাবার সব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম দু দিনের মত। সেদিন সন্ধ্যায় আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করতে টলু বারণ করলো। বললো, তার মেস্ থেকে খাবার নিয়ে আসবে। শুধু ছেলেদের জন্যে স্টোভে ভাতেভাত রেঁধে খাইয়ে দিলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নামলো অসম্ভব জোরে বৃষ্টি। শিলং ছাড়ার পর এত জোরে বৃষ্টি পড়তে আর দেখি নি। বাড়ীটা ছিল একতলা। মনে হল বৃষ্টিতে চারদিক যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পরদিন ভোরে উঠে চারদিক খোলামেলা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর নীল আকাশ,

রোদে ঝক্‌ঝক করছে দেখে খুবই ভাল লাগলো। শোবার ঘর ও রান্নাঘরের মাঝখানে বাড়ীর ভেতরে বিরাট উঠোন—দুটো তিনটে পেয়ারা ও লেবু গাছ এদিকে ওদিকে, একধার দিয়ে বেলফুলের ঝোপ, সন্ধ্যামালতী ও ছোট ছোট সূর্যমুখী ফুল ফুটে আলো হয়ে আছে। বাড়ীর বাইরে ঘাসের লন্। বাড়ীটায় শুধু দুখানা ঘর ও বারান্দা ছিল। ভেতরের ঘর আমি নিলাম ও বাইরের দিকের ঘর টলু নিল। ধনু টলুর ঘরের এক কোণায় রাতে আশ্রয় নিত।

সকালের মধ্যেই জিনিসপত্র খুলে নিয়ে ঘরখানি বেশ গুছিয়ে ফেললাম। বিকেলের দিকে শৈলেন ঠাকুরপো এসে ঘরের রূপ একেবারে বদলে গ্যাছে দেখে তো ভীষণ খুশী। কয়েকটা ফুল তুলে এনে ঘরের কোণে একটা টিপয়ের ওপর ফুলদানীতে করে সাজিয়ে রাখলাম। জানলা, দরজায় সেই সঙ্গে পর্দাও ঝুলিয়ে দিলাম। তার পরদিন শৈলেন ঠাকুরপো, তাঁর মা—সম্পর্কে আমার খুড়ীশাশুড়ী হন, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। বৃদ্ধা এসে গল্পসল্প করতে করতে হঠাৎ কলকাতার দু' একটি মেয়ের নাম উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌমা! তুমি কি এদের চেন? শৈলেনের সঙ্গে এই মেয়েদের কারো সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাব করলে কেমন নয়?'

টলু সেখানেই বসে ছিল, সে তখুনি বলে উঠলো, 'কাকীমা! কেন বাইরের মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? ঘরেই ত বি-এ পাশ মেয়ে আছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?' টলু বললো, 'কেন! মেজবৌদির ছোটবোন। এনার সঙ্গে শৈলেনদার বিয়ে ঠিক করে ফেলুন, দেখতে সুশ্রী, বি-এ পাশ, কাজেকর্মে সব বিষয়ে অতিশয় দক্ষ।'

এই শুনেই খুড়ীশাশুড়ী আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই নাকি বৌমা? তবে কি তোমার বোনের একটা ফটোগ্রাফ দেখাতে পারো!' আমি বললাম, 'আচ্ছা! মা, বাবাকে লিখে দিচ্ছি।'

রাতে বসে বাবাকে সব জানিয়ে চিঠি দিলাম ও পুঁটুর একখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেবার জন্য লিখলাম।

ছুটিছাটার দিনে টলুর সঙ্গে ছেলেদের নিয়ে জামসেদপুরের এদিক ওদিক বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম। রোজ বিকেলে টলু তার কারখানা থেকে ফিরে এলে আমরা বাড়ীর বাইরে ঘাসের লনের ওপর চেয়ার পেতে বসে গল্পসল্প করতাম, ছেলেরা পাড়ার আরও ছেলেমেয়ে জুটিয়ে ওখানেই খেলাধূলা করতো। শৈলেন ঠাকুরপোও তাঁর ক্লিনিক কাছেই ছিল, বন্ধ হলে পর এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

বাড়ীটা ছিল এক সদ্য-বিধবা উকিলের স্ত্রীর বাড়ী। আমাদের পাশে আরেক পরিবার যাঁরা থাকতেন অতিশয় ভদ্র মানুষ ছিলেন। কিন্তু বাড়ীর অন্য পাশের প্রতিবেশী ছিলেন একেবারে পুরোনো কালের কূপমণ্ডুক। আমাকে বাড়ীর বাইরে লনে বসে টলু ও শৈলেন ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করতে দেখে ঠাউরে বসলেন যে আমি একেবারে অন্য শ্রেণীর স্ত্রীলোক। যে মহিলার বাড়ীতে থাকতাম একদিন হাসতে হাসতে তিনি আমাকে ঐ গল্পটা বলেছিলেন। একদিন তাঁকে ডেকে নিয়ে ঐ ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? আপনি একজন খারাপ চরিত্রের

স্ত্রীলোককে আমাদের এই ভদ্রপাড়ায় এনে বাড়ী ভাড়া দিয়েছেন? আমরা সকলে আপনাকে একঘরে করবো।' তখন যাঁর বাড়ীতে ছিলাম সেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'চুপ! চুপ! কাকে কি বলছেন? ইনি রীতিমত লেখাপড়া শেখা উচ্চশিক্ষিতা নাম করা উঁচু ভদ্রপরিবারের মেয়ে এবং বৌ। আমরা এঁর কাছে কোন্ ছার! আপনি কার নামে এসব নিন্দাবাদ দেবার চেষ্টা করছেন? ভবিষ্যতে আপনি মিসেস্ চৌধুরীর নামে একটা টুঁ শব্দ করবার চেষ্টা আর করবেন না। এসব নিন্দা প্রচার করলে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন!'

এরপরে তাঁর ব্যবহার বদলে গেল। কয়দিন পরে হঠাৎ একদিন সেই বাড়ীরই একটি ছোটমেয়ে এক বাটি প্রসাদ নিয়ে এসে বললে, 'মা সত্যনারায়ণের সিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্য।' আমার ওসব পূজো-আর্চায় বিশ্বাস নেই। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে নিলাম বটে, তবে পাশের বাড়ীর ঝিকে ডেকে দিয়ে দিলাম। তারপর আমাদের বাড়ীর গিন্নীকে সব ব্যাপারটা বললাম। তিনি ত হেসেই অস্থির।

ইতিমধ্যে বাবা পুঁটুর একখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিলেন। সেই ফটোগ্রাফ দেখে ত মা ও ছেলে (খুড়ীশাশুড়ী ও শৈলেন ঠাকুরপো) দুজনেরই খুব পছন্দ হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ পুঁটুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলবার জন্য বাবাকে চিঠি দিলেন। উত্তরে এই প্রস্তাব পাকাপাকি হয়ে গেল এবং ঠিক হলো আমি যখন সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা ফিরবো খুড়ীশাশুড়ী আমার সঙ্গে গিয়ে নিজে পুঁটুকে আশীর্বাদ করে অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বরে) বিয়ে হবে। বাবাও সব কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

ছেলেদের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি দেখা যেতে লাগলো। কিন্তু আমার কলকাতায় ফিরে চলে যাবার জন্য মনটা উড়ু-উড়ু। ওঁকে লিখলাম, পরে উনি বিনুর সাতদিন ছুটি করিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। সাতদিনের জন্য বিনু এসে ঘুরে গেল।

জামসেদপুর থেকে ফেরার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো। টলু বললো, জামসেদপুরের আসল জিনিসই ত এখনো দেখা হয়নি। এই বলে একদিন টাটা স্টীল প্ল্যান্ট দেখতে যাবার জন্য 'পাশ' করিয়ে নিয়ে এলো। ঐ স্টীল প্ল্যান্ট দেখে ত হতভম্ব হয়ে গেলাম। কোন কোন জায়গায় চুল্লীর ভিতরে বড় বড় টবে করে খনি থেকে তোলা মাটি মেশানো লোহার ডেলা সব গালিয়ে মাটি আলাদা করে ঐ টকটকে লাল গলা লোহা মোটা স্টীলের তারে ঝুলিয়ে এক ধার থেকে কারখানার অন্য ধারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে কলের সাহায্যে গলা লোহাকে কড়ির ছাঁচে ঢেলে দিয়ে কড়ি তৈরী হচ্ছে এবং ঐ গলা ছাঁচে ঢালা কড়ির ওপর জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে শক্ত করা হচ্ছে। কিছু ঠান্ডা হয়ে এলে সমানে রেলের লাইনের ওপর দিয়ে গাড়ী চলার মত করে বেরিয়ে এসে সারি দিয়ে স্তূপীকৃত করা হচ্ছে। সমস্ত কারখানার এই লোহা তৈরীর পদ্ধতি দেখে যেমন আশ্চর্য হতে হয়, তেমনি একটা আতঙ্কও হয়। শুনেছি অনেক সময় ঐ সব গলন্ত লোহার টব স্টীলের তার থেকে ছিঁড়ে টগবগে লোহা লোকের উপর পড়ে নানারকম অপঘটনও ঘটে।

জামসেদপুরে যে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছিলাম সেই বাড়ীটার উঠোনটা একটা বেড়া

দিয়ে অন্য অর্ধেকটা ভাগ করা ছিল। একধার দিয়ে যাওয়া আসা করা যেতো দুইবাড়ীতে। ঐ ভদ্রমহিলার একটা প্রকাণ্ড দিশী কালো কুকুর ছিল। কুকুরটাকে সবাই 'টাইগার' বলে ডাকতো। ছেলেরা তাকে হান্টলী পামার্সের বার্লির বিস্কুট খাইয়ে খাইয়ে খুব বশ করে ফেলেছিল। কিছুদিন ওবাড়ীতে থাকার পর লক্ষ্য করলাম রোজ ভোরে কে আমার শোয়ার ঘরের উঠোনের দিকে দরজার কড়া নেড়ে শব্দ করে। প্রথম প্রথম ভাবতাম বোধহয় দুধওয়ালা পাশের বেড়া দিয়ে এসে রান্নাঘরে দুধ রেখে জানিয়ে যায় কড়ার শব্দ করে। পরে দেখলাম, না! দুধওয়ালা ত সাড়ে সাতটার আগে আসে না। অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতাম কে এমন করে দরজার কড়া নাড়ে? একদিন ভোরে কড়ায় খট্‌খট্‌ শব্দ হওয়া মাত্র দৌড়ে দরজা খুলেই দেখি কুকুরটা আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে ঢুকে অন্য দরজার কাছে গিয়ে বাইরে রাস্তায় যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর আবিস্কার করলাম টাইগার মশায় দেখেছে যে দু'বাড়ীর লোকেদের মধ্যে আমিই সকলের আগে ভোরে উঠি এবং আমার শোবার ঘরের ভেতর দিয়েই তার পক্ষে বাইরের রাস্তায় যাওয়ার ভাল পথ। কুকুরটা রোজ সকালে তার সামনের পা তুলে কড়া নেড়ে যেতো : মনে হতো মানুষেই কড়া নাড়ছে।

ফেরার দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে ভাবলাম ছেলেরা পাড়ায় যত বন্ধুবান্ধব জড়ো করেছিল একদিন সবাইকে খাইয়ে দিই। আমরা ফিরে যাচ্ছি শুনে ছেলেমেয়েদের খুব মন খারাপ। আমার শোবার ঘর তাদের আড্ডা দেবার আস্তানা হয়েছিল। দশ বারোটি ছেলেমেয়ে, বয়স তাদের বছর পাঁচ, চার থেকে আট নয় পর্যন্ত। সবাই খুব সেজেগুজে খেতে এসেছে। আসন পেতে কলাপাতা কেটে এনে তাতে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে দেখেই তারা বলে বসলো নেমন্তন্ন খেতে এসেছি। খাওয়ার আয়োজন করেছিলাম লুচি, ছোলার ডাল, আলুরদম, মাছের ফ্রাই, পায়েস ও ক্ষীরের মালপোয়া। তাদের খাওয়া দেখে খুবই আনন্দ হলো। ঐটুকু সব ছেলেমেয়েরা খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, 'খেয়ে দেখ্! কি ভালো হয়েছে, একেবারে বিয়ে-বাড়ীর রান্না। আলুর দম না ত রে-মনে হচ্ছে যেন মাংস খাচ্ছি।'

এরপর একদিন শৈলেন ঠাকুরপোর বাড়ীর সবাইকে এবং টলুর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে ডেকে বৈকালিক জলযোগের সঙ্গে বিদায়-এর পর্ব সেরে নিলাম।

আমাদের রওয়ানা হবার দুদিন আগে উনি বিনুকে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যাবার জন্যে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আমরা বিনুর সঙ্গে কলকাতা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে খুড়ীশাশুড়ী ও তাঁর এক অবিবাহিত মেয়েও কলকাতা এলেন। পরদিন বিকেলে তাঁদের নিয়ে ভবানীপুরে মা, বাবার কাছে গেলাম। তিনি সেদিনই পুঁটুকে দেখে আশীর্বাদ করে অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ের তারিখ ঠিক করে জামসেদপুর ফিরে গেলেন।

দুমাসে বাইরের পরিষ্কার আবহাওয়াতে ছেলেদের স্বাস্থ্যের বেশ ভাল উন্নতি হয়েছিল। এরপর আর কোন উপদ্রব তাদের গলায় হয়নি।

জামসেদপুর থেকে ফিরে এসে দেখলাম চতুর্থ দেওর হিরু তেল তৈরী করবার ঘানি ইত্যাদি মেশিন কিনে যাদবপুরে একটা ফ্যাক্টরী খুলেছে। মাঝে মাঝে হিরু তার ফ্যাক্টরীর ঘানিতে তৈরী একেবারে তাজা সর্ষের তেল পাঠিয়ে দিত। একদিন সবে ঘুম থেকে উঠেছি, হঠাৎ দেখি হিরু তার বড় ছেলের হাত ধরে এবং মেয়েকে কোলে নিয়ে এসে হাজির। বললে, 'দেবীকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে দিয়ে এসেছি, সে বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত এ দুটোকে আপনি রাখুন।' হিরুর ছেলে চিনু (চিন্ময়) আমার বড় ছেলে ধ্রুবর এক বছরের ছোট ছিল এবং মেয়ে উত্তরা মেজছেলে কীর্তিনারায়ণের ছয়মাসের ছোট ছিল। শিশুকালে উত্তরার পোলিও হওয়াতে সে হাঁটাচলা করতে পারতো না। হিরুও আমাদের কাছে রাত্তিরে এসে থাকতো। দেবীর আরেকটি মেয়ে হলো। দশদিন পরে সে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর হিরু সবাইকে নিয়ে যাদবপুরের বাড়ী ফেরৎ গেল।

কিছুদিন পর একদিন খুব সকালে উনি আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর দাদার বাড়ী বালিগঞ্জে ভোভার লেনে বেড়াতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে আমাদের সেখানে রেখে নিজে কাজে চলে গেলেন এবং ঠিক হলো দুপুরের পর ধনুকে শ্যামবাজার থেকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্য।

আমাদের দেখে আমার ভাসুর খুব খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি নিজেই বাজারে গিয়ে দুপুরে খাওয়ার জন্য একটা হাঁস কিনে নিয়ে এলেন। বড় জা খুব ঘটা করে হাঁস রান্না করলেন।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার একটু পরে আমার জা বললেন, 'অমিয়া! চলো আমরা যাদবপুরে হিরুর তেলের কারখানা ও দেবীর মেয়ে দেখে আসি।' এরই মধ্যে ধনু আসতেই বলে দিলেন, 'তুই বাড়ী ফিরে যা। তোর মা ও ছেলেদের আমি শ্যামবাজার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবো।' এই বলে একটা রিকশ ডাকালেন ও আমরা দুজনে তাতে চেপে দুই ছেলেকে দুজনে কোলে তুলে নিয়ে আর কৃষ্ণাকে পায়ের কাছে বসিয়ে যাদবপুরে রওয়ানা হলাম। তখন শরৎকাল, শহর ছেড়ে যাদবপুরের কাছাকাছি রাস্তা দিয়ে যখন চলেছি, দুধারে দেখি বহুদূর পর্যন্ত কেবল কাশ আর কাশ, একেবারে কাশবনে সাদা হয়ে চারিদিকে কি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য হয়ে আছে। আমি ত একেবারে অভিভূত হয়ে আছি। মাথার ওপরে পরিষ্কার নীল আকাশ, মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মত থোকা থোকা মেঘ ভেসে চলেছে আর নীচে ঐ কাশবন। হঠাৎ মাঝ রাস্তায় ঘটাং করে উঠলো এবং সাংঘাতিক ভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে তাকিয়ে দেখি আমাদের রিকশটার একটা চাকা খুলে গিয়ে রাস্তার ধারে কাশবনে গিয়ে পড়লো, আর রিকশওয়ালা তার গায়ের জোরে একদিকের চাকায় আটকে কোনরকমে আমাদের ছিটকে পড়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোনক্রমে রিকশ থেকে নেমে আমরা পথের ধারে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলাম।

এই জনমানবশূন্য জঙ্গলে জায়গা, তায় তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাই, কি করি। দুই জায়ে পড়লাম ভীষণ দুশ্চিন্তায়। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে এক একটা গাড়ী শোঁ করে যাদবপুরের দিক থেকে বালিগঞ্জের দিকে আসছে দেখে দিদি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে সেই গাড়ী থামাতে লাগলেন এবং তাদের অনুরোধ করতে লাগলেন, কেউ যদি দয়া করে আমাদের যাদবপুর পৌঁছে দেন। সকলেই প্রায় কলকাতার দিকে যাচ্ছেন এবং তাঁদের দেরী হয়ে যাবে বলে তাঁরা রাজী হলেন না। বেলা পড়ে আসছে। অসহায় অবস্থায় বসে বসে ভাবছি কি উপায় হবে। এর মধ্যে হঠাৎ দিদি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'আঃ ! বাঁচা গেল, ধনদাদার গাড়ী আইতেছে।' গাড়ীটা দিদির মেজভাই শ্রীযুক্ত সুরেন রায়ের। সুরেনবাবুর 'বেঙ্গল ল্যাম্প' ফ্যাক্টরী ছিল যাদবপুরে, তিনি থাকতেনও সেখানে। গাড়ী থামিয়ে দিদি ড্রাইভারকে যাদবপুর পৌঁছে দিতে বললেন। সে বললে, 'আমি বালিগঞ্জে এই চিঠিটা দিয়ে দশমিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে আপনাদের পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমাদের দেখে ত হিরুর খুব উত্তেজিত অবস্থা। ঘুরে ঘুরে তার কারখানার সব দেখিয়ে তার বাড়ী নিয়ে গেল। দেবীও আমাদের দেখে বেজায় খুশী। সে ওদিকে বিকেলে চায়ের যোগাড় করতে লাগল। আমি বাড়ীর চারদিকে খোলা জঙ্গল দেখে খুব আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কলাগাছের ঝাড়, নারকেল গাছ, আকন্দ ফুল এসবের পরিবেষ্টনীতে যেন একটা অন্য জগৎ মনে হতে লাগলো। এই পাড়াগাঁ মত জায়গা দেখে থেকে থেকে মনে হচ্ছিল তাহলে কি বিভূতিবাবুর নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম এরকমই ছিল ? ঝোপঝাড়ের মধ্যে হয়ত তাঁর সেই অতিপ্রিয় ঘেঁটুফুল ও বনকলমীও ছিল, কিন্তু আমি পাহাড়ে তায় আবার শহরে থেকে আমি ত আর সে সব চিনি না।

চা, খাবার খেয়ে সবাই গল্পসল্প করছি, হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি উত্তর দিক থেকে সাংঘাতিক ঘন কালো মেঘ উঠে আসছে। মেঘ ওঠা দেখে কৃষ্ণা ও ধ্রুব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আওড়াতে লাগলো—

উত্তরেতে মেঘ করেছে, গরু বেড়ায় উড়ে
পেয়াদা বেটা পাক বেঁধেছে সরু ধানের চিঁড়ে।

দেখতে দেখতে আকাশ চিরে চিরে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, এবং সঙ্গে ভীষণ ভাবে কড় কড় করে বাজ পড়ার শব্দ। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়া সুরু হলো। বৃষ্টি সমানে উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো। থামবার কোন লক্ষণই নেই। এত বৃষ্টিতে বালিগঞ্জে বা শ্যামবাজারে ফেরার কোন উপায় নেই। সন্ধ্যেবেলা ওখানেই খাওয়াদাওয়া সেরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো। দিদি তবু একটা চিঠি লিখে তাঁর ধনদাদা সুরেনবাবুর কাছে হিমাংশুর হাতে (হিমাংশু দেবীর একভাই, হিরুর সঙ্গেই থাকতো) পাঠিয়ে দিলেন। সুরেনবাবু রাত এগারোটার পর বাড়ী ফিরে চিঠি পড়ে তক্ষুনি গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। গাড়ী এসেছে শুনে দিদি ত লাফ দিয়ে মশারীর নীচ থেকে বেরিয়ে বললেন, 'চলো অমিয়া। বাসায় যাই গিয়া।' আমি বললাম, 'না রে বাবা !. শুয়ে

পড়েছি, আমি আর উঠছি না। এত রাতে ছোট ছোট ছেলেদের টেনেহেঁচড়ে তুলে কোথায় নিয়ে যাবো? আমার কাছে আপনার ওখানে গিয়ে শোয়া আর এখানে ঘুমিয়ে থাকা একই কথা।' হিরু বললে, 'না! মেজবৌদি যাবেন কোথায়? যেমন শুয়ে পড়েছেন, ঘুমিয়ে থাকুন। কাল সকালে আমিই শ্যামবাজারে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।' পরদিন সকালে উঠে চা ইত্যাদি খেয়ে নয়টার ট্রেনে যাদবপুর থেকে শিয়ালদহ পৌঁছে, একটা গাড়ী করে শ্যামবাজারে বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম।

দুপুরে কাজ থেকে বাড়ী এসে উনি বললেন, 'ঐ অত বৃষ্টিতে যে ফিরে আসতে পারবে না তা আগেই মনে করেছি, তবে শেষ পর্যন্ত যে হিরুর বাড়ীতে রাত কাটাতে হয়েছে সেটা কখনও মনেই হয়নি। আমি ভেবেছি দাদার ওখানেই আটকা পড়ে গিয়েছ।'

দেখতে দেখতে পূজো এসে গেল। কিছুদিন পূজোর হিড়িক আর তারই সঙ্গে পুঁটুর বিয়ের উদ্যোগও চলতে লাগলো। বিয়েতে আমায় নিয়ে দু পক্ষ থেকেই টানাটানি। একদিকে নিজের বোন, অন্যদিকে সম্পর্কে দেওর। বিয়ের সব পরামর্শ ইত্যাদি একদিকে বাবা, মা যেমন জিজ্ঞাসা করতেন, অন্যদিকেও তেমনি জামসেদপুর থেকে ঘন ঘন চিঠি আসতে লাগলো।

অগ্রহায়ণ মাসের শীতে বিয়েবাড়ী গিয়ে কিছুদিন থাকতে হবে; আমার একটা লেপ করানো দরকার। বিলিতী সার্টিন সিল্কের লেপের খুব শখ ছিল আমার। আমার বিয়ের সময় দুটি দেওর স্বদেশী আন্দোলনে জেলে আছে বলে আমার ছোট ননদের এক ভাসুর বাবাকে পরামর্শ দিলেন যে দেশী জিনিস যেন দেওয়া হয়। তাই শুনে বাবা কিছু জিনিসপত্র দেশী কাপড় দিয়েই করিয়ে দিয়েছিলেন। এই গল্প শুনে পুঁটুর বিয়েতে যাতে আমার শখের লেপ নিয়ে যেতে পারি সেজন্য খুব সুন্দর একটা সিল্কের লেপ করিয়ে দিলেন। সেই লেপ নিয়ে ত পুঁটুর বিয়েতে ভবানীপুর গেলাম। কিন্তু প্রথম রাতেই শখের লেপখানা গায়ে দিয়ে শোয়ার ঘন্টা দেড়েক কিম্বা দুয়ের মধ্যেই কি দুর্দশাই না হয়ে দাঁড়ালো।

বিয়ের জন্য প্রকাণ্ড একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে মা, বাবা, দিদি সবাই একত্র হয়েছেন। ছোটমামা, মামীমা, পান্টু, গৌরী সবাই রাঁচী থেকে এসেছেন। আমি আমার নতুন লেপ নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে জড় হয়েছি। দোতলার বড় একটা হল-ঘরের একধারে একটা তক্তপোষ পেতে আমার ও মেজছেলের শোবার ব্যবস্থা হল। মেঝেতে উনি বড়ছেলেকে নিয়ে, ছোটমামা, মামাতো ভাইবোন সকলের সারি দিয়ে বিছানা পড়লো। এতগুলি লোকের জন্য মশারী টাঙানো অসুবিধা, তাই রাত্তিরে শোবার সময় সকলের পায়ের কাছে মশার ধূপ জ্বালিয়ে রাখা ঠিক হল। ধনুকে বললাম আমার খাটের নীচে পায়ের দিকে একটা মশার ধূপ জ্বেলে দিয়ে যেতে।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর হঠাৎ মাঝরাতে জেগে দেখি ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। শোবার সময় ছোটমামা ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন সবার ঠাণ্ডা

লাগবে মনে করে। আমি বললাম, এত লোক এক ঘরে ঘুমোচ্ছি, অন্ততঃ একটা জানালা খোলা থাক। ঘরময় ধোঁয়া দেখে ভাবলাম আবার বুঝি ছোটমামা জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং মশার ধূপের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গিয়েছে। আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম ওঁকে ডেকে যে 'জানালা একটু খুলে দাও।' উনি উঠে বললেন, 'জানালা ত খোলা।'

'তবে এত ধোঁয়া এল কোত্থেকে ?' এই বলে যেই আমার নতুন লেপ টেনেছি, খাট থেকে ঝুলে পড়েছিল দেখে, দেখি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। লেপের কোণা মশার ধূপের ওপর পড়ে আগে পিঁজে পিঁজে পুড়ে শুধু ধোঁয়া হচ্ছিল, নাড়া পড়তে একেবারে জ্বলতে আরম্ভ করলো।

সবাই ত জেগে আগুন ! আগুন ! বলে চেঁচিয়ে উঠেছে। উনি লাফ দিয়ে উঠে হাত দিয়েই চেপে চেপে আগুন নেবাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পাশের ঘরে মা, দিদি, পুঁটু, মামীমা সবই ঘুমোচ্ছিলেন। চেঁচামেচি শুনে সবাই দৌড়ে এসেছেন।

আগুন ! আগুন ! শুনেই দিদি দৌড়ে গিয়ে বাথরুম থেকে এক বালতি জল নিয়ে এসে হাজির। জল ছিঁটিয়ে আগুন নেবানো হল বটে কিন্তু লেপের তুলোর ভেতর আগুন গিয়ে নিবে নিবে তখনো ধোঁয়া দিয়ে জ্বলতে লাগলো। তাই দেখে মা তাঁর বিরাট বড় কাপড় ছাঁটার কাঁচি এনে কচ্‌কচ্ করে লেপের যে অংশ পুড়ছিল সেটা কেটে বালতীর জলে ফেলে দিলেন। সকলেই আহা, উহু করে সহানুভূতি জানালেন। কিন্তু আমার ঐ শখ করে করানো সিল্কের লেপ প্রথম রাতও পোহাতে পারল না। তার জন্য থেকে থেকে যে বুক ব্যথায় টনটন্ করতে লাগলো, বাড়ী সুদ্ধ এত লোকের সামনে মুখ বুজে সহ্য করে গেলাম। কয়েক ঘন্টা সিল্কের লেপ গায়ে দেওয়ার পরই শখটা একেবারে তলিয়ে গেল।

উনি আমার মনের অবস্থা অনুমান করে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে বললেন, 'আরেকটা সুন্দর লেপ করিয়ে দেব পরে।' তবে ওই ঘটনার পর আর কখনও সিল্কের লেপ গায়ে দেবার কোন ইচ্ছাই হয়নি। উল্টে সব সময়ে মনে হয়েছে, সেই রাত্তিরে আমি ও মেজছেলে জ্যান্ত পুড়ে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম।

সকাল বেলা বিনু শ্যামবাজার থেকে এসে লেপ পোড়ার কাহিনী শুনে আর আমাদের কিছু হয়নি জেনে কেবলই বলতে লাগলো—'রাখেন হরি ! মারে কে ?'

দুদিন পর পুঁটুর বিয়ে। সব কিছু সুন্দর খুবই সুশৃঙ্খলভাবে যোগাড় ব্যবস্থা হয়ে গেল। বিয়ের আগের দিন বিকেলের গাড়ীতে শৈলেন ঠাকুরপোরা তিন ভাই ও দুজন বন্ধু এলেন জামসেদপুর থেকে। তাদের থাকার ব্যবস্থা হলো মা, বাবাদের ফ্ল্যাটে। একদিকে কনের দিদি, অন্য দিকে বরের বৌদি, আমার অবস্থা কাহিল। বরযাত্রীর থাকা-খাওয়ার যাতে কোন ত্রুটি না হয় তার সব তদারকের ভার আমার ওপর পড়লো। ওদিকে কাকীমা বলে পাঠিয়েছেন গায়ে-হলুদের তত্ত্ব ইত্যাদি সব সুন্দর করে সাজিয়ে, প্রকাণ্ড মাছ কিনে তাতে সিঁদুর-ফোঁটা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে হুলুধ্বনি দিয়ে

শুভলগ্নে সকালে পাঠাবার জন্য যেন ব্যবস্থা করি। ভোরবেলা উঠে আমি বরের বাড়ীর লোক হয়ে এবাড়ী চলে এলাম। তারপর সব স্ত্রী-আচার করে গায়ে-হলুদের তত্ত্ব পাঠিয়ে আবার কনের বোন বলে বিয়ে-বাড়ীতে উপস্থিত হলাম।

সকাল থেকে বাড়ীতে প্রচুর লোকজন জড়ো হয়েছে। কেউ এটা করছে, কেউ সেটা করছে। উনিও সেদিন শরৎবাবুর কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন। নাপিত এসেছে, যার চুল ছাঁটা দরকার, দাড়ি কামানো দরকার সব করে দেবার জন্য। মা ওঁর মাথা ভর্তি লম্বা লম্বা চুল দেখে বললেন, 'বাবা! তোমার চুল দেখছি বেজায় লম্বা হয়েছে, নাপিত এসেছে, সুন্দর করে চুল ছাঁটিয়ে নাও গে।' একটু পরে দিদি হঠাৎ চেঁচামেচি করে বলে উঠেছেন, 'মা! তোমার পাগল জামাই-এর কাণ্ড দেখ গিয়ে। আরও ভাল করে ঐ পাগলাকে বোলো সুন্দর করে চুল ছাঁটিয়ে নাও!'

উনি করেছেন কি, নাপিতকে সকলের চোখের আড়ালে ছাদে এক কোণে ডেকে নিয়ে চুল একেবারে মুড়িয়ে ছাঁটিয়ে মাথা ন্যাড়া করে নীচে নেমে এসেছেন। মা দৌড়ে গিয়ে দেখে 'হায়! হায়!' করতে লাগলেন। আমি ত দেখে হাসবো কি কাঁদবো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না। পাছে আমি দেখতে পেলে বাধা দিই সেজন্য একেবারে আড়ালে এই কাণ্ড করেছেন। রাতে সব নিমন্ত্রিত সকলকে ঐ ন্যাড়া মাথার ওপরে ধামা ভর্তি লুচি পরিবেশন করছেন, আর ওঁকে দেখে সবাই বলাবলি করছেন, 'ইতিমধ্যে নীরদের খুব অসুখ করেছিল বুঝি? মাথা এভাবে ন্যাড়া কেন?' শুনি নি, শুনি নি ভান করে থাকতে হলো। কারণ বলতে পারলাম না, শাশুড়ীর হুকুমের জন্য তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা।

পুঁটুর বিয়ের সময় আমার দুই ছেলে করলো আরেকটা হাস্যাস্পদ কাজ। দুটিই ছিল তাদের ছোটমাসীর খুব ভক্ত। ছোটমাসীর বিয়ে শৈলেনকাকার সঙ্গে শুনছে কিন্তু ব্যাপারটা কি ঠিক ঠাউরে উঠতে পারছে না। তাদের ধুতি, পাঞ্জাবি পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি, ছোটমাসীর মত তাদের কপালেও চন্দন দিয়ে দিতে হয়েছে। বিয়ে গোধূলি লগ্নে। যখন সপ্তপদী হচ্ছে (আমাদের শ্রীহট্ট জেলায় হেঁটে বিয়ে হয়), তখন তারা ভাবলে এ আবার কি? তাদের ছোট মাসীর একি শাস্তি! দুটি ভাই গিয়ে পেছন থেকে পুঁটুর বেনারসীর শাড়ীর আঁচল মুঠো করে চেপে ধরে ফিঁ ফিঁ করে কাঁদছে আর সপ্ত প্রদক্ষিণের সঙ্গে সঙ্গে তারাও ঘুরছে। সকল লোকে চেঁচাতে লাগলো, 'আরে! আরে! এগুলো কি করে?'

সবাই কত ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতেই কিছু পারা গেল না। শেষ পর্যন্ত বিয়ের সর্বশেষ অনুষ্ঠান পর্যন্ত তারা তাদের ছোটমাসীর গা ঘেঁষটে বসে রইল।

পরদিন সন্ধ্যার ট্রেনে শৈলেন পুঁটুকে নিয়ে জামসেদপুর রওয়ানা হয়ে গেল। এর পর আমরাও যে যার সব গুটিয়ে বাড়ী-মুখো হলাম। কয়দিন জুড়ে সবাই মিলে একত্র হয়ে খুব হৈ-হল্লা করে এসে শ্যামবাজারের বাড়ীতে আবার সংসারের জীবনযাত্রায় কলুর ঘানি টানার অবস্থায় পড়লাম বটে, কিন্তু বেশ কিছুদিন সময় লাগলো আমার

সিল্কের লেপের শোক ভুলতে।

এই সময়ে এক রবিবার সকালে ওঁদের পুরোনো এক শালওয়ালা তার চাকরের মাথায় বিরাট এক গাঁঠরী চাপিয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত। সানাউল্লা (শালওয়ালার নাম) বরাবর শীতকালে কাশ্মীর থেকে নানারকমের শাল, আলোয়ান ইত্যাদি নিয়ে আসতো। তার প্রায়ই বাঁধা খদ্দের ছিল। যার যেমন পছন্দ সেই অনুযায়ী শাল, গরম কাপড় সবাইকে দিয়ে যেতো এবং তার দাম সে চার মাসের কিস্তিতে উসুল করে বৈশাখ মাসে দেশে ফিরে যেতো। সানাউল্লা তার পোঁটলা খুলে সব দেখাতে আরম্ভ করলে পর উনি বললেন, এখন ত সাধারণ গরম কিছুর দরকার নেই, তবে বেশ ভাল দামী শাল থাকলে দেখাও। আলাদা করে এক টুকরো কাপড়ে বাঁধা তিন-চারটে শাল ছিল। সানাউল্লা সেগুলো বের করতেই একখানা শাল দেখে আমরা সকলে বাঃ! বাঃ! করে উঠলাম। শালখানা সাদা দোরোখা পশ্মিনার, অতিশয় সূক্ষ্ম হাতের কাজে তৈরী। উনি বললেন, 'এই শালখানা তোমার জন্য রেখে দিচ্ছি!'

শালের দাম দেড়শো টাকা শুনে আমি ঘোরতর আপত্তি জানালাম। দেড়শো টাকা তখনকার দিনে অনেকগুলি টাকা। এত দামী শাল দিয়ে কি করবো? উনি বললেন, 'শালের দাম অনায়াসে চারমাসে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

কেনা না-কেনা নিয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছে আমাদের দুজনের মধ্যে, সানাউল্লা আস্তে করে সব শাল আলোয়ান ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখতে লাগলো। কখন যে ঐ ভাল পশমিনা শালখানা তার নিজের গায়ের চাদরের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল লক্ষ্য করি নি। সব বেঁধে-ছেঁদে চাকরের মাথায় পোঁটলা চাপিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম বলে বিদেয় নেবার ভঙ্গী দেখে মনে মনে ভাবলাম 'বাব্বা! বাঁচলুম।' আমিও আমার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি, সানাউল্লা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তার চাদরের ভেতর থেকে শালখানা বের করে ঝাড়া দিয়ে তার ভাঁজ খুলে এগিয়ে এসে আমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে বললো, 'বাবুজি শখ করে তোমায় একটা জিনিস কিনে দিতে চাইছেন, তুমি তা আপত্তি কিছুতেই করতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'এত বেশী দাম, টাকা আসবে কোত্থেকে?'

আমার কথা শুনে উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভগবান তোমায় সব দেবেন।' বলেই আর কোন দিকে না তাকিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

আস্তে করে চার মাসে শালখানার দাম চুকিয়ে দিলাম।

শালখানা সেই ১৯৩৮ সনে ১৫০ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এখন আর ঐরকম হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা পশমিনা শাল পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও ১০ হাজার টাকার কমে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ১৯৬৪ সনে আমার দিল্লীর শালওয়ালা বলেছিল, 'মাতাজী, যদি এই শাল বিক্রী করতে চাও, তাহলে আমি ৫ হাজার টাকায় বিক্রী করিয়ে দিতে পারি।' একবার দিল্লীতে সুইডিস এম্বাসাডারেস তাঁর বাড়ীতে ডিনার পার্টিতে আমার গায়ে ঐ শালখানা দেখে বলেছিলেন যে তিনি কাশ্মীরে ওরকম শাল

অনেক খুঁজেছিলেন কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। আজ ৫২ বছর হয়ে গেল শালখানা ব্যবহার করছি, কিন্তু একেবারে নতুন অবস্থাতেই আছে।

১৯৩৯ সনের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন সকাল বেলার দিকে দরজায় বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই দেখা গেল বড় নন্দাই, ননদ ও তাদের চারটি পুত্রকন্যা সবাই দাঁড়িয়ে। কোন খবর না দিয়ে আসাটা আমায় খুব অবাক করে ফেললো। আমরা বরাবর অভ্যস্ত ছিলাম যে কেউ কোথাও রওয়ানা হবার আগে এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে টেলিগ্রাম করে খবর জানিয়ে দেওয়ার। তাড়াতাড়ি করে তাঁদের থাকার সব ব্যবস্থা করা গেল।

কিছুদিন আগে থেকেই চাকর-বিভ্রাট চলছিল। অনেককেই একটা ভাল লোক যোগাড় করে দেবার জন্য বলেছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ আমাদের কালীচরণ মুদী একটা লোককে পাঠিয়ে দিল। তার নাম ছিল 'রাম'। প্রথম দিনে রামকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম। তার বাঁ হাতটা দেখলাম কেমনতর। বাঁকা মোড়া অবস্থায় আছে। পরে দেখলাম সে কাজেকর্মে যেমনি দক্ষ তেমনি দায়িত্বপূর্ণ লোক। তার হাতের জন্য কোন অসুবিধাই হতো না কাজকর্মের। সে এসেই সেই যে কাজকর্ম বুঝে নিল তার কাঁধে, বরাবরের আপনার লোকের মত সকলের দেখাশোনা করেছে।

আমরা কলকাতা ছেড়ে দিল্লী যাওয়াতে খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল এবং কয়েকমাস পর সে-ও আমাদের কাছে দিল্লী এসে উপস্থিত হয়। পরে অবশ্য তার উপর নিজের সংসারের প্রচুর দায়িত্ব এসে পড়াতে দেশে ফিরে যেতে হলো।

॥ ১০ ॥
কলকাতায় শেষ তিনবছর

১৯৩৯ সনের ২০শে মে আমার ছোট ছেলে পৃথ্বীনারায়ণের (ডাক নাম বাবলু) জন্ম হলো। যে রাত্তিরে সে জন্মালো সেই সন্ধ্যেয় বাড়ীতে আমি শুধু একা। একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। তারপর নিজেই চিঠি লিখে আমাদের ডাক্তার বিবেক সেন মশায়কে ও নার্সকে আসবার জন্য ধনুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। রাত দশটার পর উনি শরৎবাবুর বাড়ী থেকে এসে দেখলেন সব রকম ব্যবস্থাই ঠিক আছে।

পৃথ্বী জন্মাবার দিন সাতেক পরে লক্ষ্য করলাম তার নাভি না শুকিয়ে কেমন যেন ফুলে লাল হয়ে আছে। সেজঠাকুরপোকে খবর দিতে তিনি এসে দেখে বললেন, 'এ তো বড় খারাপ অবস্থা হয়েছে।' এই বলে তক্ষুনি ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে আমার বাড়ী, এর দিনে তিনবার করে ওষুধপত্র লাগাতে হবে এবং আমি নিজের হাতে এই কাজ করবো, আর কেউ ঠিক মত পারবে না, তাছাড়া বার বার শ্যামবাজারে এতদূরে আসা একটু অসুবিধা এবং এই শিশুকে সব সময় বিশেষ নজরে রাখতে হবে। আমি একটু নানান অসুবিধা হবে বলে আপত্তি করায় বললেন, 'বাড়ী এখন খালি, নীলিমা গিয়েছে কালিম্পং, ছেলেদের নিয়ে এবং

ধনু ও ঝিকে নিয়ে চলো।' উনিও শুনে বললেন, 'না। যেতেই হবে, তবে সব গুছোতে একটু সময় লাগবে, বিকেলে কাজে যাবার সময় ট্যাক্সি করে পৌঁছে দেব।'

আমরা গিয়ে সব গোছগাছ করে নিলাম। রাত দশটার সময় সেজঠাকুরপো বললেন, 'আমি পাশের ঘরেই আছি। রাতে কিছু দরকার হলে আমায় ডেকো।' রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ঐ ছোট শিশুর কি রকম হাত, পা, মুখে একটা খিঁচুনি আরম্ভ হয়েছে। আমি ঝি চারুকে বললাম 'শিগ্‌গির কাকাবাবুকে ডাকো,' বলেই নিজে নিজে খুব জোরে ডাকতে লাগলাম। ডাক শোনামাত্র দৌড়ে এসে শিশুর ঐ অবস্থা দেখে দৌড়ে অন্য ঘরে গিয়ে ওষুধের আলমারী খুলে ছোট একটা বড়ি এনে খাইয়ে দিলেন। তাতে আস্তে আস্তে খিঁচুনি বন্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। সারারাত আমার মত সেজঠাকুরপোও জাগা। ঘন্টায় ঘন্টায় কেবল এসে দেখতে থাকলেন।

পরদিন ভোরে উনি কাজে যাবার পথে সবাইকে দেখতে এসে রাতের সমস্ত ব্যাপার শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তবে সেজঠাকুরপো বললেন, 'না! আর কোন ভয়ের কারণ নেই। ঠিক সময়ে 'টিটেনাসে'র (ধনুষ্টঙ্কার) ওষুধ পড়ে যাওয়ায় আর বাড়তে পারে নি।' পরে সারাদিন একটু পর পর কয়েক ফোঁটা করে ব্রোমাইড খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তৃতীয় দিন থেকে ভাল হতে আরম্ভ করলো। দিন আট দশ পরে ছেলে সুস্থ হয়ে উঠলে পরে বললাম, 'এবার তাহলে বাড়ী ফিরবার অনুমতি দাও।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা বেশ। মেজদাকে নিয়ে একদিন সকলে বেশ খাওয়া-দাওয়া করা যাক, তারপর যেও।' সব গোছগাছ করে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন গাড়ীতে উঠতে যাবো, তখন সেজঠাকুরপো খুব গদগদ ভাবে আমার কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন, 'মেজবৌদি, আজ ত ছেলেকে কোলে নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরছ, কিন্তু আমার কথা না শুনে সেদিন রাতে যদি শ্যামবাজারে থেকে যেতে তবে আমি খবর পেয়ে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে না জানি কি হয়ে যেতে পারতো!'

তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। ঐ সাংঘাতিক মুহূর্তে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে বিপদের হাত থেকে ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল।

এর মাস দুয়েক পর শুনলাম শরৎবাবুর বড় ছেলের বিয়ে। তাদের বিয়ের পার্টিতে যাবার নেমন্তন্ন হলো। ছোট শিশু নিয়ে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। বিয়ের জন্য উপহার কি দেওয়া যায় পরামর্শ করছি। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করা গেল যে দেওয়ালে টাঙ্গাবার মত একটা সুন্দর ছবি কোন বড় নামকরা চিত্রকরের আঁকা দিলে কেমন হয়। উনি দোকানে গিয়ে অনেক ছবি যাচাই করে বত্তিচেল্লীর 'প্রিমাভেরা' ছবিটির একটি খুব ভাল প্রিন্ট কিনে আনলেন এবং ভাল ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে সেটি উপহার বলে পাঠিয়ে দিলাম।

কয়েকমাসের মধ্যে পূজো এসে গেল। ছোট ছেলে তখন পাঁচমাসের হয়েছে। একদিন উনি ভাসুরের বাড়ী গিয়েছেন, ফিরে এসে বললেন, 'দাদা বলছেন, নীরু চলো এবারে পূজোতে আমরা সবাই একসঙ্গে একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে পুরী বেড়াতে

যাই। আমি আমরা যাবো বলে কথা দিয়ে এসেছি।' ছোট শিশু নিয়ে ট্রেনে যাতায়াতের অসুবিধা বলে আমি আপত্তি করলাম। উনি বললেন, এক রাত্তিরের ত রাস্তা, ও চলে যাওয়া যাবে।

ছোট ছেলেকে একটা বেতের বাস্কেটে (দোলনামত) বিছানা করে শোয়াতাম। সেটাতে শুইয়েই নিয়ে যাবো ঠিক করলাম।

ঠিক হল পুরী যাবার পথে ভুবনেশ্বরে নেবে দিন আড়াই থেকে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ইত্যাদি দেখে পুরী যাওয়া হবে।

সন্ধ্যার ট্রেনে হাওড়া থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা সকালে ভুবনেশ্বরে পৌঁছলাম। এক উড়ে পাণ্ডা এসে আমার ভাসুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সবাইকে একটা ধর্মশালায় নিয়ে গেল। কাছেই বিন্দুসরোবর দেখেই ওঁর মাথায় খেয়াল এলো যে তক্ষুনি ছেলেদের দেখাতে হবে যে জলে কি রকম সাঁতার কাটা যায়। ধর্মশালায় পৌঁছিয়েই বললেন, 'আমি ছেলেদের নিয়ে সাঁতার কেটে আসি।' এই বলে ছেলেদের নিয়ে বিন্দুসরোবরের দিকে চলে গেলেন। আমার ভাসুর ও তাদের মেয়ে কৃষ্ণাকে নিয়ে সঙ্গে গেলেন। আমরা দুই জা মিলে দুই চাকর ধনু ও বিহারীকে দিয়ে জিনিসপত্র খুলিয়ে নিলাম। বিহারী স্টোভ জ্বেলে চায়ের বন্দোবস্ত করছে, এর মধ্যে সবাই ফিরে এসে খুব উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'আরেকটু হলে ত ভোঁদ (বড় ছেলের ডাকনাম) ডুবেই যাচ্ছিল।' আমি ত প্রথম শুনে খুব হিঃ হিঃ করে হাসলাম। তারপর সমস্ত বিবৃত ঘটনা শুনে ত সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কি সাংঘাতিক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গিয়েছে! ঘটনাটা রীতিমত ভয়াবহ ও বিপদজনক হয়েছিল।

বিন্দুসরোবরে পৌঁছে ছেলেদের ডুবিয়ে স্নান করিয়ে দুটিকে ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়ে উনি সাঁতার কাটতে কাটতে সরোবরের অন্য প্রান্তে যেতে আরম্ভ করেছেন। আমার ভাসুর কাছেই ঘাটের পারে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'খুকু! যাও ত, তোমার কাকীমার কাছ থেকে ভাইদের জন্য শুকনো জামা চেয়ে নিয়ে এসো। এ দুটোর ঠাণ্ডা লাগবে।' কৃষ্ণা রওয়ানা হলে সে ঠিকমত ধর্মশালায় পৌঁছেছে কিনা দেখবার জন্য বটঠাকুর পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন মেজছেলে খুব আস্তে আস্তে ক্ষীণ গলায় কেবল বলছে, 'দাদা ত পড়ে গেল, দাদা ত পড়ে গেল!' ঘাটের সিঁড়ি পেছল ছিল। হঠাৎ পিছলে গিয়ে বড় ছেলে জলে পড়ে গিয়েছে। এই শুনে বটঠাকুর ঘাটের দিকে তাকাতেই দেখেন বড় ছেলে জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। তিনি ট্রেনে যে সুট পরে গিয়েছিলেন সেই পোযাক, জুতো মোজা সুদ্ধ ঝপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে জল থেকে টেনে তুলে এনেই তার পেট থেকে জল বের করে জ্ঞান ফেরাতে আরম্ভ করলেন। ওদিকে উনি সাঁতার দিতে দিতে দেখেন একটি ছেলে বসে আছে, আরেকটি নাই। তাই দেখে তাড়াতাড়ি আসতে আসতে দেখলেন দাদা কি করছেন। উনি ডাঙ্গায় উঠে আসতে আসতে ততক্ষণে ছেলের জ্ঞান ফিরে এসেছে। একগাদা জল ওয়াক্ করে মুখ দিয়ে বের করে হেসে ফেলেছে।

খানিকপরে উনি আমায় বলে বসলেন, 'চলো! আমার ও দাদার সঙ্গে তুমি

বিন্দুসরোবরে চান করে আসবে।' অগত্যা গেলাম। আগে কখনও কোনও দিন জীবনে জলে নামি নি। দু'ভাই মিলে দুদিক থেকে আমার দুহাত ধরে টেনে গলা পর্যন্ত জলে নামিয়ে দিতে ভয়ে আমার আত্মা ত গুড়ুম। আমি জলে আর দাঁড়াতেই পারি না। আমি চেঁচামেচি করে বললাম, 'ওরে বাবা, জলের কি তোড়! আমায় শিগ্‌গির করে ডাঙ্গায় তুলে দাও।'

দুভাই-এ হাসতে হাসতে আমায় জল থেকে উঠতে দিলেন।

বেলা তিনটে নাগাদ সবাই মিলে লিঙ্গরাজ-এর মন্দির দেখতে গেলাম। ঐ বিশাল মন্দির, লালচে পাথরের গায়ে কি সূক্ষ্ম তার কারুকার্য এবং উচ্চতা দেখে খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। কেবলই মনে হতে লাগলো আমাদের মত মানুষই ত ওটা গড়ে তুলেছিল। তাদের ঐ অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্যের হাত দেখে অবাক হতে হয়।

আমি ছোটছেলেকে কোলে নিয়ে মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বসে রইলাম। ধনুকে আমার কাছে বসিয়ে রেখে সবাই মুক্তেশ্বরের মন্দির ও অন্যান্য কতগুলি ছোট মন্দির দেখতে গেলেন। নির্জন, নিরালা মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসে সূর্য অস্তের শেষ রোদের আলোতে চারদিকের সেই অপূর্ব দৃশ্যের যে কি এক অজানা অনুভূতি বোধ করতে লাগলাম। সবাই অল্প পরে ফিরে এলে ধর্মশালায় আবার আসা গেল।

পাণ্ডাকে বলে দেওয়া হলো পরদিন সকালে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দেখি দুটো গরুর গাড়ী ধর্মশালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে পাণ্ডা এসে বললে, ঐ দুটো গরুর গাড়ীতে চড়ে আমাদের উদয়গিরি, খণ্ডগিরি যেতে হবে। গাড়ী ও গরু দুটোর অবস্থা দেখে ত বসে পড়লাম। বাঁশের চাটাইয়ের ছই দেওয়া নীচু গাড়ী, আর যে গরুগুলো টেনে নেবে তারা যেমনি ছোট ছোট তেমনি শীর্ণকায়। পাণ্ডাকে যখন বলা হল এই গাড়ীতে এতদূর, তারপরে আবার পাহাড় কি করে যাওয়া হবে? সে তখন অতিশয় গম্ভীরমুখে বললো, 'আগে ত ঘুরিয়া আস, তারপর বলিও গাড়ীগুলো ভাল কি মন্দ।'

আমরা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে দুপুরের জন্য খাবার ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বেলা নয়টা নাগাদ রওয়ানা হবার জন্য গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো গাড়ীতে ওঠা নিয়ে। চাকররা আগেই শতরঞ্চি ইত্যাদি পেতে রেখেছিল। অতি কষ্টে মাথা নীচু করে গড়াগড়ি খেয়ে হামা দিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলাম। আমরা দুই জা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসলাম। অন্য গাড়ীতে খাবারদাবার নিয়ে ওঁরা দুই ভাই ও দুটি চাকর উঠলেন। গাড়োয়ান গাড়ীর সামনে উঠে বসে গরুকে পা দিয়ে এক লাথি মেরে বেতের একটা ঘা মারামাত্র গরুগুলো তাদের গলার ঘন্টা বাজিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে সুরু করলো। গরুর ওরকম দৌড়ে দৌড়ে চলার রকম দেখে ত আমরা অবাক। এতগুলি লোককে টেনে নেওয়ার কিছুমাত্র কষ্ট দেখা গেল না। চারদিক কুয়াসাচ্ছন্ন, ক্রমশ খোলা গাছপালা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়-এ উঠতে এত ভাল লাগলো যে গরুর গাড়ীর ভিতর গুটিসুটি দিয়ে বসার কষ্ট একেবারে ভুলে গেলাম।

পাহাড়ের ওপর উঠে গাড়ী থেকে নেমে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি গুহাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। উদয়গিরির হাতীগুম্ফা ও মাঞ্চাপুরি গুম্ফা এবং খণ্ডগিরির রাণীগুম্ফা, গণেশগুম্ফা এবং জয়বিজয়গুম্ফা দেখবার মত। এগুলির অনেক ইতিহাস আছে। তবে জানা যায়, এই গুহাগুলিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বসে বুদ্ধের ধ্যান করতেন। একটা গুহার উপরে খাড়বেল রাজার জয়যাত্রার ইতিহাস খোদাই করে বিবৃত রয়েছে। এসবের মধ্যে মানুষের মূর্তি, হাতী, সাপ, ঘোড়া, পদ্মফুল কত কিছুই না কি অপরূপ সুন্দরভাবে গল্পচ্ছলে খোদাই করা আছে যা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। চারদিক ঘুরেফিরে দেখে সূর্যাস্তের সঙ্গে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। দু বেলাতে গরুর গাড়ী চড়ে এত ভাল লাগছিল যে গাড়ী থেকে নামতে হলো বলে মনে মনে খুবই আপসোস হচ্ছিল।

পরদিন সকালে দিদি ও ভাসুর দুজনে মন্দিরে পূজো দিতে গেলেন। উনিও সঙ্গে গেলেন। ওঁকে পূজো দেবার জন্য পাণ্ডা অনেক কাকুতিমিনতি করেছিল। ওঁর পূজো-আর্চায় বিশ্বাস নেই, পূজো দিয়ে মন্দির-সংস্কারার্থের বাক্সে একটি টাকা দিলেন। তাই দেখে ঐ পাণ্ডা আরেকটা পাণ্ডাকে বললো, 'দেখিলি, বাক্সে একটা টঙ্কা দিল!'

পূজো না দিয়ে চাঁদার বাক্সে একটা টাকা ফেলাতে সে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল।

বিকেলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ধর্মশালায় রইলাম, ওঁরা দুভাই ভুবনেশ্বরের রাজরাণীর মন্দির দেখতে গেলেন। দুটি রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুরের ট্রেনে ভুবনেশ্বর থেকে রওয়ানা হয়ে বিকেলে গিয়ে পুরী পৌঁছলাম।

যে বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল তার নাম ছিল 'অসীমাবাস'। বাড়ীটা একেবারে সমুদ্রের ওপরেই ছিল। বাড়ীতে গিয়ে কিছু গোছগাছ করে চা খেয়ে দিদি বললেন, 'যাই, আমি একটু সমুদ্রে চান করে আসি।' এই বলে ছেলেদের ও কৃষ্ণাকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন। একটু পরে একটা সাংঘাতিক কাতরানির আওয়াজ শুনে আমরা সবাই বেরিয়ে দেখি দিদি অতিকষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ী এসে ঢুকছেন। শুনলাম, জলে নেমে প্রথম ঢেউ পার হতে না হতেই আরেকটা ঢেউ এসে এত জোরে পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছে যে পায়ের পাতা গোড়ালি থেকে যেন উল্টে গিয়েছে, ব্যথায় আর পা সোজা করতে পারছেন না। সেদিন রাতে কোনরকমে গরমজলের সেঁক দিয়ে চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে রাখা হলো। পরদিন সকালে দেখা গেল পা ফুলে ঢোল। আর এক পা-ও হাঁটবার শক্তি নেই। তখুনি ডাক্তার ডেকে আনতে তিনি এসে দেখে বললেন, পায়ের হাড় মচকে গিয়েছে এবং 'প্ল্যাস্টার অব্ প্যারিস' দিয়ে ব্যান্ডেজ করে একেবারে বিছানায় শুইয়ে রাখলেন।

পুরীর সমুদ্র দেখে ছেলেরা ও কৃষ্ণা খুবই খুশী। তারা সারাদিন প্রায় সমুদ্রের পারেই খেলা করতো। সমানে ঝিনুক কুড়িয়ে আর বালি ঢিবি করে বাড়ী বানাতে ব্যস্ত থাকতো।

প্রথম প্রথম কয়দিন উনি ও বটঠাকুর দুই ভাই মিলে আমায় টেনে টেনে নিয়ে সমুদ্রের জলে কতক্ষণ নাকানি-চুবোনি খাইয়ে নিজেরা সাঁতার কেটে কেটে চান

করতেন। কয়দিন পর একটা নুলিয়া ঠিক হওয়ার পর আমি তার হাত ধরে সমুদ্রে নামতে নামতে আস্তে করে জলের ভয় কমে গেল। নুলিয়া ছেলেদেরও একজন একজন করে চান করিয়ে দিত এবং তাকে দিয়ে বালতি করে সমুদ্রের বেশ দূরের পরিষ্কার জল আনিয়ে ছোট ছেলেকে টবে করে চান করাতাম।

আমরা পুরী যাচ্ছি শুনে কলকাতায় বহু-বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সমুদ্রের মাছ খেতে বারণ করেছিলেন। আমরা কিন্তু সমুদ্র থেকে যখন তখন তোলা মাছ খেয়ে দেখলাম অতিশয় সুস্বাদু। আমরা কারো কথা না শুনে যে ক'দিন পুরী ছিলাম সমুদ্রের মাছই খেয়েছি।

নুলিয়ারা প্রতিদিন অতি ভোরে অন্ধকারে তাদের কাঠমারান নৌকো নিয়ে জাল ফেলতে ফেলতে কতদূর মাঝসমুদ্রে চলে যেতো। আবার বেলা দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে এসে মাছভর্তি জাল টেনে টেনে এনে ডাঙ্গায় তুলতো। জেলেদের মাছ ভরা জাল টেনে তোলা দেখলেই বটঠাকুর চেঁচামেচি সুরু করতেন, 'বৌমা ! বৌমা ! অমিয়া ! নুলিয়ারা জাল ডাঙ্গায় তুলে ফেলেছে, শিগ্‌গির চলো মাছ কিনে আনি।'

শোনামাত্র তাড়াতাড়ি হাতের সব কাজকর্ম ফেলে বটঠাকুরের সঙ্গে মাছ কিনতে দৌড়াতাম। নানা রকম মাছ জালে পড়তো, তার মধ্যে চিংড়িমাছ, চাঁদামাছ, ম্যাকারেল মাছ ইত্যাদি খেতে অতিশয় সুস্বাদু হতো। ঐসব মাছের সঙ্গে প্রায়ই জালে দুই একটা হিংস্র সামুদ্রিক বড় বড় মাছও পড়তো। দুই জাতের হাঙ্গর একটার মাথা ঠিক হাতুড়ির মত দেখতে, তার নামই 'হ্যামার-হেডেড শার্ক', অন্যটা কতকটা মাছের মত মুখ কিন্তু মুখ ভর্তি তার সাংঘাতিক ধারালো করাতের মত দাঁত। আরো দুরকমের দেখেছি, একটার নাম ইংরেজীতে 'সোর্ডফিস' বলে, এটার নাকের ওপর থেকে একটা শক্ত ধারালো তলোয়ারের মত দুধারে ধারালো দাঁতের ছড় আর অন্যটার চাবুকের মত লম্বা গায়ে সূক্ষ্ম কাঁটাওয়ালা লম্বা লেজ। এর নাম 'রে ফিস্'। ওঁদের ময়মনসিং-এ এই মাছের লেজকে বলে, 'হাকসের লেঙ্গুর।' এই লেজ দিয়ে চাবুক তৈরী করে সেটা দিয়ে মারলে পর গা চাকা চাকা লাল হয়ে সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়। এইজন্য ময়মনসিংহ গ্রামে চলিত কথাই ছিল কেউ কোন দোষ করলে তাকে মার দেবার কথা উঠলেই লোকে বলতো 'হাকসের লেঙ্গুর দিয়া পিটানির কাম।' (অর্থাৎ হাকস (শঙ্কর) মাছের লেজ দিয়ে পেটানো দরকার)। এসব হিংস্র বড়বড় সামুদ্রিক মাছগুলি জালে দেখা মাত্র নুলিয়ারা তাদের নৌকোর মোটা মোটা কাঠের দাঁড়গুলি দিয়ে ওগুলোর মাথায় খুব জোরে জোরে বাড়ি দিয়ে মেরে একধারে ফেলে রাখতো। তারপর সব মাছ বিক্রী হয়ে গেলে ঐগুলিকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিজেরা খাবার জন্য ভাগবাঁটোয়ারা করে নিত।

নানারকম সমুদ্রের মাছ কেনা হতো এবং রান্নাও হতো নানান পদ্ধতির। কিন্তু আমার নিজের বেশী মাছ খেতে ভাল লাগতো না ছেলেবেলা থেকেই। আমি সামান্য একটু খেতাম দেখে দিদি কেবল আমায় বকতেন আর বলতেন, 'এটা কি ? বাড়ীতে এত মাছ, আর মেয়েটা শুধু কলমীশাক দিয়ে ভাত খেয়ে বসে থাকে !'

পুরী গিয়ে কয়েকবারই জগন্নাথের মন্দির দেখতে গিয়েছি। কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কারুকার্যের মত এই মন্দিরের কাজ সেরকম সূক্ষ্ম নয়।

দিদির পা একটু সারার পরে আমরা একদিন ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখতে গেলাম। ঐ সরোবর একেবারে কচ্ছপে ভরা ছেলেদের বলেছি। আমরা যেদিন গিয়েছি, গিয়ে দেখি একটাও কচ্ছপ নেই। পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সব কচ্ছপ কি হলো?' কচ্ছপকে খাওয়াবার জন্য গেটে গুড় ছোলা দিয়ে তৈরী ঠোঙা ঠোঙা লাড্ডু কেনা হয়েছে। পাণ্ডা ত আমাদের কথা শুনে কেবলি চেঁচাচ্ছে আর বলছে, 'কড়হে, কড়হে কড়হে মদনমোহন গোপাল লাড্ডু ভোজন করি যা।' কোথায় কচ্ছপ? কিছুই দেখা যায় না। সরোবর একেবারে এঁদো জল।

পাণ্ডাকে বললাম, 'এত ত ডাকছ, তোমার কচ্ছপ কোথায়?' তখন সে উত্তর দিল, —'উহা জলজন্তু আছে, ডাকিলেই সে কি আর আসিবে!' এদিকে মেজছেলে কচ্ছপ খাওয়াবে বলে লাড্ডুর একটা ঠোঙা হাতে করে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে দেখি কোথা থেকে এক হনুমান এসে লাড্ডুর জন্য তার হাত চেপে ধরেছে, আর সে ভয়ে একেবারে শক্ত কাঠ হয়ে আছে। চেঁচাতেও পারছে না। আমি দেখেই জোরে চেঁচিয়ে বললাম, 'শিগ্‌গির লাড্ডুর ঠোঙা হাত থেকে ফেলে দে।' ঠোঙাটা ফেলে দিতেই লাড্ডুগুলি ছড়িয়ে পড়তে দেখে হনুমান তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে লাড্ডু খেতে আরম্ভ করলো।

এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে কচ্ছপ দেখেছিলাম ১৯২২ সনে। আমাদের দেখেই কাতার দিয়ে সাঁতরে খাবারের লোভে ডাঙ্গার দিকে আসছিল।

দিদির পা তখন অনেকটা ভাল। তিনি লাঠিতে ভর করে পায়ের প্ল্যাস্টার নিয়েই খট্‌খট্ করে একটু হাঁটাচলা সুরু করেছেন। তখন আমরা এদিক ওদিক একটু বেড়াতে যেতে আরম্ভ করলাম।

একদিন বিকেলে আমি ও উনি সমুদ্রের ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ভাবলাম ১৯২২ সনে বাবার সঙ্গে ১২ বছর বয়সে পুরী গিয়ে বি, এন, আর হোটেলের কাছে 'সুচেতা কুটির' নামে যে বাড়ীতে ছিলাম দেখে আসি। গিয়ে দেখি বাড়ীটার অর্ধেক প্রায় বালিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। হারুমালীর ঘরটা তো বালিতে পুরোটা চাপা পড়েই গিয়েছিল। শুধু উপরের সামান্য ছাদটুকু এবং ঘরটার দরজার শেকল তোলা ছিল, সেটার অর্ধেকটুকু সামান্য দেখা যাচ্ছিল। দেখে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। কালের গতিতে মাত্র ১৭ বছরের ব্যবধানেই একটি বাসস্থান মনুষ্যজগৎ থেকে লোপ পেয়ে যেতে বসেছে। যদিও মাত্র একমাস ঐ বাড়ীটায় ছিলাম, কিন্তু এত আনন্দে কাটিয়েছিলাম ওখানে যে দুর্দশা দেখে বিশেষ বেদনা বোধ করতে লাগলাম। কলকাতায় ফিরে একটু খোঁজ-খবর নিয়ে শুনলাম যে সেই বাড়ীর মালিকরা কেউই আর বেঁচে নেই। একমাত্র একজন মহিলা তার অধিকারিণী ছিলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষেও সব দেখাশোনা করে রাখা আর সম্ভব নয়।

দেখতে দেখতে একমাস প্রায় হয়ে সকলের ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এলো। আমি

আমাদের জিনিসপত্র এবং বটঠাকুর তাঁদের সব গুছোনো সুরু করে দিলাম। ডাক্তার এসে দিদির প্ল্যাস্টারের পায়ের খোল্ কেটে খুলে দিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতা রওয়ানা হবো, সব প্যাক করা, বাঁধাছাদা হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ সেদিন দুপুর থেকে ছোট ছেলের ভয়ানক পেটের অসুখ আরম্ভ হলো। একরাত্তিরের পথ, কোনক্রমে কলকাতা পৌঁছে সেজঠাকুরপোকে ডেকে পাঠালাম। তিনি এসে ওষুধপত্র দিয়ে গেলেন কিন্তু দুদিন ধরে কোনই উন্নতি দেখা যায় না।

এদিকে পুরী থেকে ফেরবার পর তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলা থেকে আমার নিজেরও উঠলো জ্বর। সাংঘাতিক জ্বরের তাপ। একবার করে ভীষণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ওঠে, আবার আধঘন্টা পর বেশ কমে যায়। উনি রাত দশটায় বাড়ী ফিরে এসে আমার এই অবস্থা দেখে খুবই চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে সেজঠাকুরপোকে ফোন করতে জানা গেল তিনি বিশেষ কোন রোগী দেখতে কলকাতার বাইরে গিয়েছেন দুদিনের জন্য। ভবানীপুরে জামাইদাকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে সম্পূর্ণ ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ দেখে সেই অনুযায়ী ওষুধপত্র লিখে দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমার জ্বর আর ছাড়বার নাম করে না। উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। আমার এত জ্বর, তারপর ছোট ছেলে কোলে, তারও খুব পেটের অসুখ, এই খবর শুনে মা দেখতে এলেন। আমাদের দেখাশুনা করবার তখন কেউ নেই দেখে থেকে গেলেন।

দুদিন পর সেজঠাকুরপো সন্ধ্যেবেলা কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ফিরে এসেই আমার অসুখের খবর পাওয়া মাত্র রাত্তির বেলা এসে হাজির। সেদিনই সন্ধ্যায় মাকে আমি বলেছি, মা! আমার মনে হয় বুকের ভেতর একটা কিছু হয়েছে। কেমন যেন একটা সাঁ সাঁ শব্দ বোধ করছি। সেজঠাকুরপো এসে নানাভাবে পরীক্ষা করে মার দিকে তাকিয়ে বললেন, লক্ষণটা ত ভাল নয়।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে? নিউমোনিয়া হয়নি ত। ও ত বলছে বুকের ভেতর কেমন একটা শব্দ বোধ করছে।' সেজঠাকুরপো বললেন, 'না। নিউমোনিয়ারও বাবা।' মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি?' তিনি বললেন, 'প্লুরেসি বলে মনে হচ্ছে। আজ রাতে ত আর কিছু করা যাবে না; কাল সকালে একজন ডাক্তার এসে রক্ত নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দেবো। রক্তে এ রোগ সঠিক ধরা পড়বে, তবে 'এক্সরে'ও করাতে হবে, তার জন্য আমি এসে হাসপাতালে নিয়ে যাবো। ছেলেকে যেন আর মায়ের দুধ খেতে দেওয়া না হয়। কাল সকাল থেকেই ওকে কাউ এন্ড গেট টিনের পাউডার দুধ ও তাজা গুরুর দুধ বোতলে করে খাওয়াতে আরম্ভ করতে হবে।'

উনি কাজ থেকে ফিরে এসে সব শুনে পরদিন সকাল থেকেই ছেলের তোলা দুধের সব ব্যবস্থা করালেন। সেই সময়ে শিশুদের দুধ খাওয়াবার জন্য নতুন রকমের মোটা মুখের 'হাইজিয়া' বোতল বিলেত থেকে চালান হয়েছে, তাই কিনে আনা হল এবং একদিনেই ঐ শিশুর ছয়বারের খাওয়া বদলে তোলা দুধ আরম্ভ করতে হলো। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এই খাওয়া বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ছেলের পেটের অসুখ একদিনেই সেরে গিয়ে সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলো। উনি রোজ খুব ভোরে উঠে

ছেলের জন্য কাউ এন্ড গেটের দুধ তৈরী করে বোতলে ভরে দিয়ে তারপর শরৎবাবুর কাজের জন্য রওয়ানা হতেন। দিনে খাওয়ানোর জন্য সামনে দোহানো গরুর দুধের ব্যবস্থা করা হোল।

আমারও চিকিৎসার আয়োজন সুরু হলো। পরদিন সকাল বেলায় একজন ডাক্তার এলেন রক্ত নিতে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে একটা ব্যাপার দেখলাম। সিরিঞ্জের ভেতর করে রক্ত নেওয়া ছাড়া দেখলাম একটা ব্লটিং পেপার-এর মত কাগজের মধ্যে বিভিন্নরকমের লাল লাল বিন্দু করা চিহ্ন রয়েছে এবং ঐ চিহ্নিত চিহ্নের এক একটার ওপর এক এক রকম অসুখের নাম লেখা রয়েছে। ডাক্তার আমার ডান হাতের আঙুলের ডগায় ছুঁচ ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বের করে ঐ লাল বিন্দুগুলির নীচে কাগজে রক্তের ছাপ দিয়ে নিয়ে মেলাতে লাগলেন। কয়েকটা ছাপ প্রথম কয়েকটা লালরং-এর বিন্দুর সঙ্গে মিললো না। কিন্তু ক্রমশঃ যে বিন্দুটায় 'প্লুরেসি' লেখা ছিল সেটার সঙ্গে আঙুল থেকে বের করা রক্তের ফোঁটার রং একেবারে হুবহু মিলে গেল।

দুপুরবেলা সেজঠাকুরপো এসে তাঁর গাড়ীতে করে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে 'এক্সরে' করাবার জন্যে। তেতলা থেকে নামবার শক্তি নেই। একটা চেয়ারে আমায় বসিয়ে একদিকে সেজঠাকুরপো ও অন্যদিকে বিনু ধরে নামিয়ে নিলেন। এক্সরে করে দেখা গেল ডানদিকের বুক একেবারে জলে ভরে গ্যাছে। বাঁদিকের পাঁজড়ের হাড় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে কিন্তু ডানদিকেরটা জলে ঢাকা।

রোগ সিদ্ধান্তের পর থেকে চিকিৎসা সুরু হলো। প্রথমদিনে একজন ডাক্তার ও সেজঠাকুরপো দুজনে মিলে পিঠের দিক থেকে 'সিরিঞ্জ' দিয়ে 'ট্যাপ' করে এক গামলা জল বের করে দিলেন। প্রথম দিন জল বের করে দেওয়ার পর জ্বর কমে গেল, শরীরও অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আবার জলে ভরে উঠলো। তখন আবার ঐ ভাবে জল বের করার পর আর যাতে জল না হয় তার জন্য অন্য ওষুধপত্র দিলেন ডাক্তার। বিছানা থেকে উঠবার শক্তিও নেই, ব্যবস্থাও নেই। ডাক্তার একেবারে শুইয়ে রাখলেন। সকালে জ্বর একটু কমে আসতো কিন্তু ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে পর্যন্ত খুব উঁচুতে জ্বরের তাপ উঠতো।

দীর্ঘদিনের রোগে পড়লাম। সব পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হবে। এতদিন মা আমাদের দেখাশোনা করেছেন, তাঁর পক্ষেও বরাবরের জন্য আমার অসুস্থ বাবাকে চাকর ও কম্পাউন্ডারের হাতে ফেলে রাখা সম্ভব নয়। তাই খোঁজ করে একটি নার্সিং ঝি ঠিক করে নিলাম। সে রোগীর সেবা যেমনি ভাল করতে জানতো তেমনি ছোট শিশুরও দেখাশুনা করতে জানতো। আমার দুই কাজেরই দরকার। সুতরাং তাকে পেয়ে খুবই সুবিধা হয়ে গেল। তার নাম ছিল 'সরলা'। সরলা এসে কাজ আরম্ভ করার পর মা-ও কতকটা নিশ্চিন্ত মনে ভবানীপুরে ফিরে গেলেন।

আমায় বিছানায় একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হলেও চাকরবাকর সবাইকে যার যার কাজ সব বুঝিয়ে দেওয়াতে সমস্ত সংসার বেশ সুন্দর সুচারুভাবে চলতে আরম্ভ করলো। উনি দুপুরে ও রাত্তিরে বাড়ী এসে সব খোঁজখবর করতেন। বিনু

চাকরবাকরদের কাজ তদারক করতো। কাজ সকলের ভাগ করা ছিল। রামের উপর রান্নাবান্না করে বাড়ীর সবাইকে খাওয়ানো, বাজার করা ইত্যাদি, ধনুর ওপর বড় দুই ছেলের দেখাশুনা, বাড়ীঘর পরিস্কার ইত্যাদি, ও সরলার উপর আমার সেবা ও ছোটছেলের যাবতীয় কাজ। সেজঠাকুরপো প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন এ রোগ দীর্ঘদিন ভোগাবে। সম্পূর্ণ সারতে অনেকদিন লাগবে। লেগেও ছিল সে রকম। আড়াই বছর সমানে ভোগার পর তারপর সুস্থ হই।

প্রথম প্রথম জ্বরে প্রায় বেঘোরে পড়ে থাকতাম। ডাক্তার বলেই দিয়েছিলেন যে এ রোগের শুধু ওষুধ নয়, পরিস্কার বাতাস, নানা রকমারি পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম এই হল মুক্তির পথ। সে অনুযায়ী সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হোত।

মা ও দিদি পালা করে ভবানীপুর থেকে এসে মাঝে মাঝে সারাদিন থেকে যেতেন। আমার অসুখের খবর শোনাবধি বাবা অস্থির হয়ে উঠেছেন। সবাইকে কেবল বলছেন, আমায় শ্যামবাজারে নিয়ে চলো, আমি টুনুকে দেখে আসি। দিদি কম্পাউন্ডার-বাবু সবাই এই নিয়ে যাবো যাবো করে কাটিয়ে দিচ্ছেন দেখে বাবা একদিন বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর যে চাকর দেখাশোনা করতো, তাকে সঙ্গে নিয়ে চুপিচুপি বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে অতিকষ্টে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা শ্যামবাজারে আমাদের বাড়ী এসে হাজির।

বেলা দশটা নাগাদ এপাশ থেকে ওপাশ করতে গিয়ে হঠাৎ দেখি বাবা এসে আমার ঘরে ঢুকছেন। আমি বললাম, 'বাবা! তুমি এখানে? এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কেন এলে?'

'আমার অসুখ কি তোর অসুখের চাইতে বেশী? আমি তোকে না দেখে কি করে থাকি?' বাবা এই বলে কোনক্রমে কাছেই একটা চেয়ার ছিল তাতে ধপাস্ করে বসে পড়লেন।

মিনিট দশেক পরে দেখি কম্পাউন্ডারবাবু ভীষণ ব্যস্তভাবে এসে উপস্থিত। তাঁর কাছে শুনলাম, বাবাকে ওষুধ খাওয়াবার জন্য কপাউন্ডারবাবু ঘরে ঢুকে দেখলেন বাবার বিছানা খালি পড়ে আছে। বাবা ও চাকর কেউই কোথাও নেই। খোঁজ! খোঁজ! কোথায় গেলেন?

মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। পাশের বাড়ী দিদির ওখানে গেলেন নাকি! খবর নিয়ে জানা গেল, না, সেখানে যাননি। তারপর মা ও দিদি দুজনেই সন্দেহ করলেন নিশ্চয়ই তবে শ্যামবাজারে চলে গিয়েছেন।

কম্পাউন্ডারবাবু অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটু পরে বাবাকে একটা ট্যাক্সি করে ভবানীপুরে ফেরৎ নিয়ে গেলেন।

আমিও বার বার বলে দিলাম যে রোগ ধরা পড়েছে, চিকিৎসাদি ঠিকমত চলছে। এবার ক্রমশঃ সেরে উঠবো, এত যেন চিন্তা না করেন।

উনি প্রায়ই দুপুরে কাজ থেকে ফেরার পথে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে নানারকম শুকনো ফল, তাজা ফল ইত্যাদি কিনে নিয়ে আসতেন। এছাড়া বাবা

দু,একদিন পরপর প্রচুর কমলালেবু, অন্যান্য রকমের ফল, তরকারী, মাগুরমাছ, অতি উত্তম গাওয়া ঘি ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন বাবা চারটে বড় বড় মাগুর মাছ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুটো মাছ কেটে রান্না করে খাওয়া হয়েছে ; আর দুটোকে একটা বালতিতে জল দিয়ে জিইয়ে বাথরুমের কোণায় রাখা হয়েছে। পরদিন মা এসেছেন। তিনি বাথরুমে হাত, পা ধুতে গিয়ে বালতিতে জল দেখে হঠাৎ বালতি উল্টে জল ফেলে দিতেই মাছ দুটো কিলবিল করে বাথরুমের মেঝে দিয়ে গিয়ে পায়খানার প্যানের ভিতর দিয়ে উধাও। মা এসে অতিশয় দুঃখিত ভাবে আমায় বললেন, 'আমি ত জানতাম না যে বালতির ভেতর মাছ আছে, শুধু জল ভেবে বালতিটা উল্টে দিতেই দেখি দুটো মাছ কিলবিল করে নর্দমা দিয়ে চলে গেল।' আমরা সবাই মিলে খুব হাসলাম। মা তারপরে খুব চিন্তায় পড়লেন। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, মাছ দুটোর কি দশা হলো ? তারা ঐ নর্দমা দিয়ে গেল কোথায় ? আমি হেসে মা-কে বললাম, 'ঐ মাছ কেটে রেঁধে খেলে আমাদের পেটে যেতো, এখন ওরা নিজেরাই নর্দমা দিয়ে নিজেদের পথ দেখে নিয়েছে।'

প্রথম প্রথম জ্বরে বেঘোরে পড়ে থাকতাম। তারপর যত দিন যেতে লাগলো আস্তে করে সকালের দিকে জ্বর নেমে আসতো কিন্তু বিকেল পর্যন্ত তাপ বেড়ে যেতো। সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে, সামনে মিত্তির-বাড়ীর ছাদ ও তার ওপরে প্রকাণ্ড ঘড়ি, তার কাঁটা নড়া এবং আধঘন্টা পর ঢং করে ঘন্টা বেজে ওঠার শব্দ গুণে সময় কাটতো। ছাদের পাঁচিলে কাক, চিল, পায়রা উড়ে এসে বসতো। আবার উড়ে যেতো। তাদের এসব গতিবিধি যেন আমার সঙ্গী-সাথী হয়ে দাঁড়ালো। বালিশের কাছে বইপত্র রাখা থাকতো কিন্তু কিছু পড়তে ভালো লাগতো না।

আমি বিছানায় পড়ে আর উনি সারাদিন কর্মে রত। বড় দুই পুত্রের হল নানারকম দুষ্টুমি করবার অবাধ স্বাধীনতা। একদিন উনি বিকেলে কাজে বের হবেন এমন সময় রান্নার চাকর রাম জঞ্জাল ফেলবার বালতিতে কতগুলি টুকরো করে কাটা কমলালেবু দেখিয়ে বললে, 'বাবু ! দেখুন দাদাবাবুরা কি করেছে ?'

বাবা অনেক কমলালেবু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার শোবার ঘরেই এক কোণায় একটা টেবিলে রাখা ছিল। দুপুরে খাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে একটু বিশ্রাম করছে, এই অবসরে দুটিতে মিলে আস্তে করে আমার ঘরে ঢুকে বেশ কয়েকটা কমলালেবু নিয়ে গিয়ে ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে বালতিতে ফেলে দিয়েছে। উনি ত হাঁক দিয়ে দুটিকে ডেকে বললেন, 'তোমরা এরকম করে কমলালেবু কেটে কেটে ফেলে দিয়েছ ?'

বড়টি শ্রীমান ধ্রুবনারায়ণ ভয়ে ভয়ে বললে, 'দাঁড়াও বলছি, দাঁড়াও বলছি।' এই বলে আমার খাটের পেছনে এসে ঠিক আমার আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বললে, 'হ্যাঁ ! কেটেছি।' আর মেজজন কীর্তিনারায়ণ কোন ভয়ডর না করে একেবারে ওঁর সামনেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা উঁচু করে খুব তেজের সঙ্গে জোর গলায় বল্‌লে, 'হ্যাঁ, কেটেছি ত !'

আমরা নিজেরা তাদের ব্যবহারে খুব আমোদ বোধ করলেও উনি গম্ভীর হয়ে বলে দিলেন, 'খবরদার ! এসব খাবার জিনিস এরকম করে নষ্ট করতে নেই। আর না বলে কখনো কোন কাজের জিনিসে হাত দেবে না।'

কিছু সুস্থ হতে মাস দুই লেগে গেল। ডাক্তার একটু বিছানায় উঠে বসবার অনুমতি দিলেন। জ্বরের প্রকোপ কমলেও ঘুস্‌ঘুসে জ্বর চলতে লাগলো।

ছেলেদের তখন নানারকম শিক্ষার বয়স। আর ওরকম ছেড়ে রাখা যায় না, তাই বিছানায় শুয়ে বসেই তাদের পড়ানো আরম্ভ করলাম। একদিন ছেলেদের পড়াচ্ছি দেখতে পেয়ে উনি বললেন, 'না ! তোমার পক্ষে এত অসুস্থ শরীর নিয়ে এভাবে পরিশ্রম করা উচিত হবে না। আমি ওদের পড়াবার জন্য একজন মাস্টারের ব্যবস্থা করছি। 'এই বলে বিনুকে বললেন কাউকে দেখতে যিনি এসে রোজ ঘন্টাখানেক ওদের নিয়ে বসতে পারেন।

টলু, বিনুর বন্ধু 'বিমল চক্রবর্তী' প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন। বিনু তাঁকে একজন মাস্টারের জন্য বললো।

স্বদেশী আন্দোলনে টলু, বিনু, বিমলবাবু সকলে দমদমের কারাগারে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। বিমলবাবুর সঙ্গে 'করালীকান্ত বিশ্বাস' বলে আরেকটি কারাবাসী তাঁর বাড়ীতে থাকতেন। এই সময়ে সাংঘাতিক বেকার সমস্যা। ভাল ভাল যুবক বি-এ, এম-এ পাশ করে অতিশয় দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল।

বিমলবাবু এই করালীকান্ত বিশ্বাসকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। করালীবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক হয়ে গেল। তিনি রোজ সকালে এক ঘন্টা করে পড়িয়ে যেতে লাগলেন। কি করে কি পড়ানো হবে উনি নিজে করালীবাবুকে বুঝিয়ে বলে দিতেন। আমার হাতে আঁকা ছবি, কার্ড ইত্যাদি সব বুঝিয়ে দিলাম।

করালীবাবু বেশ যত্ন করে পড়িয়ে যেতে লাগলেন। বড় ছেলের বেশ উন্নতি দেখা যেতে লাগলো, কিন্তু মেজকে নিয়ে করালীবাবু একটু মুষড়ে পড়লেন। কিছুতেই তাকে আর যুক্তাক্ষর চেনাতে পারেন না। একদিন অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে ওঁকে বললেন যে কিছুতেই ত কীর্তিকে অক্ষর চেনানো যাচ্ছে না। এই শুনে উনি একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে চেষ্টা করে যেতে বললেন। এরপর দেখা গেল একটু করে করে সে অক্ষর চিনতে আরম্ভ করেছে এবং একবার শিখতে যেই আরম্ভ করে দিল, তারপর খুব তাড়াতাড়ি সব শিখে ফেললো।

বিমলবাবু মাঝে মাঝে যখন টলু, বিনুর কাছে আমাদের বাড়ী আসতেন, তখন আমার ঘরে এসেও খানিকক্ষণ বসে গল্পসল্প করে যেতেন। একদিন বললেন, 'মেজবৌদি ! আপনার বি-এ পাশ করার এত ইচ্ছে ছিল, এক কাজ করুন না। আমি বইপত্র সব যোগাড় করে আনছি এবং আমি আপনাকে সাহায্য করবো, আপনি বিছানায় শুয়ে বসেই পরীক্ষার জন্য সব তৈরী করে ফেলুন।'

আমি বললাম, 'এখন ত আর এত মনোযোগ দিয়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করতে পারবো না। শুয়ে শুয়ে তিন-তিনটে ছেলের তত্ত্বাবধান, ওঁর, বিনুর সকলের কিভাবে

কি চলছে এতসব চিন্তার পর আর পরীক্ষার পড়া করা সম্ভব না।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। আর আমি এই দারুণ রোগে পড়লাম নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। সুতরাং কি হচ্ছে না হচ্ছে খবরাখবর নেবার বা পড়বার আগ্রহ প্রথম দিকে থাকলেও পরে আর কিছু দিন কোন খবরই নিই নি।

এই যুদ্ধের সময় বহু ম্যাগাজিন, কাগজপত্র সব মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কালীচরণের দোকানে অর্ডার দেওয়া হতো। কালীচরণ ওঁর অর্ডার নিয়ে সতেরো দিন পর পর বিলেত থেকে ওগুলো আনিয়ে দিত। যে কাগজপত্র ম্যাগাজিন সব বাড়ীতে আসতো সবগুলিই নেড়ে-চেড়ে পড়ে ফেলতাম। ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ' ছিল একটা আকর্ষণীয় কাগজ। প্রত্যেক সপ্তাহে বিলাতে কি ঘটনা ঘটছে সব ব্যাখ্যা করে ও সুন্দর সুন্দর ফটোগ্রাফ দিয়ে ম্যাগাজিনখানা অতিশয় সুন্দরভাবে ছাপা হতো। আমরা ওখানা দেখবার জন্য একেবারে দিন গুনতাম। যুদ্ধের সব খবর এবং ছবি খুব বিশদভাবে দেওয়া থাকতো। ওই বই দেখতে দেখতে ছেলেরা যুদ্ধের জাহাজ, ডেস্ট্রয়ার কোনটার কি নাম, এরোপ্লেন, বমার কোনটা কি রকম দেখতে সব চিনে ফেললো এবং শিখে ফেললো। উনিও সুবিধে ও সময় পেলেই তাদের সব বুঝিয়ে ও চিনিয়ে দিতেন।

যুদ্ধ নিয়ে সবাই সাংঘাতিক ভাবে আলোচনা করতো। সকলেরই এক বাক্য ছিল এই যুদ্ধে জার্মান জিতবে এবং ইংরেজ হারবে। উনি প্রথম থেকেই সবাইকে বলে এসেছেন যে ইংরেজ হারবার কোন সম্ভাবনাই নেই। এই নিয়ে সবার সঙ্গে সমানে তর্ক-বিতর্ক ও বচসা চলতো।

চাকরকে দিয়ে বাজার থেকে দুটো গাঁজার কল্‌কে কিনে আনিয়ে পড়ার টেবিলের উপর বসবার ঘরে রেখে দিলেন। তারপর কেউ যুদ্ধ নিয়ে তর্ক করতে বসলেই, উনি সেই খালি গাঁজার কল্‌কে সেই ব্যক্তির হাতে দিয়ে বলতেন, 'মশায়; আগে এই কল্‌কেতে ভাল করে দুটো টান দিয়ে দম্ নিয়ে নিন্, তারপর যা বলবার বলুন।'

ক্রমশঃ একটু করে সেরে আসতে ডাক্তারের অনুমতিতে আস্তে করে এক পা, দু পা করে হেঁটে এঘর ওঘর করি। একদিন বসবার ঘরে ডিভানের ওপর গিয়ে বসতেই উল্টোদিকে বুক-সেল্ফের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, নতুন দুটি গ্রামোফোনের রেকর্ডের বাক্স। ভাবলাম গ্রামোফোন নেই, সেই সময় যে কিনতে পারবো তারও কোন সম্ভাবনা নেই, অথচ আগে থেকে রেকর্ড কিনছেন কেন? একটু আশ্চর্যও হলাম, কারণ কখনও ত আমাকে না বলে অলক্ষিতে কিছু করেন না, এ আবার কি? যাই হোক, দুপুরে বাড়ী আসার পর জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'একদিন না একদিন ত গ্রামোফোন কিনবোই কিন্তু আগে থেকে রেকর্ড কিনে না রাখলে তখন বাজাবো কি দিয়ে? গ্রামোফোন কিনে ত আবার রেকর্ডের জন্য বসে থাকা যায় না!'

এপ্রিল মাসে গরম পড়ে আসতে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হওয়া বন্ধ হোল। তাই দেখে

একদিন মা এসে বললেন, 'এখন ত আর সর্বক্ষণ ডাক্তারদের চোখে-চোখে থাকতে হবে না। কিছুদিন এসে আমাদের কাছে থাক্। তোর বাবা বড় অস্থির থাকেন তোর জন্য।'

উনি শুনে মাকে বললেন, 'বেশ! আমি সবাইকে ট্যাক্সি করে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

ছেলেদের চাকর ধনু, সরলা সুদ্ধু আমরা সবাই ভবানীপুরে মা'র ওখানে গেলাম। বাড়ীতে ছোট ছেলেকে দেখাশোনা করবার অনেকে আছে দেখে সরলা কয়দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী ঘুরে আসতে গেল।

করালীবাবু ভবানীপুরেই থাকতেন। সেজন্য তাঁরও বেশ সুবিধে হয়ে গেল রোজ ছেলেদের এসে পড়াবার জন্য।

মাসেক কাল মা'র কাছে থাকার পর একদিন উনি এসে মাকে বললেন, অনেকদিন এদের থাকা হলো, এখন আবার শ্যামবাজার নিয়ে যাই। আমাদের পরদিন এসে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন এবং যাবার আগে আমায় আস্তে করে বললেন, 'বাড়ী এসো, একটা নতুন জিনিস্ দেখবে।'

পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বেলা থাকতেই বিকেলে সবাই ট্যাক্সি চেপে শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছলাম। এঘর ওঘর ঘুরে কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে 'কোথায় কি নতুন জিনিস' বলতে বলতে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের পেছনের কোণের দিকটা লক্ষ্যই করি নি। উনি পেছন থেকে চীৎকার করে বললেন, 'দেখ ত এটা কি?'

তাকিয়ে দেখি, ওরে বাবা! প্রকান্ড হর্নসুদ্ধ একটা গ্রামোফোন। ছেলেদের ও আমার মধ্যে একটা কলরব উঠলো, 'এটা কোত্থেকে এলো? করে কিনলে?' তারপর শুনলাম ওটাই হল হ্যান্ড-মেইড্ ই. এম. গিন্ গ্রামোফোন। আর ঐ বিরাট প্রকাণ্ড হর্নটা হলো 'পাপিয়ে মাসে'র তৈরী। একেবারে হাতে ঐ গ্রামোফোন তৈরী হতো। ওঁর মুখে এই ই.এম. গিন্এর গ্রামোফোনের অনেক গল্প শুনেছিলাম। কোথা থেকে কিনেছেন জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওটা এক সাহেবের ছিল। তিনি তাঁর সব জিনিসপত্র বিক্রী করে দিয়ে বিলেত ফিরে যাচ্ছেন, তাইতে ঐ গ্রামোফোন বিক্রীর বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপন দেখে গিয়ে ওটা কিনে নিয়ে এসেছেন। অল্প কিছুদিনের ব্যবহৃত বলে খুব কম দামেই পেয়েছিলেন। তবে গ্রামোফোনটা খুবই ভাল অবস্থায় ছিল। রেকর্ড আগেই কেনা ছিল, সেজন্য তক্ষুনি বসে গেলাম সবাই মিলে বাজনা শুনতে।

প্রথমে শুনলাম 'ব্রামস্এর ক্ল্যারিনেট্ কুইন্টেট্' যে রেকর্ড আমায় না বলে কিনে এনে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল, তারপর শুনলাম আমার অতিশয় প্রিয় 'মৎসার্টের ফ্লুট এন্ড হার্প কনচের্টো।'

উনি কাজ থেকে ফিরে এলেই সবাই মিলে বাজনা শুনতে বসে যেতাম।

ক্রমশঃ দুচারজন বন্ধুবান্ধব যারা ইউরোপিয়ান বাজনা শুনতে চাইতেন এসে

রবিবারে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যেতেন। এরপর প্রতি রবিবারে বিকেলে বাড়ীতে একটা বাজনার আসর বসতে আরম্ভ হলো। একদিকে ইউরোপিয়ান মিউজিকের তালিম, আর আরেকদিকে যুদ্ধ নিয়ে ঘোরতর আলোচনা।

মাঝে মাঝে শরৎবাবুর কাজ থেকে ফিরে এসে সুভায বসু মশায়ের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে কি রকম তর্কাতর্কি হতো সে সব গল্প করতেন। ১৯৪০ সনে একদিন এসে বললেন, সুভাষবাবু বলেছেন যে তাঁর বিশ্বাস 'ইংরেজরা হার মেনে জার্মানদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করে ফেলবে এবং সেটা ১৬ই জুলাই হবেই হবে। ক্যালেন্ডারএ আঙুল দেখিয়ে নাকি এই উক্তি করলেন। এই সব কথা বলতে বলতে উনি হেসেই অস্থির হতেন।

ইতিমধ্যে হঠাৎ কোন এক রবিবার সকালে দিলীপ সান্যাল মশায় এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করার সঙ্কল্প নিয়ে আমাদের বাড়ী এলেন। দিলীপবাবু ও উনি মিলে বহু পরামর্শ করে ঠিক করলেন দুজনে একত্রে পত্রিকাখানার সম্পাদনা করবেন। সব নামকরা লেখকদের কাছ থেকে লেখা যোগাড় করার ভার দিলীপবাবুই নিলেন। উনি আগেই বলে নিয়েছিলেন যে শরৎবাবুর কাজের উপর ঘোরাঘুরি করে প্রবন্ধ যোগাড় করা ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

১৯৪০ সনের জুলাই মাসে 'সমসাময়িক' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৭ নাম দিয়ে পত্রিকাটি ছাপার অক্ষরে বের হলো।

তাতে অনেকেই সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উনিও 'একেলা' বলে ছদ্মনামে 'ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে' নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখলেন। খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল এই প্রবন্ধখানার উপর।

পত্রিকাখানা বের হওয়ার দিনকয়েক পরেই একদিন দুপুরে সত্যজিৎ রায় এককপি 'সমসাময়িক' হাতে করে আমাদের শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে দেখা করতে এলেন। উনি ভাবলেন ঐ সমসাময়িকের সংখ্যায় দিলীপবাবু সুকুমার রায় সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, বোধ হয় সেই সংক্রান্ত কোন বক্তব্য নিয়ে তিনি এসেছেন। কিন্তু দেখা গেল তা নয়, ওঁর লেখা ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে প্রবন্ধটা পড়ে সত্যজিতের এত ভাল লেগেছে যে সেই বিষয়ে আলোচনা করবার বাসনায় এসেছেন। সেই অবধি সত্যজিৎ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী এসে মিউজিকের আসরে যোগ দিতেন।

তারপর অক্টোবর মাসেও বেশ ধুমধাড়াক্কা করে সমসাময়িক দ্বিতীয় সংখ্যা বের হলো। কিন্তু হায়! ভগবান বাদ সাধলেন। তৃতীয় সংখ্যা বের করার তোড়জোড় চললেও 'নূতন পত্রিকা'র অবস্থা হল। টাকার অভাবে বন্ধ করে দিতে হল। এই সমসাময়িক পত্রিকা দুখানা। এখনও কারো কারো হাতে আছে জানি। তবে সত্যজিতের হাতে আছে সেটা আমার ভাল করেই জানা আছে। কিছুদিন আমাদের কপিও পাওয়া যায়নি। তাই ঐ ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে প্রবন্ধখানা একবার ছোট দেওর (বিনু) আমার ভাসুরের কপি থেকে আমাদের হাতে নকল করে লিখে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে, সেটা যত্ন করে আমার কাছে রাখা

আছে। পরে ছেলে জানিয়েছে যে, দিল্লীতে ওঁর বইএর মধ্যে সংখ্যা দুটো পেয়েছে।

এর কিছুদিন পরেই পুলিশে সুভাষবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্ধ করলো। তারপর ১৯৪০এর শেষের দিকে ছাড়া পেলেও তাঁর বাড়ীর বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি ছিল না। তারপর ১৯৪১ সনের জানুয়ারীর শেষের দিকে শোনা গেল একদিন যে তিনি দেশ ছেড়ে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছেন। কি করে, কোথা দিয়ে, কোথায় গিয়েছিলেন, এই নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। সঠিক জানা বড় মুস্কিল। তবে আমাকে একদিন দিল্লীতে ১৯৫৭ সনে ইটালীয়ান এম্বাসাডার 'কাউন্ট জুস্টো দেল জার্দিনো' বলেছিলেন, তিনি কিছু এতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। একদিন দুপুরে তাঁর বাড়ীতে আমাদের লাঞ্চে খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই মাঠে শীতকালের রোদ্দুরে বসে গল্পসল্প হচ্ছে। তিনি আমার পায়ের কাছে ঘাসের ওপর বসে অনেক কথা বলতে বলতে বললেন, 'জান ! ১৯৪১ সনে আমি কাবুল এম্বেসীতে কাজ করতাম ইটালীয়ানদের তরফে এবং সেই সময়ে আমি নিজে চন্দর বোস্'কে বার্লিন যেতে সাহায্য করেছিলাম। তিনি সুভাষ বোস নাম না বলে বার বারই কেবল চন্দর বোস চন্দর বোস বলে উল্লেখ করছিলেন।

১৯৪০এর জুন মাস নাগাদ একদিন দুপুরে কাজ থেকে এসে খবর দিলেন যে, ভবানীপুরে চক্রবেড়ে রোডে একটা বাড়ী খালি হয়েছে, সেটা শরৎবাবুর বড় জামাই্এর বাড়ী। তিনি নিজে ইজ্জত নগরে কাজ করেন। বাড়ীটা ভাড়া দেবেন। বললে পর আমরা সে বাড়ীটা ভাড়া নিতে পারি। বেশ বড় বাড়ী —৬ খানা ঘর, ছাদে সুন্দর চিলেকোঠা, দুটি ছাদ, রান্নাঘর, বাথরুম অনেকগুলি। বাড়ী ভাড়া ৮০ টাকা। বাড়ীটা নিলে সুবিধেই হয় ; কারণ রোজ দুই বেলা শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর যাওয়া আসা ওঁর পক্ষে বড় বেশী টানাপোড়েন হতো। কিন্তু ভাড়াটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে বলে কি করা না করা বলাবলি করছি, এর মধ্যে ত্রিদিব চৌধুরী বলে এক ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন শরৎবাবুর আপিসে এবং ওঁর সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গিয়েছিল ; সব শুনে বললেন, আপনাদের যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে আমায় যদি একতলার একখানা ঘর ও একটু রান্নার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাহলে আমার চাকরটিকে নিয়ে থাকতে পারি। এই শুনে বললাম বেশ ভালই হলো। ৫০ টাকা ভাড়া থেকে একেবারে ৮০ টাকা ভাড়া বেশীই হয়ে যাচ্ছিল। বাড়ীটা একেবারে হাতছাড়াও করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, সুন্দর খোলামেলা দেখে।

কথাবার্তা বলে বাড়ীটা ১লা আগস্ট থেকে ভাড়া নেওয়া ঠিক হলো এবং সেই অনুযায়ী যতীন্দ্র ম্যানসনের বাড়ীওয়ালাকে জানিয়ে দেওয়া হল।

৩১শে জুলাই বিকেলে রাম নতুন বাড়ী এসে সব ঘরদোর ধুয়ে পরিষ্কার করে গেল। ১লা আগস্ট ভোরে উনি কাজে যাবার আগে ছেলেদের নিয়ে আমায় চক্রবেড়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এতদিন ফ্ল্যাটে থাকার পর এতবড় বাড়ী, বাইরের দিকে একটু বাগান, কয়েকটা পামগাছ, পেয়ারাগাছ দুটো তিনটে, মস্তবড় গন্ধরাজ ফুলের ঝাড়, শিউলি ফুলের গাছ এসব দেখে খুবই আনন্দ হলো ; সেই সঙ্গে ওরকম

খোলামেলা পেয়ে ছেলেরাও আত্মহারা হয়ে পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো।

ওদিকে বিনু একটা ট্রাক ভাড়া করে চাকরদের নিয়ে সব জিনিসপত্র কয়েক খেপে নিয়ে এলো। মা, বাবারা এই বাড়ীর কাছে রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে থাকতেন। সেদিনকার আমাদের সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা মা-ই রেঁধেবেড়ে পাঠিয়ে দিলেন।

দু-তিনদিনের মধ্যেই সব জিনিসপত্র উনি নিজের হাতেই গুছিয়ে বাড়ী ঠিক করে ফেললেন।

ত্রিদিববাবুও কয়েকদিনের মধ্যে এসে গেলেন। তাঁকে একতলার একখানা ভাল ঘর দেওয়া হল। তিনি শোবার জন্য একটা নতুন খাট ও পড়াশুনা কাজের জন্য একটা টেবিল ও চেয়ার কিনে আনলেন। তাঁর চাকর কিছু নতুন বাসনপত্রও কিনে আনলো।

চক্রবেড়েতে এসে কাছে হওয়াতে সন্ধ্যেবেলা কাজের পর একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসতে পারতেন। এবং তখন থেকে আবার বাড়ীতে এসে খাওয়া-দাওয়া সব করতেন। রাত্তির বেলা কাজ থেকে এসে ত্রিদিববাবু ও উনি দুজনে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গ্রামোফোনে বাজনা শুনতেন। আবার কখনো পড়াশুনা নিয়ে নানা আলোচনা করতেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি এক সন্ধ্যায় দুজনে বসে গান-বাজনা শুনতে শুনতে রাত ১২টা বাজিয়ে ফেলেছেন। তারপর দুজনেই গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। প্রায় রাত একটা নাগাদ হঠাৎ শুনতে পেলাম খুব জোরে খট্‌খট্ করে কে আমাদের বাইরের সদর দরজার কড়া নাড়া দিচ্ছে। আমি আমার শোবার ঘরের জানলার খড়খড়ি তুলে অন্ধকারে দেখতে পেলাম দরজার বাইরে কতগুলি লাল পাগড়ী মাথায় পুলিশ লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠি নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই সময়ে আবার চারিদিকে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সকলকে পুলিশ ধরপাকড় আরম্ভ করেছিল। ত্রিদিববাবু কতখানি সংশ্লিষ্ট ছিলেন জানি না। তিনি বিপ্লববাদীর একজন বলে তাঁর নাম পুলিশে লেখা ছিল।

সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আমি আস্তে করে অন্ধকারে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে উনি ঘুমোচ্ছিলেন, জাগিয়ে দিলাম এবং আবার যেই উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করছি, দেখি ত্রিদিববাবু উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। একজন ইনস্পেক্টার হাতে কাগজপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই সব দেখিয়ে ত্রিদিববাবুর সঙ্গে কি কথাবার্তা হলো। দুটো পুলিশ সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়, অন্য সবাইকে ত্রিদিববাবু ভেতরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি চুপিচুপি ওঁকে সব ব্যাপারটা বলাতে উনি উঠে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে ওপরে এসে বললেন, ত্রিদিববাবুকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছে। এই বলে আবার নীচের তলায় চলে গেলেন এবং দু পক্ষেরই সাক্ষী স্বরূপ সেখানে বসে রইলেন। ত্রিদিববাবুর জিনিষ, বই কাগজপত্র সব তছনছ করে খানাতল্লাসী করে ভোর ৪টা নাগাদ

তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে গেল। ওঁর একখানা বই 'ট্রট্‌স্কি'র বল্‌শেভিক বিপ্লবের ইতিহাস ত্রিদিববাবু পড়তে নিয়েছিলেন, সেখানাও নিয়ে গেল পুলিশে সঙ্গে করে, আর ফেরৎ পাওয়া গেল না। তবে পুলিশ উপরে এসে আমাদের কোন উপদ্রব করবার চেষ্টাই করেনি। একদিন পর ত্রিদিববাবুর চিঠি পেয়ে তাঁর কাগজ এবং বইপত্র ও কাপড়-চোপড় সব জেলে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি জেলে গেলেন ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আর আটক রেখেছিল ১৯৪৬ সন পর্যন্ত।

জেল থেকে ফেরার কিছুদিন পরে ত্রিদিববাবুর এক ভয়াবহ বিপদ ঘটেছিল। তিনি রাত্রের ট্রেনে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ব্রীফ্‌কেসে তাঁর কাগজপত্র এবং নাম, ঠিকানা লেখা কার্ড ছিল। মাঝরাতে একটা লোক কোন এক স্টেশনে তাঁর গাড়ীতে উঠে বসে। কিছুক্ষণ আলাপ-সালাপ করার পর হঠাৎ লোকটা উঠে তাঁকে আক্রমণ করে। তাঁর কানের উপরের একটু অংশ কেটে ফেলে। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লে তাঁকে ধরে জোর করে তাঁর গায়ের জামা-কাপড় সব খুলে নিয়ে চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি দেখলেন গভীর রাতের অন্ধকারে রেললাইনের ধারে জামা-কাপড়-বিহীন হয়ে পড়ে আছেন। কানেও খুব যন্ত্রণা, ওঠবার শক্তি নেই। কোনক্রমে মাথা তুলে দেখলেন কিছু দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। তখন অতিকষ্টে সেই আলোর দিকে হামা দিয়ে যেতে গিয়ে একটা ছোট কুঠরীতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে জোরে ডাকাডাকি করতে কুঠরী থেকে সম্ভবতঃ রেলের কোন ছোট কর্মচারী বেরিয়ে এসে তাঁর অবস্থা দেখে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে গিয়ে কাপড়জামা পরিয়ে সামান্য কিছু খাইয়ে সব জিজ্ঞাসাবাদ করে সমস্ত ঘটনা যখন শুনলো, তৎক্ষণাৎ থানায় গিয়ে পুলিশে খবর দিল।

পুলিশ এসে সব খবরাখবর করে ত্রিদিববাবুকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে চারদিকে টেলিফোন করতে আরম্ভ করলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে ধরে ফেললো। সে দিব্যি নকল ত্রিদিব চৌধুরী সেজে তাঁর টাকা পয়সা, কাগজপত্রসুদ্ধু ব্রিফ কেস হাতে নিয়ে কোন একটা স্টেশনে পৌঁছে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে পুলিশে তাকে সন্দেহ করে ধরে ফেলে এবং হাতে হাতে তার প্রমাণ হয়ে গেল, ব্রীফ কেসের মধ্যে ত্রিদিববাবুর নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড ছিল।

এই ঘটনার কয়দিন পরে তিনি দিল্লীতে এসে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। ব্যাপারটা তাঁর মুখ থেকেই শোনা, তবে ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা কাগজে বের হয়েছিল। ত্রিদিববাবু এখন পার্লামেন্টের লোকসভার রেভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য।

ত্রিদিববাবুকে ধরে নিয়ে যাওয়াতে আমাদের সকলেরই মন খুব খারাপ। ছেলেরা ত্রিদিবকাকা, ত্রিদিবকাকা বলে তাঁর সঙ্গে খুব মিশে গিয়েছিল। উনি ও বিনু দুজনেই গল্পসল্প করবার একজন সঙ্গী পেয়েছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই পূজো এসে গেল। উনি বললেন, 'এত বড় অসুখ থেকে উঠলে, একটু হাওয়া বদলানো উচিত হবে ; চলো সবাই মিলে ছুটিতে কয়দিন টলুর (ন'দেওর)

ওখানে জামসেদ্‌পুর ঘুরে আসি। জামসেদ্‌পুরে তখন 'কদ্‌মা' বলে একটা নতুন কলোনী হয়েছিল টাটা কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য, তারই একটা কোয়ার্টারে তখন টলু থাকতো। আমরা রওয়ানা হবার আগেরদিন টলুকে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল কোন্ গাড়ীতে এবং ক'টার সময় পৌঁছব জানিয়ে। আশা করেছিলাম টলুকে স্টেশনে দেখবো। কিন্তু জামসেদপুর স্টেশনে ভোরে পৌঁছে দেখি কেউ কোত্থাও নেই। অগত্যা গাড়ী ডেকে আমরা নিজেরাই পৌঁছে দেখি টলু দিব্যি দরজা এঁটে ঘুম দিচ্ছে। চেঁচামেচি গণ্ডগোল শুনে দরজা খুলে আমাদের দেখে ত সে অবাক্। শুন্‌লাম যে সে আমাদের টেলিগ্রাম পায়নি। মালপত্র কিছু গোছগাছ করে সবাই মিলে যখন চা জলখাবার খাওয়া হচ্ছে, তখন পিওন আমাদের দুদিন আগে পাঠানো সেই টেলিগ্রাম নিয়ে এসে উপস্থিত।

আমাদের দেখে টলু খুব খুশী। একটু পরেই তাকে কাজে চলে যেতে হলো। বলে গেল, 'দুপুরের পর আজ আর কাজে যাবো না, ছুটি নিয়ে নেবো, তখন গল্প-সল্প হবে।'

১৯৩৮ সনে জামসেদ্‌পুরের যে জায়গাটায় 'সার্কিট হাইওয়েতে' ছিলাম তার চাইতে কদ্‌মা কলোনীটা আরও অনেক খোলামেলা দেখলাম। সেবারে কাছেই ছিল 'সুবর্ণরেখা' নদী, আর এবার কদমার কাছে ছিল 'খড়কাই' নদী। উনি ও টলু প্রায়ই ছেলেদের নিয়ে খড়কাই নদীতে স্নান করতে যেতেন। বড়ছেলে ধ্রুব জলকে বেজায় ভয় করতো কিন্তু মেজো ছেলে কীর্তি জলে নামতে খুব ভালোবাসতো। একদিন তার শখ হলো সে নদী পার হয়ে ওপারে যাবে। এত গভীর জলের ভেতর দিয়ে কী করে যাবে ? ইত্যাদি অনেক বোঝান সত্বেও সাংঘাতিক বায়না ধরেছে, সে যাবেই যাবে। অগত্যা উনি আর টলু দুজনে মিলে কীর্তির কোমরে একটা দড়ি ফাঁস দিয়ে বেঁধে দড়ির দুমাথা দুভাইএ নিজেদের হাতে শক্ত করে জড়িয়ে নিয়ে ছেলেকে নিয়ে জলে নেমে আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে লাগলেন। ক্রমশঃ জল বাড়তে লাগলো, কিন্তু সে কিছুতেই দম্‌লো না। শেষ পর্যন্ত তাকে অন্যপারে নিয়ে যেতেই হলো।

আরেকটা খেয়াল উঠ্‌লো তার। নদী থেকে সমানে নানারকম সাইজের ছোট বড় গোল, নানারকমের নানা আকারের নুড়ি পাথর কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগলো। দিন পনেরো পর যখন কলকাতা ফেরার জন্য সব গোছগাছ আরম্ভ হয়েছে, তখন আবার ছেলের বায়না সুরু হলো যে সে যত নুড়িপাথর কুড়িয়ে জড়ো করেছে সব কলকাতা নিয়ে যাবে। ছেলেমানুষের আব্দার, কিন্তু সেটা না শুনলে তার মনে বড়ই আঘাত পাবে ভেবে একটা বালিশের ওয়াড-এ নুড়িগুলি ভরে নিতে দিলাম। কিন্তু তার ভয় পাছে ওগুলো লুকিয়ে কেউ ফেলে দেয়। সে ট্রেনে সারাক্ষণ নুড়ির পোঁটলা নিজের কাছে সামলে রাখলো।

পরদিন সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে বের হয়েছি মাত্র হঠাৎ তার হাত থেকে নুড়ির পোঁটলা ফেটে ছিঁড়ে সব নুড়ি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো। রাস্তায় এক পুলিশ পাহারাদার ছিল; ছেলেকে পাগলের মত নুড়ি কুড়োতে দেখে তার ত হাসি আর থামে

না। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো 'এখে পাথর কাহাঁ সে লে আয়া হায় খোকা বাবুজী ?' বলে সে-ও নুড়ি কুড়িয়ে দেবার জন্য সাহায্য করলো।

ফিরে আসার কয়দিন পরেই আবার আমার জ্বর উঠতে আরম্ভ করলো। ডাক্তার এসে বুক পিঠ সব পরীক্ষা করে আবার চলাফেরা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকবার ব্যবস্থা দিলেন। আমার ও ছোটছেলেকে এসে দেখাশোনা করবার জন্য সরলাকে ডেকে পাঠাতেই সে এসে সমস্ত কাজের ভার বুঝে নিল।

ইতিমধ্যে হিরু তার তেলের কারখানা আর চালাতে না পারায় মেসিন ইত্যাদি সব বিক্রী করে ব্যবসা তুলে দিয়ে ঠিক করলো সে নিজে এসে আমাদের কাছে থাকবে এবং স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের তার শ্বশুরবাড়ী কটকে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেবে। ছোট জা এসে আমায় বললে, মেজদি, আমি চিনুকে (তাদের বড় ছেলে) নিয়ে যেতে চাই না, আপনার কাছে যদি ও থাকে আমি খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

বললাম, থাক এখানেই। বিছানায় শুয়ে শুয়েই যতটা সম্ভব ছেলেদের তদারক করতাম। বড় ছেলে, মেজ ছেলের সঙ্গে চিনুকেও পড়ানোর ভার করালীবাবুর উপর দিয়ে দিলাম।

যাদবপুরে চারদিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বড় হয়ে চিনুর গাছপালার দিকে খুব ঝোঁক দেখলাম। একদিন সে তার বাবার সঙ্গে যাদবপুরের দিকে কোথায় গিয়েছিল, সেখান থেকে একটা কুঞ্জলতার ছোট্ট চারা এনে, আমাদের উঠোনের এক কোণে একটু মাটি ছিল, কাছেই একটা শিউলি ফুলের গাছ, সেখানে সে চারাটা পুঁতে দিল।

আমি বললাম, 'ওখানে অমন জায়গায় গাছটা পুঁতলি, বাঁচবে কি ?'

সে বললে, 'বেঁচে যাবে, মেজ জ্যাঠাইমা।'

কয়েকদিন চারাটা কেমন শুকনো অবস্থায় থেকে তারপর বাড় নিতে আরম্ভ করলো। দেখতে দেখতে সরু সরু ঝিরঝিরে পাতায় ভরে লতাটা দেয়াল বেয়ে লতিয়ে উঠতে লাগলো। তারপর ছোট ছোট লাল ফুল ফুটে সমস্ত ভাঙাচোরা ইঁটের দেয়াল এক অপূর্ব রূপ নিয়ে নিল। পাশেই শিউলিফুলের গাছ, আশ্বিন মাসে সাদা ফুলে ভরা, আবার শিশিরসিক্ত ঝরা ফুলের পাশে ঐ কুঞ্জলতার লতা আমাদের ঐ জীর্ণ উঠোনটাকে একেবারে আলো করে তুললো।

কয়েক মাস কাটলো। হিরুর আর কোন চাকরীর হদিস্ হলো না। তার এই বেকার অবস্থার খবর জেনে যাদবপুর বেঙ্গল বাল্‌ব্ কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার রায় (বড় জায়ের মেজ ভাই) হিরুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের কোম্পানীর গ্লাস্ ফ্যাক্টরী ডিপার্টমেন্টে একটা কাজ ঠিক করে দিলেন। মাসখানেক সেখানে সে কাজ করার পর যাদবপুরে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে কটক থেকে সবাইকে নিয়ে এলো এবং চিনুকেও আমাদের বাড়ী থেকে নিজেদের কাছে নিয়ে গেলো।

বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছি দেখে উনি বললেন, এবারে পূজোর ছুটিতে কোথাও পশ্চিমে শুকনো জায়গায় হাওয়া বদলানোর জন্য যেতে হবে। তা না হলে তোমার

এ রোগ সমূলে সারবে না। আমার মনে মনে কেবল ভয়—আমায় না যক্ষ্মারোগে ধরে। মাঝে মাঝে সেজঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি বলতেন, 'কেন ওসব মিছিমিছি চিন্তা করছো! ভাল করে খাওদাও, হেসে-খেলে বিশ্রাম করে থাক, একেবারে সেরে উঠবে। এই রোগে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে একটু সময় লাগে। শুধু দেখবে শরীরের উপর কোন খাটুনি না পড়ে।'

পূজোর ছুটিতে কোথায় মাসখানেকের জন্য বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় তার খোঁজ খবর করা আরম্ভ হলো। একদিন সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে বললেন, 'একটু আগে হেমেনবাবু এসেছিলেন শরৎবাবু কাছে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কোথায় যাওয়া যায় জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন এলাহাবাদে তাঁদের চেনা এক ভদ্রলোক আছেন, তাঁরা বাড়ী ঠিক করে দিতে পারবেন। তার পরের দিনই হেমেনবাবু তাঁর বড়ছেলে প্রভাতকে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য। প্রভাত তার এক বিশেষ বন্ধু মদন এলাহাবাদের বাসিন্দা, তাকে লেখার সঙ্গে সঙ্গেই এক মাসের জন্য একটা বাড়ীর ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আগে আর কখনো পশ্চিমমুখো যাওয়া হয়নি। ই. আই. আর রেলওয়ের নাম অনেক শুনেছিলাম, সেই লাইনে যাওয়া হবে : এলাহাবাদে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যেখানে কয়েকবছর পর পর কুম্ভমেলা হয় সেই জায়গাটা দেখতে পাব ; এসব মনে করে খুব স্ফূর্তি এলো মনে। তাছাড়া এলাহাবাদে-এ কি রকম সুস্বাদু বড় বড় পেয়ারা পাওয়া যায় ও নানারকম গল্প শুনে শুনে একটা কাল্পনিক এলাহাবাদ মনে এঁকে রেখেছিলাম।

আমার বয়স তখন বোধহয় তিন কিম্বা সাড়ে তিন, পুঁটু খুবই ছোট, সেই সময়ে এলাহাবাদে একটি খুব বড় একজিবিশন হয়। বাবা ও তাঁর বন্ধু কালীসদয় ভট্টাচার্য দুজনে মিলে সেই একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন এবং ভাবলেন সঙ্গম দেখে কাশী, গয়া সব তীর্থ করে ফিরবেন। এলাহাবাদে একজিবিশন থেকে বাবা আমাদের চার বোনের জন্য চার সেট্ শ্বেত পাথরের থালা, বাটি, গেলাস কিনে নিয়ে এসেছিলেন। সেই বাটি, গেলাসের আবার কি সুন্দর ঢাকনা শ্বেত পাথরের। মা যখন মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের বাসনগুলি বাক্স থেকে বের করে ধুয়ে মুছে শুকিয়ে আবার যত্ন করে তুলে রাখতেন, আমরা খুবই কৌতূহলচোখে সেগুলি দেখতাম। সব বোনেদের বিয়ের যৌতুকে এগুলোও দিয়েছিলেন।

এলাহাবাদে যাবার জন্য আরেক কারণেও বিশেষ উৎসুক ছিলাম। সেটা হলো পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মস্থান বলে। তিনি যে বাড়ীতে জন্মেছিলেন তার নাম 'আনন্দ ভবন' এবং সেই বাড়ীটাও দেখবো মনে করে। ১৯২৮ সনে পণ্ডিত নেহেরুকে কংগ্রেসের সময় দেখে এবং অল্পস্বল্প আলাপের সুযোগ পেয়ে, তারপর আরো কয়েকবারই স্টুডেন্ট কনফারেন্সএ তাঁর সংস্পর্শে আসার পর তাঁর ওপর বেশ একটা অগাধ ভক্তি এসে গিয়েছিল।

সেবারে অক্টোবর মাসের প্রথমে পূজো। ঠিক হলো মহালয়ার দুদিন আগে এলাহাবাদ রওয়ানা হব। বাড়ীতে সবার মধ্যে একটা সাংঘাতিক ধুমধাড়াক্কা পড়ে গেল। সেখানে গিয়ে এক মাসের জন্য একটা সংসার পাত্‌তে হবে ; কি কি বাসন যাবে, কিছু খাবার জিনিসপত্র অন্তত দেড়দিন দুদিনের মত লিস্ট করে রামকে গোছ করে রাখতে বললাম। বিনু ঠিক রওয়ানা হবার আগে প্যাক্ করে দেবে। ধনুকে ডেকে ছেলেদের কাপড়জামা, বই, খেলনা সব একত্র করিয়ে নিজেই সব গুছিয়ে নিলাম।

বিনুকে টিকিট কিনে গাড়ী রিজার্ভ করতে পাঠাবেন, এর মধ্যে হঠাৎ বললেন, 'নীলিমার (সেজ জা) শরীর খারাপ চলেছে, ক্ষীরোদকে জিজ্ঞাসা করি তাকে আমাদের সঙ্গে এলাহাবাদে পাঠাবে কিনা। সেখানে গেলে হয়ত স্থান পরিবর্তনে তারও স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হতে পারে।' সেজঠাকুরপো এই প্রস্তাবে খুবই খুশী হয়ে আমাদের সঙ্গে নীলিমাকে পাঠাবার উদ্যোগ আরম্ভ করে দিলেন। করালীবাবুকেও জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি যাবেন কিনা। বলা মাত্র তিনিও যেতে রাজী, শুধু বললেন, আপনারা রওয়ানা হয়ে পড়ুন, আমি কেবল দিনকয়েকের জন্য দিনাজপুর গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আপনাদের ওখানে এসে যাবো।

নির্ধারিত দিনে একটা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করে সন্ধ্যার গাড়ীতে হাওড়া স্টেশন থেকে এলাহাবাদ রওয়ানা হওয়া গেল। ধনুকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, তারও চাকরদের কামরায় জায়গার ব্যবস্থা ছিল।

গাড়ী ত ঠিক সময়ে সন্ধ্যেবেলা হাওড়া স্টেশন ছাড়লো, কিন্তু ট্রেন চলার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘড়ঘড়ানি শব্দ শুনে ছোট ছেলে বাবলুর (পৃথ্বী) কি কান্না, কি ভয়। তখন তার বয়স বছর দুই। আমার দুর্বল শরীর নিয়ে তাকে কোলে নিতে পারতাম না। সে, কেবলই চীৎকার করে কাঁদে আর বলে, 'বাবা কোলে নাও।' সারাটা রাত ওঁকে জেগে বাবলুকে কোলে নিয়ে আমাদের কম্পার্টমেন্টের একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে হলো।

গাড়ী হাওড়া থেকে বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ থেকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক কর্ড লাইনএ হাজারিবাগের ভেতর দিয়ে চল্‌লো। আগে কখনও এই লাইনে যাতায়াত করি নি, তবে বড় স্টেশনগুলির একটা কাল্পনিক দৃশ্য মনে এঁকে রেখেছিলাম। ভোরের দিকে গাড়ী এসে যখন গয়া স্টেশনে থামলো তখন কত কথাই মনে আসতে লাগলো। এই গয়াতেই ফল্গুনদীতে আমাদের হিন্দু পরিবারের বহু লোক তাঁদের পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করবার উদ্দেশ্যে এসে থাকেন। কি দেখবো ভেবেছিলাম জানি না। গয়া পৌঁছানো মাত্র তাড়াতাড়ি গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম এ ত একটা বড় স্টেশন মাত্র। ফেরিওয়ালা হাঁকছে গরম চা, পান বিড়ি সিগারেট, দেশী লোকের জলখাবারের জন্য কাঁচের বাক্সে নানারকমের মিষ্টি খাবার নিয়ে মিঠাইওয়ালা গাড়ীর জানালায়, জানালায় টুঁ মারছে। আর উপরের শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য পাগড়ী মাথায় উর্দি পরে ট্রেতে ছোটা হাজরি সাজিয়ে নিয়ে এদিক থেকে ওদিক এত ব্যস্ত হয়ে দৌড়চ্ছে আরদালীর দল, দেখে একটু দমে গেলাম। সিটি বাজিয়ে, সবুজ নিশান

উড়িয়ে গাড়ী রওয়ানা হলো সাসারামের দিকে।

সকালে ট্রেন থেকে দেখতে পেলাম সাসারামে শেরশাহের সমাধি। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশটা সাসারাম থেকে ডেহ্‌রী অন্ সোন্ পর্যন্ত রেল লাইনের পাশাপাশি চলে গিয়েছে দিল্লী পর্যন্ত সেটা দেখা গেল। প্রথম শেরশাহ্ এই রাস্তা করিয়েছিলেন দিল্লী থেকে বর্ধমান পর্যন্ত মালপত্র সরবরাহের সুবিধার জন্য, পরে ইংরেজ রাজত্বে এটা অনেক ভাল ও বড় করে গড়ে নেওয়া হয়েছিল। বহু জায়গা দিয়ে এই রাস্তা রেললাইনের পাশাপাশি সমানে পার হয়েছে। এখনও রেলে না গিয়ে গাড়ীতে এই রাস্তায় কলকাতা থেকে দিল্লী যাতায়াত করা যায়।

ক্রমশঃ বিখ্যাত মোগলসরাই জংশন হয়ে চুনার, মির্জাপুর পার হয়ে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ এলাহাবাদ পৌঁছানো গেল। গাড়ী থেকে নেমেই দেখতে পেলাম প্রভাতের বন্ধু মদনবাবু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। এগিয়ে এসে আলাপ-পরিচয় করার পর উনি বললেন, 'মালগুলো সব এক জায়গায় রেখে আমরা স্টেশনের কোন রেস্টুরেন্টে এবেলার খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নিয়ে তারপর বাড়ী যাই। বাড়ী পৌঁছিয়েই রান্নাবান্নার যোগাড় করা অসুবিধা হবে।' এই শুনে মদনবাবু বললেন, 'সে কি! দিদি যে আপনাদের জন্য রেঁধে সব তৈরী করে রেখেছেন। বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেই পাঠিয়ে দেবেন।'

আমরা মালপত্র সব টাঙ্গায় (দু চাকার ঘোড়ার গাড়ী, পিঠোপিঠি চারজন করে সামনে পিছনে বসা যায়) চাপিয়ে কোনক্রমে উঠে বসলাম। মদনবাবু সামনের গাড়ীতে বসে টাঙ্গাওয়ালাকে পথ দেখিয়ে লুকারগঞ্জে নিয়ে এলেন। বাড়ীটার নাম 'তারাকুটীর'। বিশাল বড় গেটের ভেতর দিয়ে বাড়ীটায় বাগানের ভেতর দিয়ে ঢুকবার সময় দুধারে গোলাপী রং-এর স্থলপদ্মের 'হেজ', বেলফুল, জুঁইফুলের ঝাড় এসব দেখে খুবই ভাল লাগলো। বাড়ীটার একতলাতেই অনেকগুলো ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর, বড় উঠোন ইত্যাদি থাকাতে আমরা একতলাতেই থাকা ঠিক করলাম। দোতলায় আর উঠলামই না।

মদনবাবুর দিদি এত খাবার পাঠিয়ে দিলেন যে আমাদের সন্ধ্যার খাওয়ার জন্যও নিজেদের কোন হাঙ্গামা করতে হলো না। মালপত্র খুলে সব গুছিয়ে নেওয়া হলো। বাড়ীটা বেশ বড়, চারদিকে গাছপালা, ঝোপঝাড়। বাড়ীর কাছে ধারে আর অন্য কারোর বসতির লক্ষণ নেই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, নিঝুম অন্ধকার, মাঝে মাঝে জোনাকী জ্বলছে আর অবিশ্রান্ত ঝিল্লী পোকার আওয়াজ ছাড়া আর কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই। একটু ভয়ে ভয়েই রাত কাটালাম। পরদিন সকালে উনি বেরিয়ে চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখে এসে বললেন, না, ভয়ের কোন কারণ নেই। কয়েকঘর ভদ্রলোকই এ পাড়ায় থাকেন ; তবে সকলের বাড়ীই একটু দূরে দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

মদনবাবু তাঁর দিদিকে নিয়ে এলেন একদিন। সকলে মিলেই আশ্বাস দিলেন যে এলাহাবাদ জায়গা ভাল। ভয়ের কোন কারণ নেই।

ঐ জায়গাটার নাম ছিল 'লুকারগঞ্জ', বনেদী পাড়া। বাড়ী সব দূরে দূরে হলেও

সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের বাস ছিল ঐ পাড়ায়। এই লুকারগঞ্জ থেকেই ব্রিটিশ আমলের 'সিভিল লাইন' আরম্ভ হয়। আমাদের বাড়ীটা ছিল লুকারগঞ্জের শেষ সীমানা।

বাড়ীটার সামনে ছিল সুন্দর নানারকমারি ফুলের বাগান আর পেছন দিকে অনেকখানি জমি নিয়ে ছিল আম, লিচু, আতা ও পেয়ারার বাগান। এলাহাবাদ ভাল পেয়ারার জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ বাড়ীতে ফুলবাগান ও ফলবাগান দেখাশোনা করবার জন্য এক মালী ছিল। পেছনের বাগানে বড় বড় সব গাছ ও ঝোপঝাড় দেখে আমার ত বেজায় স্ফূর্তি। রোজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেদের নিয়ে গাছতলায় তলায় ঘুরে বেড়াতাম। বাগানে দূরে এক কোণায় একটা খড়ের চালার কুঁড়ে-ঘর ছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করলাম ঐ কুঁড়ে-ঘরে এক বুড়ী থাকে। বুড়ী কে কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে বাগানে যখন যে ফল হয়, সেই ফলের গাছগুলি বুড়ীর ছেলে ইজারা নিয়ে ফল পাকলে সেগুলো পেড়ে বাজারে বিক্রী করে। গাছের ফল শেষ হয়ে গেলে সে তার গ্রামের বসত-বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র সন্তানাদির কাছে চলে যায় বুড়ীকে একাই ঐ কুঁড়ে-ঘরে ফেলে রেখে।

একদিন বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বুড়ীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি বুড়ী কয়েকটা খরমুজার বীচির খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম দুদিন ধরে বুড়ী ঐ খরমুজার বীচি চিবিয়ে আছে, কাদের বাড়ীর আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে এনেছে। পয়সা-কড়ি কিছুই নেই যে খাবার কিনবে। তারপর থেকে আমরা যে কয়টা দিন ওখানে ছিলাম রোজ দুপুরে ও সন্ধ্যায় চাট্টি ভাত, ডালতরকারী যা রান্না করতাম ধনুর হাতে বুড়ীকে পাঠিয়ে দিতাম। বুড়ীকে রোজ খেতে দিতাম বলে সে এত খুসী হয়েছিল যে যখনি আমায় সে বাগানে দেখতে পেতো তখনই তার শীর্ণ হাত দুটি তুলে নমস্কারের সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে বিড়বিড় করে কত কিছু বলে শুভকামনা ও আশীর্বাদ জানাতো।

একদিন সকালের দিকে আমরা সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত ; ছেলেরা নিজেরাই বাড়ীর পেছনের আমবাগানে খেলতে গিয়েছে। হঠাৎ ভীষণ জোরে বাবলুর কান্না শোনা গেল। সবাই হাতের কাজকর্ম ফেলে ছুটলাম বাগানে। আমার মনে মনে কেমন ভয় হতে লাগলো যে সাপেখোপে কামড়ালো না ত ? বাগানে একটা গাছে ভীমরুল প্রকাণ্ড একটা চাক্ বানিয়েছিল মাটি দিয়ে হাঁড়ির মত করে। দৌড়ে গিয়ে দেখি বড়, মেজ দুই পুত্র ভীমরুলের চাকে একটা ঢিল মেরেই ছোট ভাইকে ফেলে দুজনে মিলে ছুটে পালিয়েছে সেখান থেকে। আর রাগান্বিত ভীমরুলের দল ভন্‌ভন্ করে চাক থেকে বেরিয়ে গাছতলায় বাবলুকে পেয়ে তাকে ছেঁকে ধরেছে। ধনু কোনক্রমে তাড়াতাড়ি বাবলুকে কোলে নিয়ে ভীমরুলের মুখ থেকে উদ্ধার করে আনলো। দেখতে দেখতে বেচারী বাবলুর মুখ, চোখ সব লাল হয়ে ফুলে উঠলো। তখন তখন ওষুধপত্র লাগানো সত্ত্বেও সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বেশ কয়েকদিন লেগে গেল।

চারদিক খোলামেলা গাছ-গাছড়া পেয়ে ছেলেদেরও আমোদ খুব বেড়ে গিয়েছিল।

সারাটা দিন নানারকম দুষ্টুমি করে বেড়াতো। আমার শোবার ঘরের একটা জানালার পেছনেই বাইরে একটা বড় লেবু গাছ ছিল। লেবু ফুলের গন্ধে একেবারে ঘরখানা ভরপুর হয়ে থাকতো, সেজন্য আমি জানালাটা সারাদিন খোলাই রেখে দিতাম। একদিন দুপুরে শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম দুই ছেলে হাত বাড়িয়ে লেবু গাছের ডাল ধরে নাড়া দিচ্ছে আর বলছে, পেঁচা, তুমি কি ঘুমোচ্ছ? তারা কার সঙ্গে কথা কইছে জিজ্ঞেস করায় বললে, লেবু গাছের ডালে বসে একটা পেঁচা সর্বক্ষণ ঘুমোয়। তাদের কথা শুনে উঠে জানলার ধারে গিয়ে দেখলাম, সত্যি একটা পেঁচা বসে বসে ঝিমোচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে চোখ খুলে পিট্‌পিট্ করে দেখাচ্ছে। ওরকমভাবে পেঁচাকে বসে থাকতে দেখে আমারও খুব আমোদ লাগলো; সুবিধে হলেই জানলার ধারে এসে পেঁচাকে দেখে যাই। তবে গাছের ডাল নেড়ে নেড়ে রোজ ছেলেরা এত জ্বালাতন করতো যে বেচারী পেঁচা বিরক্ত হয়ে ওখান থেকে উড়ে কোথায় চলে গেল।

দিনকয়েক পরে করালীবাবুও এসে গেলেন। তিনি এসে যাওয়ার পর আমরা সবাই মিলে দূরে দূরে ঘুরতে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলাম।

বাড়ীর খুব কাছেই ছিল 'খস্‌রুবাগ'। খসরুবাগের ঐতিহাসিক কাহিনী হলো মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পুত্র 'খস্‌রু' পিতৃ-বিদ্রোহ করার ফলে ঐ বাগানের ভিতর তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। যোল বছর বন্দী থাকার পর তার বৈমাত্রেয় ভাই শাহজাহান যিনি পরে বাদশাহ পদে আরোহণ করেন, তাকে খুন করিয়ে ঐ বাগানে তাকে কবর দিয়েছিলেন। খস্‌রুর মায়ের কবরস্থানও ঐখানেই ছিল। তিনি রাজপুতকন্যা ছিলেন। বেগম যখন শুনলেন যে তাঁর পুত্র খস্‌রু পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছে, তখন তিনি দুঃখে আত্মহত্যা করেন। খস্‌রুর বোনেরও ওখানে আরেকটা কবর ছিল। তিনজনের কবরই পাশাপাশি রাখা ছিল। এই প্রথম মোগল স্থাপত্য দেখে বেশ ভাল লাগলো।

অনেকগুলো সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঐ খস্‌রুবাগের ভেতর যেতে হয়। উনি প্রায়ই আমাদের নিয়ে গিয়ে খস্‌রুবাগের সব স্থাপত্য খুঁটিনাটি করে দেখাতেন। আমার ত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে প্রাণ শেষ হতো। আর বোধহয় কবরস্থান বলে নীলিমার ওখানে যাওয়া পছন্দ হতো না। একদিন সে রেগে আমায় বললে, 'মেজদাকে এ কি খস্‌রুবাগে পেয়ে বসেছে?'

তবে এলাহাবাদ জায়গা সবারই খুব ভালো লেগে গিয়েছিল।

একদিন সকালে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ উঠোনে সব টিন ফেলার আওয়াজ, লোকজনের চলাফেরার শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দেখি দুটো তিনটে মিস্ত্রি খুব ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে বললো, ওপরের তলায় অন্য লোক আসছে, সেজন্য দু ভাড়াটেকে বেড়া দিয়ে উঠোন আলাদা করে দেওয়া হবে। এই বলে কতগুলি মরচে ধরা করোগেটেড পুরোনো টিন দিয়ে বেড়া তৈরী করলো। আমরা আর কিছু বললাম না কিন্তু একটু অবাকও হয়ে গেলাম। কারণ

বাড়ী যখন ঠিক হলো তখন শুনেছিলাম পূরো বাড়ীটাই আমাদের। যাই হোক নীচের তলায় আমাদের যথেষ্ট জায়গা ছিল, সেজন্য আমরা চুপ করেই রইলাম।

পরদিন বিকালে কলকাতা থেকে এক পরিবার ওপরের তলায় এসে গেলেন। তাঁরা এসেই সাংঘাতিক চেঁচামেচি হৈ-চৈ সুরু করে দিলেন। নীচের তলায় উঠোনের একদিকে তাঁদের রান্নাঘর ছিল। বাড়ীর গিন্নী, মাঝে মাঝে কর্তাও উপরের তলা থেকেই জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি রান্না হবে, কি জিনিস বাজার থেকে আসবে কিম্বা সকাল বিকেল চায়ের সঙ্গে সবাই কি খাবেন ঠাকুরকে হুকুম দিতেন।

আমরা রোজই বিকেল তিনটা থেকে চারটার মধ্যে বেড়াতে বেরিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ্ বাড়ী ফিরতাম। একদিন সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বেড়িয়ে ফিরে বাড়ীর গেট্ দিয়ে ঢুকে দেখি একি কাণ্ড! কোথায় গেল ঐ সুন্দর ফুলবাগান? কত বেল ফুলের গাছ, জুঁই-এর ঝাড়, শিউলি গাছ, স্থলপদ্মের বিরাট 'হেজ' বাগানের দুদিকের সব কে একেবারে মুড়িয়ে ছেঁটে পরিষ্কার ফাঁকা করে দিয়েছে। বাগান বলতে আর কিছু নেই, একেবারে নির্মূল। সকলে 'হায়! হায়!' করতে লাগলাম। পরে মালীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওপারের ভদ্রলোক কড়া হুকুম দিয়ে বাগান ছাঁটিয়ে দিইয়েছেন, বলেছেন, গাছ-গাছড়া থাকলে মশা হবে।

আমাদের একমাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

আরেকদিন মালী পেছনের বাগানের পেয়ারা গাছগুলোর তলায় গোল করে আল কেটে রেখে ঐ ভদ্রলোকের চাকরকে বলেছে যে সে যেন সারারাত উঠোনের কোণার জলের কলটা খোলা রাখে। পেয়ারা গাছে জল খুব বেশী দরকার হয়। কল থেকে জল পড়ে একটা নালা দিয়ে গিয়ে পেয়ারা গাছের গোড়ায় পড়বে সেজন্য মালী মাটি-কোদাল দিয়ে কেটে জল যাবার রাস্তা করে দিয়েছিল। সারারাত ঝরঝর করে কল থেকে জল পড়তে শুনে ভদ্রলোক সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ভীষণ রেগে চাকরকে খুব বকাবকি সুরু করেছেন, 'তুই ব্যাটা কেন সারারাত কল খুলে রেখেছিস্?' চাকরটাকে কাঁচুমাচু হয়ে বলতে শুনলাম, 'আজ্ঞে! মনোহর (মালী) যে বললো সারারাত যেন কলটা খোলা থাকে।' ভদ্রলোক তখন সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, মনোহর তোর শ্বশুর!'

এঁদের এরকম নানারকম অদ্ভুত আচরণ দেখে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। রকম-সকম দেখে আমরা আর আলাপ পরিচয় করবার সুযোগ দিই নি। একটু দূরেই সরে রয়েছি।

এলাহাবাদের পুরোনো নাম 'প্রয়াগ'। ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি প্রয়াগ একটি তীর্থস্থান। সেখানে গঙ্গা এসে যমুনার সঙ্গে একত্র হয়েছে এবং তার নাম 'সঙ্গম'। সঙ্গমে একদিন যেতেই হবে, যমুনায় স্নান করে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য নয়, বরাবর শুনেছি, সঙ্গমে যেখানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গে এসে মিলেছে সেটা দেখবার মত। এবং সঙ্গমে কুম্ভমেলা হয়, কুম্ভমেলার ছবি দেখে জায়গাটায় যাবার খুবই কৌতূহল হয়েছিল।

দিন ঠিক করে একদিন টাঙ্গা ভাড়া করে খাবার-দাবার কিছু সঙ্গে নিয়ে সঙ্গমে

রওয়ানা হলাম। গঙ্গার ধারে গিয়ে একটা নৌকো ভাড়া নিয়ে নদীর অল্পদূর পর্যন্ত গেলাম। সেখানে ছেলেদের নিয়ে আমি ও উনি দুজনে নৌকোয় বসে রইলাম, আর নীলিমা ও করালীবাবু স্নান করবার জন্য গঙ্গার জলে নেমে এগিয়ে যেতে লাগলেন। দুই নদীতে একত্র হওয়ার দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। যমুনার ঘন নীল জল এবং গঙ্গার ঘোলা হলদে জল প্রবল স্রোতে এসে ঘূর্ণি খেয়ে একের সঙ্গে আর মিশে চলেছে। সেখানকার জল এত গভীর যে কারো সাধ্যও নেই কাছে যাবার। যমুনার জল আবার গঙ্গার চাইতে আরও বেশী গভীর।

আমরা নৌকোয় বসে আছি, হঠাৎ চোখে পড়লো পেছন ফিরে গঙ্গার পারে বিশালকায় সর্বাঙ্গে ভস্মমাখা লম্বা লম্বা জটাজূট সম্পূর্ণ নগ্ন এক সাধু ধূনী জ্বেলে বসে আছে। একদিকে কৌতূহলবশতঃ আমরা যেমন তাকে আড়চোখে দেখবার চেষ্টা করছিলাম, সাধুবাবাও তেমনি তার লম্বা চিমটে দিয়ে একটু পরে পরে ধুনীর আগুন নেড়ে দিতে দিতে মিটমিট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

দূর থেকে এলাহাবাদের ফোর্টটাও পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আর দুই নদীর ওপর অর্থাৎ যমুনার উপর 'যমুনা ব্রীজ' ও গঙ্গার ওপর 'গঙ্গা ব্রীজ' দেখা যাচ্ছিল।

স্নান সেরে ফিরে এসে নীলিমা নৌকোয় উঠবার আগে গঙ্গা থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে আমাদের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে বললো, 'কেউ ত পুণ্যি করবার নাম করবে না, আমিই করিয়ে দিই।' নৌকোয় বসে সকলে মিলে সঙ্গের খাবারদাবার খেতে খেতে নীলিমাকে বললাম, 'গঙ্গায় চান করে যা পুণ্যি সঞ্চয় করেছিলে, এখন মুরগীর ডিমের স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ত সেই পুণ্যি স্খালন হয়ে গেল।'

আরেকদিন আমরা এরোড্রোম দেখতে গেলাম। শুনেছিলাম অনুমতি নিয়ে ওর ভেতরে গিয়ে সব দেখা যায়। কিন্তু আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন কি একটা পর্বের জন্য সব বন্ধ ছিল, তাই আমরা বাইরে বাইরে ঘুরেই ফিরে এলাম।

আমরা দূরে দূরে বেড়াতে যেতে হলে সব সময় টাঙ্গা ভাড়া করেই যেতাম। এলাহাবাদে লোকে টাঙ্গা ছাড়া একাও চড়তো। তবে একা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকেরই যানবাহন ছিল। শুনেও ছিলাম এবং দেখলামও যে সত্যি ভদ্রলোকেরা কেউ একা চড়ে না। কিন্তু ছেলেবেলায় যে শিশুদের বইএ 'একা গাড়ী ঐ ছুটেছে' পড়েছিলাম, তাইতে একা গাড়ী চড়ার আকাঙ্ক্ষা জাগলো। একদিন আমি ও নীলিমা শহরে বাজারের দিকে গিয়ে পরামর্শ করলাম যে বাড়ী ফিরবার সময় টাঙ্গা করে না গিয়ে একায় যাওয়া যাক্। দোকানপাট করে একটা একাওয়ালার সঙ্গে দামদর করে এক টাকায় একটা একা ঠিক করে সবাই মিলে অতিকষ্টে চাকার ওপর একটা পা তুলে কোনরকমে হাথরফাথর করে বেয়ে উঠে চৌকো তক্তাটার উপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলাম। মাথার ওপরে নোংরা নানা রং এর ছাপানো কাপড়ের ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া। একা-চালক আমাদের সামনে বসে চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। ঘড় ঘড় শব্দ করে একা গাড়ী আমাদের টেনে নিয়ে চললো। শক্ত কাঠের তক্তার উপর বসে এবং একার এদিক থেকে ওদিক ঝাঁকুনির দোলা খেতে খেতে বুঝলাম ভদ্রলোকে

কেন এক্কা চড়ে না।

যাই হোক ইচ্ছে করেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার সময় বাড়ীতে রওয়ানা হলাম যাতে অন্ধকারে এক্কায় চড়া অবস্থায় কেউ যেন আমাদের দেখে না ফেলে। কিন্তু হরি! হরি! আমাদের এক্কা যেই বাড়ীর গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকছে, দেখি ওপরতলার ভদ্রলোকেরা সদলবলে গেটের কাছে বাড়ী থেকে বের হবার যোগাড় করছেন। তাঁরা খুব তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখলেন, আর আমরা যেন কাউকে দেখিনি ভাব দেখিয়ে এক্কা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লাম। বাড়ী ফিরে ওঁকে এবং করালীবাবুকে আমাদের এক্কা চড়ার কাহিনী বললাম।

এবারে কলকাতা ফেরার পালা, সপ্তাহখানেক বাকী। ঠিক করলাম পথে বেনারস, সারনাথ দেখে যাই। তাই দিন ঠিক করে করালীবাবুকে একদিন সকালের গাড়ীতে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হল যে তিনি বেনারসে তিন দিন থাকার একটা জায়গা ঠিক করে রাখবেন আর আমরা বিকেলের গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে গিয়ে সন্ধ্যেয় গিয়ে পৌঁছব। সেই অনুযায়ী সব মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিকেলের গাড়ীতে গিয়ে চড়ে বসলাম।

বেনারস স্টেশনে পৌঁছান মাত্র করালীবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'চলুন, সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।' এই বলে টাঙ্গা ঠিক করে নিয়ে আমাদের 'দশাশ্বমেধঘাট হোটেলে' তুললেন। ঘর দেখে মোটে ভাল লাগলো না, তবে ভাবলাম দুদিন কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। খাওয়ার বেলাও তেমনি। এত ঝাল, মশলা, তেলে রান্না আমরা দুজনে ছেলেদের নিয়ে প্রায় অর্ধভুক্ত রইলাম, তবে নীলিমা ও করালীবাবুর কোন অসুবিধা হল না, দুজনে ঝালমশলা খেতে খুব ভালবাসতেন।

তারপর রাতেও শুয়েছি চার পায়ার ওপর। হোটেলের চাকর একটা টিমটিমে হ্যারিকেন এনে রেখে গেল। তবে ঘর অন্ধকারই। বিছানায় শোয়ার একটু পরেই মনে হতে লাগলো সর্বাঙ্গে কিসে যেন কামড়াচ্ছে। গা, হাত, পা চুলকোচ্ছে আর ভীষণ জ্বালা করছে। উঠে আলো জ্বেলে দেখি খাটিয়াগুলি ছারপোকায় ভর্তি। হাত, পা ফুলে লাল হয়ে গিয়েছে। বাবলু আমার সঙ্গে শুয়েছিল, তারও আমার মত অবস্থা। শুধু নীলিমা দেখি দিব্যি অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু তাকেও ছারপোকা খাওয়ার প্রমাণ দেখলাম যে তার গায়ের চাদরের ওপর অনেকগুলি রক্ত খেয়ে ফুলে বসে আছে। আমি খাটিয়া থেকে নেমে ঘরের মেঝেতে একটা শতরঞ্চি পেতে বাবলুকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘর অন্ধকার হতেই দেখি সেখানেও কামড়াচ্ছে। আবার আলো জ্বেলে দেখি, ছারপোকার দল খাটিয়া থেকে নেমে পিঁপড়ের সারির মত সারি দিয়ে এসে আমায় আক্রমণ করছে। আমি তখন দু আঙুলে চিমটি দিয়ে ধরে দুটো, তিনটে করে ছারপোকাগুলোকে হ্যারিকেনের গরম চিমনির উপর ফেলে চড় চড় করে পুড়িয়ে মারতে সুরু করলাম এবং সারাটা রাত জুড়ে ছারপোকার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জেগেই কাটালাম।

খুব ভোরে সবাই মিলে গঙ্গার ধারে ঘুরে আসবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে আবার ফিরলাম। হেমন্তের ঠাণ্ডায় চারদিক কুয়াসাচ্ছন্ন, তারই মধ্যে গঙ্গার ওপারে সূর্যোদয়ের রক্তিম আভায় অপূর্ব এক দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। সেই সঙ্গে খোল করতাল বাজিয়ে মাড়োয়ারী মেয়েদের সূর্যবন্দনার কীর্তন অতিশয় এক ভক্তিপূর্ণ আবেশ সৃষ্টি করেছিল।

বহু স্ত্রী পুরুষ গঙ্গায় গিয়ে কোমর পর্যন্ত জলে নেমে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ডুব দিয়ে যে যার মনে স্নান করতে ব্যস্ত। স্নান সেরে কেউ বা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফুলওয়ালার কাছ থেকে ফুল কিনছে, কেউ বা কপালে চন্দনের ফোটা দিইয়ে নিচ্ছে, প্রায় সকলের হাতেই কমণ্ডলু কিম্বা ছোট ঘটে গঙ্গার জল। এদের কেউ বা চলেছে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে পূজো দিতে, কেউ বা নিজের বাড়ীর দিকে। অধিকাংশ সকলের মুখেই আছে অদ্ভুত এক নিষ্ঠার চিহ্ন।

সকালের ঘাটের রূপ এক, বিকেলে আবার অন্য রকম। দুপুরের পরই কেউ বা বসে গিয়েছে গীতা পাঠ করে শোনাতে, আবার কোথাও কোন ভজন সুরু হয়েছে, এরকম একটা কিছু নিয়ে যে যার ব্যস্ত।

আমরা যখন বেনারস গিয়েছি তখন কার্তিক মাস। ঐ মাসে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে আকাশপ্রদীপ জ্বালবার প্রথা আছে। কাশীতে দেখলাম সন্ধ্যে হতেই লোকে ছোট ছোট পিদিম জ্বেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। অগুনতি জ্বলন্ত পিদিম জলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার সে অপূর্ব দৃশ্য একবার দেখলে পর জীবনে কখনই কেউ ভুলতে পারবে না।

লোকে যতই বলুক তীর্থস্থানগুলি নানারকম বদমাস জুয়াচোরের আড্ডা, তা হতে পারে খানিকটা সত্য, কিন্তু একদল লোকে যে তাদের বিশ্বাসের ভরে একটা সত্যের সন্ধানে তীর্থস্থানে ছুটে চলেছে সেটা খুবই অনুভব করা যায়।

দুপুরের পর আমরা একটা নৌকো ভাড়া করে গঙ্গার উপর দিয়ে যাবো বলে বেরিয়ে পড়লাম। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে নৌকো চড়ে প্রথমে দেখলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে 'রাজা মানসিংহের প্রাসাদ', তারপর নৌকো বেয়ে যেতে যেতে এলাম 'অহল্যাবাই ঘাট', ওর পরে দেখা গেল 'মণিকর্ণিকা ঘাট'। মণিকর্ণিকা ঘাটে শবদাহ করা হয় এবং শুনেছি কখনও সেখানে চিতার আগুন নেবে না। আমরাও দুটি চিতা জ্বলছে দেখতে পেলাম। এর পরের ঘাটটার নাম হল 'ঘুসলা ঘাট', শেষ 'বেণীমাধবের ধ্বজা' পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘাটগুলি সব দেখতে দেখতে জলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে, বেনারস শহর গঙ্গার অর্ধচন্দ্রাকার তীরে অবস্থিত, একেবারে শেষ রাজঘাট পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলাম।

সন্ধ্যাবেলা হোটেলে ফিরে এসে একটু বিশ্রামের পর নীলিমা, আমি ও করালীবাবু তিনজনে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখতে গেলাম।

পরদিন ভোরে আবার গঙ্গার ধারে ঘুরে এসে একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে টাঙ্গা নিয়ে সারনাথ দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সারনাথ ঠিক আটমাইল

দূরে বেনারস থেকে। প্রথম প্রথম ঐ জায়গাটাকে বলা হতো 'মৃগদাব', পরে বুদ্ধ তাঁর ধর্মপ্রচার করার পর নাম পড়লো 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন ক্ষেত্র'। দুহাজার বছরের পুরোনো 'ধামেকা', কিম্বা অন্য নামে বলে 'ধর্মরাজিক' স্তূপ, সেটা দেখতে পেলাম। এদিক ওদিক ঘুরে ভাঙা অশোক স্তম্ভ দেখা গেল। এই অশোকস্তম্ভের উপর যে সিংহমূর্তি ছিল সেটা সারনাথের মিউজিয়ামে আছে। তার অনুকরণেই আমাদের জাতীয় পতাকার মধ্যে সিংহমূর্তির ছাপ আঁকার প্রথা হয়েছে।

বাবলা গাছের জঙ্গলে ঢাকা অন্যান্য ভগ্ন বিহার ও আরেকটা স্তূপের চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে আবার বেনারসের দিকে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যে নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে উঠে শেষবারের মত গঙ্গার ধারে ঘুরে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরকে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে ফিরে এসে কলকাতা রওয়ানা হওয়ার জন্য দুপুরে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে চেপে বসা গেল। আগে থেকে রিজারভেশনের বন্দোবস্ত ছিল বলে আমাদের আর কোন অসুবিধা হলো না। বিকেলের দিকে ডাফরিন ব্রীজের ওপর দিয়ে যখন রেল যায়, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি গঙ্গার সেই মনোরম অভূতপূর্ব দৃশ্য একবার দেখলে কখনোই আর জীবনে ভোলা যায় না।

এই লাইনে আগে কখনও যাতায়াত করি নি তবে স্টেশনগুলির নাম শোনা ছিল। একের পর এক পার হয়ে যেতে থাকলাম পাটনা, মোকামাঘাট, কিউল, ঝাঁঝা, শিমূলতলা, যশিদি, দেওঘর, মধুপুর, কার্মাটার, জামতাড়া, মিহিজাম। মিহিজামে আমার ভাসুর একটা ছোট বাড়ী কিনেছিলেন কিছুদিন আগে। গাড়ী মিহিজাম স্টেশনে পৌঁছতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জায়গাটা কি রকম দেখবার চেষ্টা করলাম। তারপর আসানসোল আসার পরই মিহিদানা ও সীতাভোগ খাবার লোভে কতক্ষণে বর্ধমান এসে পৌঁছব সেই অপেক্ষায় মন চঞ্চল হয়ে রইল।

মফঃস্বলে তখনও যুদ্ধের কোন আলোড়ন দেখা যায়নি। কলকাতায় 'ব্ল্যাকআউট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যের সময় গাড়ী ঘুরঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হাওড়া স্টেশনে ঢোকার পর গাড়ী থেকে যে আলো পড়ছে প্ল্যাটফর্মে তাইতে দেখতে পেলাম সেজঠাকুরপো ও বিনু আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। গাড়ী থেকে নেমে মালপত্র সব আলাদা করে নেওয়ার পর সেজঠাকুরপো তাঁর গাড়ীতে নীলিমাকে নিয়ে গেলেন। বিনু দুটো গাড়ী আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, আমরা তাতে চক্রবেড়ের বাড়ীতে ফিরে এলাম। বাড়ী এসে দেখলাম টলু কয়দিন হল জামসেদপুর থেকে এসে রয়েছে। আমরা ফিরে আসায় বিনু আর রামের সাংঘাতিক উত্তেজনা। করালীবাবু চা খেয়ে টলু, বিনুর সঙ্গে গল্প-সল্প করে মুটের মাথায় তাঁর বাক্স বিছানা চাপিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সেই রাতের মতো কিছু গোছগাছ করে নেওয়া গেল। ধনুকে বললাম সকলের ছাড়া পরা কাপড়গুলো বারান্দার কোণায় জড় করে রাখতে। আমাদের কাপড়-

চোপড়ের সঙ্গে করালীবাবুরও কয়েকটা খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ছিল। ধনু সব কাপড় একসঙ্গেই জড় করে রেখেছে। পরদিন সকালে সব জামা কাপড়-ধোবার জন্য নিতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মা! মা! সব কাপড় 'উন্দুরে' কেটে দিয়েছে।' ধনু কিছুতেই ইঁদুর বলতে পারতো না, সব সময় বলতো উন্দুর। কাপড়গুলো নাড়া দিয়ে দেখি কাপড়গুলি যেখানে ফেলা হয়েছিল, সেখানে বারান্দার জল বেরিয়ে যাবার ড্রেনের মুখের জালটা ছিল। ঐ বাড়ীর ড্রেনগুলিতে বড় বড় 'ঘুস' ইঁদুরের বাসা ছিল। ঐ ইঁদুরগুলি জালের ভেতর মুখ বাড়িয়ে কাপড় কেটে রেখেছে। কাপড় সব বেছে দেখলাম করালীবাবুর একটা খদ্দরের ধুতি ও মেজছেলের একটা শার্ট একেবারে কুচি কুচি করে কেটে রেখেছে আর বাকী অন্য সব বেঁচে গিয়েছে।

এর অল্প পরেই করালীবাবু আসতে আমি বললাম, 'মাস্টার মশায়! ইঁদুরে ত আপনার একটা ধুতি কেটে রেখেছে।' আমার কথা শোনার পর তিনি মুখখানা কালো করে ছেলেদের পড়াতে বসেছেন। টলু সেখানেই বসে ছিল। করালীবাবুর ওরকম গম্ভীর কালোপানা মুখ দেখে ঠাট্টা করে কেবলি বলতে লাগলো, মাষ্টার মশায়, আমরা আর কি করতে পারি বলুন! ইঁদুর ত আর আমাদের পোষা জন্তু নয়!' ছেলেদের পড়িয়ে করালীবাবু কাপড়গুলি সব নিয়ে যাবার সময় বেছে বেছে দেখে খুশীমত হয়ে বললেন, 'যাক! নতুন ধুতি, পাঞ্জাবি সব বেঁচে গিয়েছে, পুরোনো ছেঁড়া ধুতিটার ওপর দিয়েই গ্যাছে।'

তাঁর কথা শুনে আমারও অপ্রস্তুতের অবস্থা কেটে গেল।

সেদিন দুপুর থেকে আবার সুরু হলো বাবলুর সাংঘাতিক পেটের অসুখ। ভাবলাম সাবধানে রাখলে আস্তে করে সেরে উঠবে। কিন্তু উল্টো হয়ে দাঁড়ালো। সারারাত ধরে এত বাড়াবাড়ি হলো যে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ভোরে খবর পেয়ে সেজঠাকুরপো এসে দেখে বললেন, 'বেসিলারি ডিসেন্ট্রী' হয়েছে। ওষুধবিষুধ ও খাবার ব্যবস্থা সব লিখে দিয়ে বলে গেলেন যে আড়াই থেকে তিনঘন্টার মধ্যে যেন সমানে তাকে জানিয়ে রাখতে থাকি কেমন সে থাকে। সন্দেহ করলেন বাইরের কোন জল থেকে ঐ রোগের সংক্রামকতা হয়েছে।

একদিন রাতে কাজ থেকে ফিরে এসে বললেন, 'জানো মজা! আজ সন্ধ্যেবেলা যখন শরৎবাবুর সঙ্গে বসে কিছু কাজএর আলোচনা করছি হঠাৎ দেখি এলাহাবাদের ঐ উপরতলার ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে শরৎবাবু "আসুন আসুন" "বসুন" বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "পূজোর ছুটিটা কেমন কাটলো?" ভদ্রলোক অমনি বলে উঠলেন, "আর মশায় কাটবে আবার কেমন?" তারপর আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আপনার সেক্রেটারীত দিব্যি আমার বাড়ী দখল করে বসেছিলেন।"

ভদ্রলোকের কথায় উনি খুবই বিরক্ত হলেন। তখন আর কিছু না বলে পরে শরৎবাবুকে বললেন যে, বাড়ীটা আমরাই পুরোটা নিয়েছিলাম। আমাদের দরকার হতো না' বলে খালি পড়ে থাকাতে ঐ ভদ্রলোকই 'উড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছিলেন'।

একমাসকাল কলকাতার বাইরে থাকার সময়ে যুদ্ধের খবর শোনা ছাড়া আমরা আর কিছু বিশেষ অনুভব করি নি। কিন্তু কলকাতায় ফেরার পরই দেখলাম সন্ধ্যা

থেকে আলো নিবিয়ে একেবারে রাস্তাঘাট, বাড়ী সব অন্ধকার করে থাকা, যাকে বলে 'ব্ল্যাক আউট্' সুরু হয়ে গিয়েছে।

তারপর ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে খবর এলো জাপানী আক্রমণ সুরু হয়ে গিয়েছে। তারা পার্লহারবারে আমেরিকান ও মালয়ে ইংরেজদের যুদ্ধের জাহাজ সব ডুবিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে ভারতবর্ষে একটা ভীষণ উত্তেজনা সুরু হল। লোকে ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা আরম্ভ করলো। বিশেষ করে বেশী পরিমাণে মাড়োয়ারীর দল। এদিকে আবার সরকারের তরফ থেকে বোমা পড়লে কি করতে হবে না হবে তার মহড়া শুরু হয়েছে।

একদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিনু সবে বাড়ী ফিরে এসেছে কাজ থেকে, হঠাৎ ভীষণভাবে 'সাইরেন' বাজতে লাগলো। বিপদের সঙ্কেত শুনেই ছেলেদের নিয়ে তাড়াতাড়ি বিনু ও আমি একতলার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। আমরা দরজা, জানালা সব বন্ধ করে বসে আছি, এর মধ্যে ওঁর এক বন্ধু যতিনাথবাবু কোথা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে দরজা ঠেলা দিয়ে এসে উপস্থিত। উনি বাইরে ছিলেন। যতিনাথবাবু এসেই কেবলই দরজা খুলে বার বার গলা বের করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। বিনু দুতিনবার তাঁকে ভালভাবে বারণ করা সত্বেও তিনি যখন আর কিছুতেই শোনেন না, তখন খুব রেগে ধমক্ দেওয়ার পর ভদ্রলোকের কৌতূহল বন্ধ করা গেল। একটু পরে 'অলক্লিয়ার' বেজে উঠলে পর সকলে আবার উপরতলায় এসে গেলাম। অল্প পরে উনিও শরৎবাবুর বাড়ী থেকে এসে বাড়ী ঘুরে গেলেন।

দিন কয়েক পর ১৯৪১ সনের ১২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলা এসে খবর দিলেন যে পুলিশে ঘন্টাখানেক আগে শরৎবাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। শরৎবাবুকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

জাপানীরা যত এগিয়ে আসতে লাগলো, লোকেও তাইতে ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাতে সুরু করলো। অনেকেই ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতেন কিন্তু উনি যত সবাইকে বোঝাতেন যে এখনও ভয়ের কোন কারণ নেই, সেই কথা কেউ বিশ্বাস করতো না। আমি নিজে কখনও কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার পক্ষে ছিলাম না। যে জায়গায় যাবো সেখানেও ত বোমা পড়তে পারে। যার মৃত্যু যেভাবে হবে সেটার হাত আমাদের নেই।

জাপানীরা যখন সিঙ্গাপুর দখল করে এগোতে লাগলো, তখন কলকাতার প্রায় অর্ধেক লোক যে যেখানে পারলো বেরিয়ে যেতে লাগলো। পাড়া সব খালি হয়ে গেল প্রায়। আমাদের পাশের বাড়ীতে একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি একশো মণ কয়লা কিনে মজুত করলেন। আমার ভাসুর প্রচুর পরিমাণে চাল কিনে মিহিজামে জমা রেখে এলেন। শুনেছিলাম সেই চাল শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির জল পড়ে ও ইঁদুরে খেয়ে সব নষ্ট হয়েছিল। সেজজা নীলিমা তার সব দামী সাড়ী, কাপড় জামা দুটো ট্রাঙ্কে ভর্তি করে ও প্যাকিং বাক্সে ডিনার সেট, টিসেট ইত্যাদি চায়নার বাসনপত্র সব বড়

জায়ের জিনিসের সঙ্গে মিহিজামে পাঠিয়ে দিল। জাপানী বোমার হাত থেকে সব বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু মিহিজামে গিয়ে প্যাকিং বাক্স খুলে দেখলো যে প্রত্যেকটা বাসন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে চুরমার।

আমার ভগ্নিপতি জামাইদাকে উনি অনেক বারণ করেছিলেন কলকাতা ছাড়তে। কিন্তু তিনিও কিছুতেই শুনলেন না। জানুয়ারী মাসের শেষে বহরমপুরে একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে মা-বাবাদের নিয়ে একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং প্রথমে দিদি ও পুঁটুকে নিয়ে গিয়ে রেখে এলেন। পুঁটু তার শিশুকন্যা নিয়ে তখন মা-বাবার কাছেই ছিল। কারণ সেই সময় শৈলেনকে যুদ্ধের সৈন্যদের ডাক্তার হয়ে 'মিডল ঈস্টে' যেতে হয়েছিল। এই জায়গা বদলের হিড়িকের জন্য দিদিকেও কিছু খেসারত দিতে হয়েছিল। বহরমপুর থেকে ফেরার সময় রেলে প্রচুর বাসনপত্র কাপড়চোপড় সব চুরি হয়ে গিয়েছিল। জামাইদা মা, বাবাকেও টেনে বহরমপুর নিয়ে গেলেন।

মেজদি বার্মায় বেসিনে থাকতেন। জাপানীরা রেঙ্গুন, বেসিন সর্বত্র বোমা ফেলতে সুরু করেছে। মণিদা (মেজ ভগ্নিপতি) ও তাঁদের কয়েকজন প্রতিবেশী মিলে পরামর্শ করলেন যে মেয়েদের আগে কোনরকমে কলকাতা পাঠিয়ে দেওয়া যাক। রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় জাহাজ যাতায়াত প্রায় বন্ধ তখন। সেজন্য সকলে মিলে একটা বোট ভাড়া করে মেয়েদের রওয়ানা করিয়ে দিলেন। ইরাবতী নদীতে নৌকো দিয়ে বাঙালী কয়েক পরিবারের সন্তান-সন্ততি নিয়ে মেয়েরা কিছু দূর যাওয়ার পরই বোটের মাঝিরা দেখতে পেলো দূর থেকে জলদস্যুরা বোটের পেছন পেছন তাড়া করে আসছে। এই না দেখে মাঝিরা তৎক্ষণাৎ তড়িৎ বেগে বোট ঘুরিয়ে নিয়ে কোন রকমে আবার সবাইকে নিয়ে গিয়ে রেঙ্গুনে পৌঁছে দিল। সেখানে একটা শিবিরে কয়দিন থাকার পর যেই খবর জানলেন যে একটি জাহাজ কলকাতায় যাচ্ছে, তখনি দু'মেয়ে নিয়ে মেজদি রওয়ানা হয়ে পড়লেন। ষোল বছরের সুখের সংসার একদিনে মানুষের এই হিংস্র প্রবৃত্তির জন্য ছারখার হয়ে গেল। বাড়ী, ঘরদোর জিনিসপত্র সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে এক বস্ত্রে ছোট ছোট দুটি মেয়ের হাত ধরে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় কলকাতা এসে উঠলেন। সেই সময়ে দিদি, মা, বাবা সবাই বহরমপুরে। দিদির বাড়ী খালিই ছিল। কয়দিন সেই বাড়ীতে বিশ্রাম করে কুমিল্লায় শ্বশুরবাড়ী চলে গেলেন।

এলাহাবাদ থেকে ঘুরে যাওয়ার পর সেই শীতকালে ঘুসঘুসে জ্বরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম, কিন্তু নানারকম যুদ্ধের ব্যাপার ও নিজেদের অবস্থাও ভেবে বেশ চিন্তান্বিত হয়ে চলেছি। এর মধ্যে এলো আমাদের পরিবারের মধ্যে এক উত্তেজনা।

এটা হলো ন'দেওর টলুর বিবাহ। শ্বশুরমশায় বেঁচে থাকাকালীন সমস্ত দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন সকলের বিয়ের ব্যাপারে, এবারে পড়লো বড় ও মেজ ভাইয়ের ওপর। ওঁর এক বন্ধু ব্যারিস্টার শান্তি রায়চৌধুরী মশায়ের ভাগ্নী পদ্মালয়ার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এলো। সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের সব ঠিকও হয়ে গেল। আমি ও বড়জা একদিন

গিয়ে কনের বাড়ীর সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে এলাম। আশীর্বাদ ইত্যাদি হয়ে যাবার পর ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) বিয়ের দিন ঠিক হলো। সব আয়োজন পরামর্শ ঘোরতরভাবে চলতে লাগলো। বিয়ের দুদিন আগে আমি ও ছোটজা দেবী যে যার বাড়ী থেকে এসে ভাসুরের বাড়ীতে গেলাম। নীলিমা রোজ সকালে এসে যেতো এবং রাতে তাদের বাড়ী ফিরে যেতো। বাড়ীর সকলের একত্র হয়ে হৈ-চৈ গণ্ডগোলে এক অদ্ভুত আনন্দের পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। বিনু পরিবারে সব চেয়ে ছোট। কিন্তু সে চারদিকে চেঁচামেচি করে এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন সে-ই বরকর্তা।

বিয়ের জন্য কেনাকাটা সব আমার ভাসুরই নিলেন নিজের ওপর। আমার ওপর চাপালেন টাকা-পয়সা সামলে রাখা, এবং বাড়ীতে যত বন্ধুবর্গ, আত্মীয়স্বজন আসেন তাঁদের ভাল করে আতিথেয়তা। আর বড় জায়ের উপর পড়লো সকলের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। বিয়ের সব আয়োজন করতে করতে দিন এসে গেল।

বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা আমরা জায়েরা মিলে স্ত্রী-আচার করে বর রওয়ানা করিয়ে দিলাম। আমি বাবলুকে কোলে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, বরযাত্রীর দল গাড়ী করে যেতে আরম্ভ করেছেন, এর মধ্যে সেজঠাকুরপো কোথা থেকে ঝড়ের মত এসে আমার কোল থেকে বাবলুকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে চট্ করে একটা গাড়ীতে চড়ে বসে রওয়ানা দিলেন। ধনু আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, আমি বললাম, 'যা ! যা ! তুই শিগগির সঙ্গে যা। চট্ করে কোন একটা গাড়ীতে উঠে পড়। তা না হলে পর বিয়েবাড়ীর ভিড়ের মধ্যে ঐ শিশুকে সামলে দেখে রাখবে কে !' ধনু বললে 'মা' আমার পায়ের জুতো নেই !' আমি বললাম, 'আর জুতো পায়ে দেবার সময় নেই, এমনি চলে যা।'

মাঝরাতে সবাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফিরে এলেন। সেই রাতে উনি ভাসুরের বাড়ীতেই কাটালেন। ভোরে জেগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে উনি বাবলুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবু, কাল রাতে কেমন খেলে ?' বাবলু আধ আধ ভাষায় বলে উঠলো, 'বাবা ! ওরা আমায় রসগোল্লা খেতে দেয়নি।'

বাবলুর কথা শুনে আমরা ত হেসেই অস্থির। তারপর ব্যাপারটা ধনুর মুখে শুনলাম। ধনু বাবলুকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছিল। পরিবেশকরা বার বার মিষ্টি এনে যখন দিতে চাইছিলেন তখন ধনু বলেছিল আর দেবেন না, ও আর খেতে পারবে না। কিন্তু তার পাতে রসগোল্লা না দেওয়াতে শিশু বাবলুর মনে খুব ক্রোধ হয়েছিল।

দুপুরে সবাই যখন বরকনে আনতে গিয়েছেন, বাবলুকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উনি গিয়ে শান্তিবাবুকে (পদ্মার মামা, যাঁর সঙ্গে ওঁর বিশেষ পরিচয় ছিল) বললেন, 'মশায় ! আমার ছোটপুত্র বাড়ী গিয়ে আপনাদের নিন্দে করেছে যে তাকে আপনারা রসগোল্লা খেতে দেননি !'

'ওঁদের বাড়ীতেও খুব একটা হাসির রোল্ উঠলো। শান্তিবাবু তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে একটা প্রকাণ্ড সিল্ করা রসগোল্লার টিন আনিয়ে বাবলুকে দিয়ে বললেন, 'আর আমাদের নিন্দে কোরো না, বাবা ! এই নাও, বাড়ী গিয়ে যত ইচ্ছে খুশী

রসগোল্লা খাও।'

বরকনে আসবে, সকলে বাড়ীতে ব্যতিব্যস্ত। হঠাৎ দিদি বললেন, 'বরকনে যেখানে এসে দাঁড়াবে, একটু আলপনা দিলে হতো। আমার ত হাতে আসে না।' আমি ছেলেবেলা থেকে শিলংএ কোন কিছু উপলক্ষে মার সঙ্গে আলপনা দিয়ে দিয়ে বেশ অভ্যস্ত ছিলাম। সুন্দর করে আলপনা দিয়ে বরণ কুলো ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে বরকনের অপেক্ষা করছি, এর মধ্যে যে প্রথম গাড়ী এসে থামলো তাতে বরকনে পেছনের সিটে, আর ধনু বাবলুকে নিয়ে সামনে বসে। গাড়ী থামতেই ধনু নেমে এলো এক কোলে তার বাবলু ও অন্যহাতে প্রকাণ্ড রসগোল্লার টিন। আমি তাড়াতাড়ি রসগোল্লার টিন হাতে নিয়ে বললাম, 'এই রসগোল্লা আমার ও আমার ছেলের।' বলে টিনটা নিয়ে গিয়ে আমার খাটের নীচে রেখে দিলাম।

বাড়ীতে খুব হৈ-রৈ চললো নতুন বৌ নিয়ে। পরদিন সন্ধ্যায় ফুলশয্যার তত্ত্বতে প্রচুর রকমারি মিষ্টি এসেছে। সকালবেলা দিদি আমায় ডেকে বললেন, 'অমিয়া! তুমি ছেলেমেয়েদের আগে খাইয়ে দাও, তারপর বড়রা খাবে। আমি ততক্ষণ রান্নাবান্নার যোগাড় দিই।' বলে কাছেই তরকারী কুটতে বসে গেলেন।

আমি ছোটদের সবাইকে টেবিলে বসিয়ে খেতে দিতে দিতে হিরুর চারবছরের তৃতীয় মেয়ে সবিতাকে (ডাক নাম কচা) বললাম, 'কচা! তুই কি আরেকটা সন্দেশ খাবি?'

কচা বললে, 'খেতে পারি।'

সন্দেশ দিতে দিতে আমি বললাম, 'ছোট ছোট বাঁদরের বড় বড় পেট।' খাবার ঘরের ওপাশে পার্টিশানের পেছনে বসে আমার ভাসুর কি কাজকর্ম করছিলেন, তিনি আমাকে ঐ আওড়াতে শুনেই পার্টিশনের পেছন থেকে জোরে জোরে বলে উঠলেন, 'লঙ্কায় যাইতে মাথা করে হেঁট।' দিদি আমাদের এই ধরণের চেঁচামেচি শুনে বললেন, 'দেখ! ভাসুরে আর ভাদুর বৌএ কি লাগাইছে?' অর্থাৎ ভাসুর ও ছোটভাইএর স্ত্রী কি আরম্ভ করেছে?

দিন কয়েক পরে এসব মিষ্টি ইত্যাদি খেয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। একদিন বিকেলে কারা যেন এসেছেন, দেখলাম দিদি চাকরকে বাজারে পাঠাচ্ছেন মিষ্টি কিনে আনবার জন্যে। আমি বললাম, 'আবার মিষ্টি আনিয়ে কি হবে? ঘরে ত টিনভর্তি মিষ্টি রয়েছে।' এই বলে টিনটা এনে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি বললেন, 'এটা কি এখানেই খোলা হবে? আমি ত ভেবেছি তুমি বুঝি তোমার বাড়ী নিয়ে যাবে।' আমি বললাম, 'ভবিষ্যতে দরকারের সময়ে কাজে লাগবে বলে সরিয়ে রেখেছিলাম। নতুবা আসার সঙ্গে সঙ্গে ওটাও খুললে একসঙ্গে অযথা সব শেষ হতো।'

টিনটা খুলে দেখা গেল 'রসগোল্লা' নয়, টিনভর্তি 'পান্তুয়া'। রসগোল্লার বদলে পান্তুয়া খেতে পেয়ে সকলে আরো খুশী।

টলুর বিয়েতে বৌভাতের অনুষ্ঠানে পাতা পেড়ে রান্না খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা না করে বিলিতি কায়দায় সন্ধ্যায় একটা জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে প্রচুর পরিমাণ দেশী-বিদেশী খাবারের ব্যবস্থা ছিল, এবং এমন করে দেওয়া হয়েছিল

যাতে সেদিন রাতে বাড়ী ফিরে আর কাউকে কিছু খেতে না হয়। তখন ব্ল্যাকআউট, সামরিক অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়, সেজন্য রান্না করে সান্ধ্যভোজন বাদই দেওয়া গেল। খুবই সুন্দর সুচারুভাবে 'ইভনিং পার্টি'টা হলো। দিন কয়েক পর টলু বৌ নিয়ে জামসেদপুর রওয়ানা হয়ে গেল। আমি ও ছোট জা-ও ছেলেপুলে নিয়ে যে যার বাড়ী ফিরে গেলাম।

কয়দিন বিয়ের হিড়িকে সব ভুলে গিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরে আসতেই আবার নানারকম দুশ্চিন্তা মনে উদয় হতে লাগলো। ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাস থেকে সম্পূর্ণ উপার্জনহীন না হলেও শরৎবাবু গ্রেপ্তার হওয়ার দরুণ বেশ কিছুটা আয় কমে গিয়েছিল। ডাক্তার লাহার কাজ ও অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বক্তৃতা দেবার কাজ থাকাতে কোন রকমে সংসারের খরচাপত্র চলে যেতো।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একদিন দুপুরে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে বক্তৃতা দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে বললেন, 'আজ অল্ ইন্ডিয়া রেডিও থেকে বের হবার সময় ডিরেক্টার জেনারেল বোখারী সাহেবের সঙ্গে দেখা হতে তিনি তাঁর ঘরে ডাকলেন। সেখানে ভীষণভাবে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে।'

এই শুনে আমি বললাম, 'এই রে ! অল্ ইন্ডিয়া রেডিওর মারফতে যাও বা কিছু আয় হচ্ছিল, এবার সেটাও বন্ধ হয়ে আবার পূনর্মূষিকভব হতে হবে।' উনি বললেন, 'সেজন্য আমি ওসব কর্তাদের কোনরকম কথা শুনতে রাজী নয়।' তারপর ঝগড়ার কারণটা শুনলাম।

তখনকার দিনে 'ক্যাপিট্যাল' বলে একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের হতো। 'জি. ডবলু. টাইসন' নামে এক ইংরেজ ছিলেন সেই কাগজের সম্পাদক। এই ক্যাপিট্যাল কাগজে সপ্তাহে একদিন করে উনি (আমার স্বামী) যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখতেন। একবার টাইসন সাহেব ওঁকে বললেন, 'আমি দিল্লীতে একটা কনফারেন্সে যাচ্ছি, অল ইন্ডিয়া রেডিওর যুদ্ধের খবরবার্তা ইত্যাদি কি ভাবে কি প্রচার করা দরকার এবং এখন তারা যে ভাবে চলেছে তাতে কি কি গলদ আছে আমায় যদি একটু লিখে দাও। উনি টাইসন সাহেবকে সব লিখে দিয়েছিলেন। টাইসন সাহেব ওঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ঐসব ওঁর লেখা বলে কনফারেন্সে কাউকে জানানো হবে না। কিন্তু ব্যাপার ঘটলো উল্টো। কাগজে এঁর নাম দিয়ে সমস্ত বিবরণ ছাপা হয়ে কনফারেন্সে সকলের মধ্যে বিলি হলো। বোখারী সাহেব তাই পড়ে চটেমটে অস্থির।

এরপর কলকাতায় অল্ ইন্ডিয়া রেডিওতে হঠাৎ ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতেই ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি একজন ইংরেজ সাহেবকে এসব লিখে দিয়েছ কেন ? তোমার আগে আমায় জানানো উচিত ছিল।'

উনি বললেন, 'আমি ভাল করেই জানি, তোমরা আমার ওসব কথার কোন ভ্রূক্ষেপই করতে না।'

কিছুক্ষণ দুজনে তর্কাতর্কির পর বোখারী সাহেব বললেন, 'আমি কয়দিনের জন্য

ঢাকা যাচ্ছি, আমি ফেরার পর তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

বোখারী সাহেবের সঙ্গে দেখা করার যে দিনটা ঠিক ছিল, সেদিন অল্‌ ইন্ডিয়া রেডিও আপিসে যাবার সময় বলে গেলেন, 'আজ একটা কিছু এসপার-ওসপার করে আসবো।'

দুপুরের পর ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'হলো ত বিপরীত। বোখারী সাহেব আমি যেতেই বললেন, মিস্টার চৌধুরী ! তোমাকে আড়াইশ টাকা মাইনেতে এই আপিসে একটা কাজ দিতে চাইছি, তুমি নেবে কি ?' উনি বললেন, এত কম মাইনেতে এখানে কাজ করা আমার সম্ভব হবে না বলেছি তা তিনি বললেন, 'আচ্ছা তুমি ভেবে-চিন্তে আমায় দিল্লীতে লিখে জানিও।' কয়দিন পরে উনি বোখারী সাহেবকে দিল্লীতে লিখে জানালেন যে গবর্ণমেন্টের চাকরী নিলে অন্যত্র যে কাজ করেন ওঁকে সেগুলো সব ছেড়ে আসতে হবে। এতে অন্ততপক্ষে চারশ টাকা না পেলে তিনি বোখারী সাহেবের প্রস্তাবের কাজ নিতে পারবেন না।

সপ্তাহ দুই কেটে গেল, আমরা আর কোন খবর কিছু শুনতে না পেয়ে ভাবলাম বোধহয় আর কিছু এগোলো না। নিজেরা বলাবলি করলাম, 'যাক্‌ গে ! ঐ অত কম টাকায় কিছুতেই সারাক্ষণের জন্য সরকারী চাকরী নেওয়া যায় না।'

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন অল্‌ ইন্ডিয়া রেডিও আপিস থেকে এক্ষুনি দেখা করা দরকার খুব জরুরী বলে ডাক এলো। উনি তাড়াতাড়ি গিয়ে শুনলেন যে দিল্লী থেকে টেলিফোনে খবর এসেছে, তারা জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছেন, উনি কি দিল্লীর অল্‌ ইন্ডিয়া রেডিও আপিসে একটা কাজ নেবেন ? তারা চারশ টাকা দিতে প্রস্তুত। যদি রাজী হন, তবে দুসপ্তাহের মধ্যে ঐ কাজ দিল্লী গিয়ে সুরু করতে হবে। এই প্রস্তাব শুনে আর দেরী না করে দিল্লী যেতে রাজী আছেন বলে তখুনি কথা দিয়ে এলেন।

বাড়ী এসে সব বলতেই শুনে আমি ত বেজায় খুশী। বহুদিন থেকে দিল্লী একটা স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। মা-বাবা এবং দিদি যে দুটি বাড়ী রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে ভাড়া নিয়েছিলেন তার মালিক ছিলেন দিল্লী-প্রবাসী একজন বাঙালী ভদ্রমহিলা। তাঁদের বিখ্যাত দিল্লী আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী। অল্পবয়সে তিনি বিধবা হন। তাঁদের কাছে দিল্লীর গল্প শুনে শুনে ভাবতাম যদি কোনও দিন দিল্লী যাবার সুযোগ হতো ! বহুদিন থেকেই যেন কলকাতায় থাকা বড় অসহ্য বোধ করতাম। কলকাতার ইঁটপাটকেলএর মধ্যে যেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কোন অনুভূতি নেই, তারপর বাঙালী-জীবনের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা যা নাকি শিশুকাল অবধি অনভ্যস্ত ছিলাম— আমাকে এ সমস্তের সংলগ্ন থাকা বড়ই পীড়া দিত। দিল্লীতে চাকরী পেয়ে গেলেন দেখে ভাবলাম, 'ভগবান আমায় মুক্তি দিলেন।'

পরামর্শ করে ঠিক হলো উনি আগে যাবেন। দিল্লী গিয়ে কাজকর্মের রকম সব দেখে নেবেন, তারপর আমরা যাবো। নতুবা সকলে একসঙ্গে গিয়ে কাজ সুবিধের নয় বলে যদি আবার ফিরে চলে আসতে হয় !

ওঁর দিল্লী রওয়ানা হবার উদ্যোগ সুরু হলো। টাকার হিসেব করে দেখা গেল কিছু

কাপড়চোপড়, একটা ভাল সুট ইত্যাদি করিয়ে নিতে হবে, তাছাড়া দিল্লী যাওয়ার রেলের ভাড়াও আছে, সবসুদ্ধ শ'তিনেকের কমে কিছুতেই সম্ভব নয়। হাতে যে টাকা আছে এবং আরও কিছু এদিক ওদিক পাওনা সব আমাদের থাকার খরচাবাবদই লেগে যাবে।

নানারকম চিন্তা করে উনি সুরেশ মজুমদার মশায়ের কাছে গিয়ে এই চাকরীর কথা বললেন, এবং তিনশ টাকা ধার চাইলেন। সুরেশবাবু তৎক্ষণাৎ টাকাটা বের করে দিয়ে বললেন, 'নীরদবাবু, আপনি দিল্লী চলে যাবেন! আমার ত ইচ্ছে ছিল আমাদের কাগজের জন্য আপনাকে আমাদের আপিসে নিয়ে নেবো।' উনি বললেন, 'আমি ত কথা দিয়ে দিয়েছি। অমুক দিন কাজে যোগ দেবো বলে সব একেবারে পাকা হয়ে গিয়েছে।'

তিনশ টাকায় সমস্ত খরচা কুলালো না দেখে সুরেশবাবু আরও দুশো টাকা অর্থাৎ সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা দিয়েছিলেন।

সুট তৈরী করতে দেবার জন্য দৌড়লেন নামকরা দরজী 'বরকত্ আলী'র দোকানে। সময়মত সে বেশ ভাল সুট্ সেলাই করে দিল। অন্যান্য জামা-কাপড় করিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলের টিকিট করে দিল্লী রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। গলায় টাই বেঁধে সুট পরার অভ্যেস নেই। দুদিন ধরে মহড়া চল্‌লো। আমি স্কুলে পড়বার সময়ে 'গার্লগাইডে' ছিলাম, সেজন্য গলায় টাই বাঁধতে জানতাম। কি করে টাইএর ফাঁস দিতে হয় সেটা দেখিয়ে দিয়ে অভ্যেস করিয়ে দিতে লাগলাম।

তারপর ১৬ই মার্চ ১৯৪২ সনে দুপুরে দিল্লী রওয়ানা হয়ে পড়লেন। বিনু সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দিল্লী মেইলে তুলে দিয়ে এলো।

পরদিন বিকেলবেলা কিছু কাগজপত্র, বই ইত্যাদি গুছিয়ে রাখছি এর মধ্যে হঠাৎ সেজঠাকুরপোর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছেলেরা বাইরে খেলা করছিল। তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে বলতে বাড়ীর ভেতরে ঢুকেই সেজঠাকুরপো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে চেঁচামেচি সুরু করেছেন, 'মেজবৌদি! মেজবৌদি! একা একা বসে কি করছো?'

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি নীলিমা ও সেজঠাকুরপো দুজনেই এসে হাজির। আমি 'এসো, বসো বসো' বলতেই বললেন, 'না, এখানে আর বসবো না। চলো সবাই মিলে বালিগঞ্জে দাদার বাড়ী ঘুরে আসি।' আমি বললাম, 'না! আজ থাক।' কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না, একরকম জোর করেই আমাকে ও ছেলেদের গাড়ীতে বসিয়ে ভাসুরের বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, বিনুও বাড়ীতে রয়েছে। বিনুকে দেখে আমি বললাম, 'তুমি এখানে?'

সে বললে, 'দাদা একটা কাজের জন্য ফোন করে আপিস-ফেরৎ এখানে এসে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বলেছিলেন।'

বড়জা ঘরে কিছু খাবার করেছিলেন। সবাই মিলে চা খাওয়ার পর বসে গল্প-

সম্প করছি, দিদি বললেন, 'অমিয়া ! তুমি ত দিল্লীবাসী হতে চল্‌লে।'

এসব কথাবার্তা চলেছে, এর মধ্যে বটঠাকুর ঐ ঘরে এসে ঢুকে আমার কাছেই একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'বৌমা ! অল্পক্ষণ আগে বহরমপুর থেকে তালই মশায়ের একটা টেলিগ্রাম এসেছে যে, মাঐমা বিশেষ অসুস্থ, তোমাকে শিগ্‌গির পাঠিয়ে দিতে। তুমি কালই সকালের গাড়ীতে বিনুর সঙ্গে ছেলেদের ও ধনুকে নিয়ে বহরমপুরে রওয়ানা হয়ে যাও।'

শোনামাত্র মনটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌লো। তখুনি মনে হলো, মা আমার আর বেঁচে নেই।

বাড়ী ফিরে এসে সারারাত আর ঘুমোতে পারলাম না ; হু হু করে মা ! মা ! বলে থেকে থেকে সমস্তক্ষণ কাঁদলাম। উনিও এসময়ে কাছে নেই, নিজেকে আরো অসহায় বোধ করে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে রইল।

সকালে রওয়ানা হবার আগে বিনুকে বললাম, 'মা-র জন্য কিছু ফল কিনে নিয়ে যাই।'

বিনু বললো, 'এখান থেকে ফল নিয়ে কি হবে ? উনি ত বোধহয় অজ্ঞান অবস্থায় আছেন এখন, একটু ভাল হলে ওখানেই কিনতে পারবেন।'

আসলে বাবা ভাসুরের কাছে টেলিগ্রাম করে মা-র মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং বাড়ীর আর সকলেই জানতেন। কিন্তু আমায় আর কেউ এই খবরটা বলেন নি।

জামাইদাও দুপুরের পর কাজ থেকে ফিরে এসে বাবার টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র আমার ভাসুরকে ফোন করে জানিয়ে বললেন, আমি এক্ষুনি বহরমপুর রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি, আজ আর অন্য গাড়ী নেই, আপনারা টুনুকে কাল সকালের প্রথম গাড়ীতে রওয়ানা করিয়ে দেবেন।

পরদিন সকালের গাড়ীতে আমরা রওয়ানা হয়ে বিকেল নাগাদ বহরমপুর গিয়ে পৌঁছলাম। স্টেশনে কম্পাউন্ডার বাবু অপেক্ষা করছিলেন। দুটো সাইকেল রিকশ করে বাড়ীতে পৌঁছে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই বাবা, দিদি এগিয়ে এলেন। আমি বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, 'মা কোথায় ? কোন্ ঘরে ?'

দিদি জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, ঠোঁট দুটি কাঁপছে। পুঁটু মেয়ে কোলে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়ালো। বাবা আমায় তাঁর বুকে জড়িয়ে নিয়ে ধরাগলায় বললেন, 'তোর মা আমাদের সবাইকে ফেলে চলে গিয়েছেন।'

মনে একটা অমঙ্গলের সম্ভাবনা উঁকি মারলেও বড় আশা করেছিলাম মাকে গিয়ে দেখবো। বাবার মুখে ঐ খবর শুনে একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম।

রাতে আমি আর পুঁটু দুবোনে এক মশারীর নীচে শুলে পর পুঁটু মায়ের হঠাৎ মৃত্যুর সমস্ত খবরটা বললো।

বহরমপুরে ভাল ছানার বড়া ইত্যাদি মিষ্টি খুব ভাল পাওয়া যায়। বিকেলে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্যে প্রচুর মিষ্টি আনিয়ে বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে জনে জনে, চাকর-বাকরকে

নিজের হাতে করে দিয়ে খাইয়ে পরে খুব করে স্নান করে আসেন। গরমের জন্য পাখার নীচে মোড়া পেতে বসে চুল আঁচড়াতে বসেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েই ধপ্ করে মেঝেতে পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।

পুঁটু কাছেই ছিল, সে চীৎকার করে উঠতে দিদি পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এসে মায়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে দেখলেন যে হাত ও পায়ের নখের রং একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারও সঙ্গে সঙ্গেই এলেন এবং সব পরীক্ষা করে বললেন, হার্টফেল করেছেন।

পুঁটু বললে, 'কি বলবো রে টুনু ! মা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে। সেদিন দুপুরে খাওয়ার পর মা তাঁর ট্রাঙ্ক, বাক্স খুলে নিয়ে বসে আমায় বোঝাতে বসলেন তাঁর কোন্ জিনিস কাকে দেওয়া হবে। কাপড়জামা, যা কিছু গয়নাপত্র ছিল একটা একটা করে বের করছেন আর সব নাতি, নাতনী, আমরা মেয়েরা কে কোনটা নেবো নাম করে করে বলতে লাগলেন। তাছাড়া দুটি বড় বড় সিন্দুকভর্তি কাঁসার বাসন ও প্রচুর আসবাবপত্রের লিস্ট যা সব শিলং-এর বাড়ীতে ফেলে এসেছেন সেগুলো বের করে বললেন, সব দেখে রাখ।'

পুঁটু বলেছিল, 'এই গরমের মধ্যে মা তুমি এসব কি আরম্ভ করলে ? এখন একটু ঘুমোও দেখি। মা বললেন, নারে ! কবে কোনদিন একলা ঘরে মরে পড়ে থাকবো। তোরা কেউ কিছু জানবিও না।'

আমাদের ভাই নেই। সেজন্য বাবা আমাদের তিন বোনকে দিয়ে ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধের সব ব্যবস্থা করালেন।

মেজদি তখন বর্মা থেকে এসে কুমিল্লায় গিয়েছেন। তিনি সেখানেই মায়ের সব কৃত্যাদি করলেন।

বহরমপুর মফঃস্বল জায়গা এবং বাড়ীটা ছিল একটি ব্রাহ্মণপাড়ায়। মায়ের মৃত্যুর খবর পাড়ায় রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী সকল ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকেরা এসে বললেন, এরকম সতীসাধ্বী মায়ের সৎকার আমরা সবাই মিলে করবো। এতে আমাদের কোন বাছবিচার নেই। এই বলে তারাই এসে সকলে একত্র হয়ে শ্মশানে নিয়ে গেলেন।

বাবা অসুস্থ ছিলেন, বেশীর ভাগ সময়ে তাঁকে বিছানায় শুয়েই থাকতে হতো। কিন্তু মা-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক অদ্ভুত মনের জোরে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে দেড়মাইল দূরে ভাগীরথী নদীর পারে শ্মশানে গিয়ে শেষ ক্রিয়া করে এলেন।

মা বরাবর লোকজন খাওয়াতে ভালবাসতেন। বাবা তাই মনে করে শ্মশান-বন্ধুরা ছাড়া, কাছেই গ্রামবাসী সকল লোককে শ্রাদ্ধের খাওয়া খেয়ে যাবার জন্য বলে পাঠালেন। একেবারে পিঁপড়ের সারি দিয়ে সবাই এসে খেয়ে ধন্যি, ধন্যি করে গেল। তার পরের দিন রামকৃষ্ণ মিশনের মারফতে প্রচুর কাঙালী বিদায় করা হলো সকাল বেলায়।

পরদিন দশটার গাড়ীতে আমার কলকাতা ফেরার কথা। বাবা বললেন, 'যা, বিকেলে গিয়ে তোর মাকে যেখানে চিরকালের মত রেখে এসেছি, প্রমোদের সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে আয়।'

বাবার কথায় কম্পাউন্ডারবাবুর সঙ্গে ভাগীরথীর পারে গেলাম। নদীর ধারে এক জায়গায় ছাই ছাই মত হয়ে আছে। কাছেই স্তূপীকৃত কাঠ পড়ে। কম্পাউন্ডারবাবু বললেন, 'মাকে দাহ করবার জন্য যে কাঠ কেনা হয়েছিল তার এক-চতুর্থাংশ লাগেনি। কেউ কেউ ফেরৎ দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাবা বলেছিলেন, না থাক, এ কাঠ গরীব লোকের কারো কাজে এসে যাবে।'

আমি ধপাস্ করে নদীর ধারে বালির চরে বসে পড়লাম। নদীর জলের স্রোত ভেসে যাওয়া দেখতে দেখতে অন্যপারে সূর্যাস্তের রক্তিম আকাশের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত মানসিক ভাব বোধ করতে লাগলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্ছে, দূরে ওপার দিয়ে এক মাঝি ধীরে ধীরে নৌকো বেয়ে যাচ্ছে, মনে হলো— ও ! কি দেখছি ? এ যে সবুজপাড় শাড়ী পরা মায়ের ছায়ার মত কে নৌকোয় বসে। আস্তে করে হাত তুলে 'আমি গেলাম, তোরা সবাই ভাল থাকিস্' এই বলে সব মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ চমকে উঠলাম কম্পাউন্ডারবাবুর গলার আওয়াজ শুনে, 'সেজদি, চলুন এখন বাড়ী ফিরে যাই, অন্ধকার হয়ে এলো।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে মনে হলো কবির কথাগুলি—

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক'লকাতায় ফিরে এলাম।

বিকেলে বাড়ী এসে পৌঁছনোর একটু পরেই দিল্লী থেকে ওঁর চিঠি পেলাম। লিখেছেন একটা ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া গিয়েছে, আমি যেন চিঠি পাওয়ামাত্র সব গুছিয়ে নিয়ে দিল্লী রওয়ানা হয়ে পড়ি। মায়ের মৃত্যুর খবর কিছু জানতেন না তখনও।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥